ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ

প্রবোধচন্দ্র সেন

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ

প্রবোধচন্দ্র সেন

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ

Bharat-Pathik Rabindranath

by

Prabodh-Chandra Sen

Price : Rs. 8·00

প্রজ্ঞানাচার্য

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু

নিবেদন

এই বইখানির নাম যদি দেওয়া হত 'রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা', তা হলেও অসংগত হত না। কারণ এই গ্রন্থে যে প্রবন্ধগুলি সংকলিত হল তার প্রায় সবগুলিই রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা-বিষয়ক। কিন্তু তাঁর ভারতচিন্তা চিন্তামাত্রই নয়। তাতে প্রেরণা আছে, পথের নির্দেশও আছে। যে পথের নির্দেশ পাওয়া যায় তাঁর ভারতচিন্তায়, তাকে তিনি নিজেই বলেছেন 'ভারতপথ'। তিনি নিজেও ছিলেন সে পথের পথিক, আর তাঁর স্বজাতিকেও সে পথে প্রেরণা দেবার সাধনাই করে গিয়েছেন সারাজীবন। তাই বইটির নাম দেওয়া গেল 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ'। দৃশ্যতঃ প্রথম প্রবন্ধের নাম-অনুসারেই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, সব প্রবন্ধেরই মূলে রয়েছে ওই একই কথা।

রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তার দুটি প্রধান দিক্। এক দিকে ভারতসত্তার মহাভাষ্য, অপর দিকে সেই ভাষ্যের আলোকে যুগোচিত কর্মপথের নির্দেশ। এ দিকে দৃষ্টি রেখে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিকে দুটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করেছি—'ভারতপথিক' এবং 'যুগনায়ক'। তা ছাড়া, আরও কয়েকটি প্রবন্ধকে স্থান দিয়েছি 'বিচিত্র' নামে একটি তৃতীয় বিভাগে। এই বিভাগের প্রবন্ধগুলি প্রথম দুটি বিভাগ থেকে একান্তভাবেই স্বতন্ত্র নয়। এর কয়েকটি প্রবন্ধ, বিশেষতঃ প্রথম দুটি, পরোক্ষভাবে পূর্ববর্তী ভাগদুটির সঙ্গে যুক্ত। অথচ এগুলির রচনাকালীন উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। তাই এই প্রবন্ধকয়টিকে এই গ্রন্থে গ্রহণ করেও একটি পৃথক্ বিভাগে স্থাপন করা গেল।

এই গ্রন্থের কোনো কোনো প্রবন্ধ নবরচিত হলেও অধিকাংশই পূর্বরচিত এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত। দীর্ঘকাল ধরে রচিত ও প্রকাশিত হলেও প্রথমাবধি লেখকের মনে বিশেষ একটি ভাবাদর্শের পরিকল্পনা ছিল। তা ছাড়া, গ্রন্থে সংকলনকালেও ওই দিকে দৃষ্টি রেখে প্রবন্ধগুলিকে যথোচিতভাবে পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করে

দেওয়া গেল। আশা করি পাঠকের দৃষ্টিতেও গ্রন্থখানিতে একটি ভাবগত সমগ্রতা লক্ষিত হবে।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হলেও একই পরিকল্পনার অন্তর্গত বলে একটি মূল ভাবসূত্রে গ্রথিত, অথচ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত। এইজন্য প্রত্যেকটি প্রবন্ধকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রয়োজন ছিল। ফলে এগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুনরুক্তি বর্জন করা সম্ভব ছিল না। গ্রন্থে সংকলনকালেও প্রত্যেকটি প্রবন্ধের স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় রাখাই সমীচীন মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস পাঠকের মনও প্রত্যেকটি প্রবন্ধের স্বাতন্ত্র্যের দ্বারাই অধিকতর পরিতৃপ্ত হবে, ফলে পুনরুক্তিগুলিও পীড়াদায়কভাবে অনুভবগোচর হবে না। প্রবন্ধগুলিকে গ্রন্থে বিন্যস্ত করার সময়ে রচনা বা প্রকাশ-কালের ক্রম অনুসৃত হয় নি, অনুসৃত হয়েছে ভাবানুষঙ্গের ক্রম। প্রবন্ধগুলির রচনা, প্রকাশ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল গ্রন্থশেষে 'প্রবন্ধপরিচয়' বিভাগে। আর, যে চারটি চিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হল তার বিবরণ পাওয়া যাবে 'চিত্রপরিচয়' অংশে।

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থকারের দুখানি পুস্তকের মধ্যে এটি দ্বিতীয়। প্রথমখানির বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, আর এখানির বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা। বস্তুতঃ প্রথমখানি এই দ্বিতীয়খানির, বিশেষতঃ এর 'যুগনায়ক' বিভাগের, পরিপূরক বলে গণ্য হতে পারে। কেননা, শিক্ষাসমস্যা আধুনিক ভারতের অন্যতম প্রধান যুগসমস্যা। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার সমাধানেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন ভারতপথের লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই। 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা'-র ন্যায় এই গ্রন্থখানিকেও যদি পাঠকসমাজ রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মোৎসবের অন্যতম শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে গ্রহণ করেন, তা হলেই লেখকের অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার এই সামান্য গ্রন্থোৎসর্গ-গ্রহণে সম্মতি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আমার সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে যে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছি তা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবর্তী তিনি। সারাজীবন ধরে তিনি তাঁর স্বকীয় পন্থায় ভারতপথেরই সন্ধান দিচ্ছেন তাঁর স্বদেশবাসীকে। তাই এই গ্রন্থখানি তাঁকে উৎসর্গ করলাম শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে।

এই গ্রন্থপ্রকাশের প্রথম উদ্যমেই আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুহৃদ্‌বর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহায়তা লাভ করি। বন্ধুবর শ্রীপুলিনবিহারী সেনের কাছেও কোনো কোনো বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা পেয়েছি। অতঃপর প্রুফসংশোধনাদি গ্রন্থপ্রকাশের আনুষঙ্গিক সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আমার জামাতা কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত। এই গ্রন্থের দুইখানি চিত্রের ফটোপ্রতিলিপি তুলে দেন যাদবপুর স্কুল অব প্রিন্টিং টেক্‌নোলজি প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক সুদক্ষ ফটোশিল্পী শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের অন্তর্গত রবীন্দ্রসদন-বিভাগের পরিচালক শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী ও সহপরিচালক শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ঝানসীর রাণী' পাণ্ডুলিপির ফটোপ্রতিলিপি-গ্রহণে ও অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কর্মী শ্রীসুশীল রায়ের নামও উল্লেখ করা কর্তব্য।

রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন
১৫ অগস্ট ১৯৬২

প্রবোধচন্দ্র সেন

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

*ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৩৫২ আষাঢ়)

ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত (১৩৫৬ বৈশাখ)

India's National Anthem (১৯৪৯ মে)

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা (১৩৬৮ বৈশাখ)

*ধর্মবিজয়ী অশোক (১৩৫৪ বৈশাখ)

ধম্মপদপরিচয় (১৩৬০ শ্রাবণ)

বাংলার ইতিহাস-সাধনা (১৩৬০ ভাদ্র)

রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি (১৩৬৯ বৈশাখ)

সম্পাদিত গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' (১৩৬৯ কার্তিক)

*প্যারীমোহন সেনগুপ্ত-অনূদিত 'মেঘদূত' (১৩৩৭ ফাল্গুন ; ১৩৪৬ বৈশাখ)

*নূতন সংস্করণ প্রকাশিতব্য

অধ্যায়সূচি

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ

যে-সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে ইতিহাসের মহাযাত্রাপথে তার শেষ লক্ষের অভিমুখে পরিচালিত করে যান সেই সমস্ত মানবপ্রেমিকের জীবনব্রতের চরম মূল্য নির্ণয় করার একমাত্র অধিকারী মহাকাল। সমগ্র মানবের অখণ্ড ইতিহাসের বিশাল পটভূমির উপরে তাঁদের জীবনচিত্র গতিশীল কালের তুলিতে মোটা রেখায় ও অক্ষয় বর্ণে অঙ্কিত হয়ে যায়। সেই ক্ষণজন্মা পুরুষদের অন্যতম রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বমানবের জন্যে তাঁর জীবন যে বাণী বহন করে এনেছিল বৃহৎকালের ব্যবধানে তার অর্থ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হবে। বর্তমান কালের অনতিব্যবধান থেকে তাঁর সমুন্নত বিরাট্ ব্যক্তিত্বকে সমগ্রভাবে দৃষ্টিগোচর ও উপলব্ধি করা স্বভাবতই অসম্ভব। কিন্তু তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বকে সর্বকালের বিশাল ভূমিকায় স্থাপন করে পরিমাপ করার অধিকার আধুনিক কালের না থাকলেও, বর্তমান যুগের যে বাণী ও ব্রত তাঁর মধ্যে মূর্তিপরিগ্রহ করেছিল তার স্বরূপনির্ণয়ের শুধু অধিকার নয়, দায়িত্বও আধুনিক কালেরই। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যুগপ্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও বাণীর বৈশিষ্ট্য কোথায়, তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের পর্বে পর্বে এক-একটি জাতির মধ্যে যে-সব মহাপুরুষ আবির্ভূত হন তাঁরা সকলেই একাধারে যুগপ্রতীক ও যুগপ্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও এই সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে-কালে তিনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন সে-কালের বিশ্ববাণী তাঁর মধ্যে সংহত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শুধু তাই নয়, সে কালের অন্তরে নূতন প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করে তাকে নবতর সার্থকতার অভিমুখে প্রেরণা দান করেছিলেন। স্বীয় কালের যে অভিপ্রায় ও সংকল্পকে তিনি আমাদের কাছে বহন করে এনেছিলেন, তাঁর জীবনের ব্রতকে আমাদের মধ্যে পূর্ণতর রূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত সেই যুগাভিপ্রায় ও সংকল্পের বাণীকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল বিশ্বের তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি পরম যুগসন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণে বিচিত্র রকমের দানবীয় ও দৈব শক্তির

সংঘাতে কালসমুদ্র যেমন প্রবলভাবে মথিত হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তেমনটি আর কখনও ঘটেনি। ওই মন্থন আসলে মানুষের চিত্তসমুদ্রেরই মন্থন। সেই উন্মন্থনের ফলে যে অমৃতরাশি উত্থিত হয়েছে তারই বাহকরূপে তিনি সমগ্র জীবনকাল বিশ্বজগতের কাছে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আর, যে আপাত-মনোরম তীব্র হলাহল উদ্‌গত হয়ে জনচিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, তাঁর সদাসতর্ক কণ্ঠ কঠিন ধিক্কারধ্বনিতে ওই হলাহলকে নিন্দিত করে বিশ্বজগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের হৃদয়কে তার প্রতি বিমুখ করে তুলতে চিরপ্রয়াসী ছিল। তাঁর জীবনের শেষ মহাবাণী 'সভ্যতার সংকট'-নামক রচনাটিতেই এ-কথার প্রমাণ জ্বলন্ত অক্ষরে দীপ্যমান হয়ে রয়েছে। যে-অমৃতের পাত্র তিনি বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন সে-অমৃত যে ভারতেরই অমৃত এ-কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কাশীরাম দাসের গ্রন্থের যে বাণীটি আমাদের কানে এবং প্রাণে সব চেয়ে বেশি করে ধ্বনিত হয় সেটি হচ্ছে,—'মহাভারতের কথা অমৃত-সমান'। গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথেরও জীবনসাধনার মূলবাণী হচ্ছে—'মহা-ভারতের কথা অমৃত-সমান'। কিন্তু ওই বাণীকে তিনি নূতন অর্থে উদ্দীপ্ত এবং নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী বাণীসাধনার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে একটি বিরাট্ অখণ্ড অথচ বিচিত্র মহা-ভারত রচনা। যে মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ তিনি ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই রূপটি একই কালে ভৌমগুলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকেই তিনি দেখেছিলেন তাঁর নিজের মনের মধ্যে। এই দৃষ্টিতে লক্ষ করলে তাঁর সমগ্র রচনাবলীকে আধুনিক কালের উপযোগী একখানি বিপুলকায় ও বহুপর্বিক মহাভারত বলেই স্বীকার করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীন মহাভারত ও আধুনিক রবীন্দ্ররচনার মধ্যে শুধু যে অপরিমেয় পার্থক্যই লক্ষিত হবে তা নয়, এই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যস্থাপনের প্রয়াসটাই নিরর্থক বলে মনে হবে। কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে বোঝা যাবে, উভয়েরই মর্মবস্তু এক; উভয়ের হৃৎপিণ্ড একই বিরাট্ ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে এবং সে ছন্দ হচ্ছে মহান্ ভারতবর্ষের মহত্তর আদর্শ ও অভিপ্রায়ের ছন্দ। রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় বলতে গেলে তখন ভারতবর্ষ 'আপন বিরাট্ চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে' উঠেছিল;

দেশের বিদ্যা, মননধারা ও চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে একত্র সংহত করে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করে তোলার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। তখনকার কালের ওই অভিপ্রায় এবং সমস্ত দেশের ওই ঔৎসুক্য ও আগ্রহই রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তৎকালীন ভারতসংহিতার মধ্যে। আধুনিক কালেও সমগ্র দেশব্যাপী অভিপ্রায় এবং আত্মপ্রকাশের আগ্রহ রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে তাঁর বিপুল রচনারাশির মধ্যেই মূর্ত ও স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এ-কথা বললে কি অন্যায় হবে? মহাভারতকার কাশীরাম দাসকে লক্ষ করে কবি মধুসূদন যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তাকে ঈষৎ রূপান্তরিত ও অর্থান্তরিত করে আমরা রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ করেও বলতে পারি—

মহা-ভারতের কথা অমৃত-সমান,
হে রবি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।

মহা-ভারতের বাণী-বাহক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করা চাই; নতুবা ভারতবর্ষের মর্মনিহিত অভিপ্রায় ও আধুনিক কালের নির্দেশ আমাদের কাছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস ভৌগোলিক ভারতবর্ষের বিরাট্ পটভূমিরূপ হিমালয়পর্বতের বর্ণনার সূচনাতেই বলেছেন—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

নগাধিরাজ হিমালয়কে 'দেবতাত্মা' না বলে যদি 'ভারতাত্মা' নামে অভিহিত করা হত তা-হলে শুধু যে কাব্যের ছন্দ-সংগতি অব্যাহত থাকত তা নয়, তার ভাবসংগতিও অধিকতর সুরক্ষিত হত বলেই আমার বিশ্বাস। কেননা, ওই মহাগিরির বিরাট্ রূপের মধ্যে ভৌগোলিক ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা যে সত্যই অচলপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। আর, ভাবরূপী ভারতবর্ষের আত্মা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার মহাকবিদের রচনাবলীতে—ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের বাণীসংহিতাতে। বস্তুতঃ এই ভারতাত্মা মহাকবিদের কাব্যসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না হয়ে ভারতীয় আত্মার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে', এই জনপ্রবাদের সার্থকতা শুধু যে ব্যাসের গ্রন্থ

সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তা নয় ; অন্য তিনজন মহাকবির রচনাবলী সম্বন্ধেও এ-কথা সমভাবেই সার্থক। ভারতাত্মা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের আধুনিক যুগ যে অপূর্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে রবীন্দ্রনাথকেও ঠিকমতো জানা যাবে না, আধুনিক যুগও আমাদের কাছে অচেনাই থেকে যাবে।

পূর্বেই বলেছি যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ এ-দেশের আলোতে প্রথম নয়ন উন্মীলন করলেন সেটি বিশ্বের তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি মহাযুগ-সন্ধিক্ষণ। ইতিহাসের বহুবিচিত্র শক্তি সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের দেশে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং ওই শক্তিসংঘাতের জটিল আবর্তের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল। সিপাহি-যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাঁর জন্ম। আর ওই সিপাহি-যুদ্ধের অগ্নিশিখাতেই ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রশক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সমস্ত আশা নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য সংঘশক্তি ও অস্ত্রশক্তির নিকট ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হল। শুধু রাষ্ট্রশক্তি নয়, চিত্তশক্তির ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্যের জয়ধ্বজা ভারতভূমিতে সগর্বে প্রোথিত হল। ইউরোপীয় বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি তীব্র রশ্মিতে ভারতের চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়ে তার চিত্তকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অভিভূত করে ফেলেছিল। কিন্তু সুখের বিষয় প্রাচ্য আত্মাকে একান্ত পরাভবের গ্লানি থেকে বাঁচাবার রক্ষামন্ত্রটিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ওই চিত্তসংঘাতের মধ্যেই নিহিত ছিল। শুধু তাই নয়, দুইটি অরণিকাষ্ঠের সংঘর্ষণে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়ে যজ্ঞসমিধ্‌কে প্রজ্বলিত করে তোলে, তেমনি পূর্ব ও পশ্চিমের সংঘর্ষজাত অগ্নিশিখা ভারতীয় চিত্তকে যে উদ্দীপনা দান করল তাই তাকে নূতন সার্থকতার পথে প্রেরিত করেছে। ইউরোপীয় চিৎশক্তির বিদ্যুৎসংস্পর্শে যেন ভারতবর্ষের মুমূর্ষু দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হল এবং সেই নবজাগরিত ভারত যেন চারদিকের পরাভবের অন্ধকারের মধ্যেও নূতন আলোতে নূতন পথের সন্ধানে উৎসুক হয়ে উঠল। বাংলাদেশের সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসটাই ওই নব চাঞ্চল্যের স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই দীর্ঘকালের সন্ধানেও ভারতবর্ষের পক্ষে আপন পথ, তার স্বকীয় সার্থকতার পথ আবিষ্কার করা সহজ হয়নি। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি দুই দল লোক ভারতের

তরণীকে দুইটি বিভিন্ন স্রোতোমুখে পরিচালিত করতে প্রবল প্রয়াস করছে। এক দল চাইছে ভারতবর্ষকে অন্তরে-বাহিরে ভাবে চিন্তায় আদর্শে রাষ্ট্রব্যবস্থায় পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন করে তুলতে, আর-এক দলের ইচ্ছা ভারতকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখা। অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, উভয় দলের আদর্শ ও অভিপ্রায়ের তারতম্য অনুসারে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ও পার্থক্য ছিল। তা-ছাড়া, আর-এক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের বলা যেতে পারে মধ্যপন্থী; তাদের উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের মধ্যে অল্পাধিক সমন্বয় স্থাপন করা। এই দলের অনুবর্তীদের সংখ্যাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মধ্যপথের রেখা কোথায় টানা হবে, সমন্বয়ের সীমা কোথায়, তা নিয়েও মতপার্থক্যের অন্ত ছিল না। এই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব ছাড়া আরও এক দ্বন্দ্ব তখন দেশে অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠেছিল। সে দ্বন্দ্ব হচ্ছে নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব। কারও মতে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও ধর্মব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত না করলে বর্তমান ভারতের সার্থকতা লাভের আশা নেই। আর-এক দলের মতে ও ব্যবহারে প্রমাণিত হয় যে, তারা বর্তমানের ব্যবস্থাকেই অল্পাধিক অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। অবশ্য এ-ক্ষেত্রেও স্বভাবতই মধ্যপন্থাই অধিকাংশের চিত্তকে বেশি করে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু মধ্যপথ কোথায় সে-বিষয়ে মতের একতা দেখা যায়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তখনকার দিনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং প্রাচীন ও আধুনিক, এই চারটি বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে আমাদের জাতীয় চিত্ত আলোড়িত হচ্ছিল। সূক্ষ্মতর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিরুদ্ধশক্তি আসলে চারটি নয়, তিনটি। প্রাচ্যপন্থীরাই প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। আধুনিকপন্থীরা মোটামুটি রক্ষণশীল, সর্বপ্রকার পরিবর্তনেরই তারা বিরোধী; প্রাচীনপন্থীরা চান ভারতবর্ষের অতীতকেই ভবিষ্যতে প্রতিফলিত করতে, অর্থাৎ অতীতের আদর্শে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলাই তাঁদের অভিপ্রায়। আর, প্রতীচ্যপন্থীদের মতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে গড়তে হবে ইউরোপের আদর্শে। বলা বাহুল্য, সমস্যা হচ্ছে ভবিষ্যৎকে নিয়ে; ভারতের ভাবী রূপ হবে কেমন সেইটেই হল মূল প্রশ্ন। রক্ষণশীলদের মতে সেটা হবে বর্তমানেরই অনুবৃত্তিমাত্র; প্রাচীনপন্থীদের মতে অতীতেরই প্রতিরূপ এবং প্রতীচ্যবাদীদের মতে ইউরোপীয় আদর্শের

অনুকৃতি বা অনুস্মৃতি। বলা বাহুল্য আদর্শের এই রকম সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন বিভাগ থাকা কখনও সম্ভব নয়। সকলেই অল্পবিস্তর সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ওই সমন্বয়সাধনের উপলক্ষে সকলেরই উক্ত তিন আদর্শের কোনো না কোনোটার প্রতি অল্পাধিক আকর্ষণ প্রকাশ পেত। কিন্তু দেশ তো তিন পথে অগ্রসর হতে পারে না। তাকে হয় একটি পথ বেছে নিতে হবে, না-হয় একটি নূতন পথ আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু সে কোন্ পথ? এই সমস্যাই তখন জাতীয় চিত্তকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। ধর্মে-দর্শনে, সাহিত্যে-শিক্ষায়, সমাজে-রাষ্ট্রে সর্বত্রই এই সমস্যা তখন উদগ্র হয়ে উঠেছিল।

এই সমস্যার দিনেই রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন আমাদের জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে। স্বভাবতই তাঁকেও ভারতের যাত্রাপথনির্ণয়ের মহাব্রতে ব্রতী হতে হয়েছিল। তাঁকে নানা সময়ে নানা দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল, নানা দ্বিধায় আন্দোলিত হতে হয়েছিল। অবশেষে তিনি যে-পথকে ভারতবর্ষের সার্থকতালাভের যথার্থ পথ বলে অন্তরে স্থিরভাবে উপলব্ধি করলেন তাকে তিনি 'ভারতপথ' নামেই অভিহিত করেছেন। এই পথের সুস্পষ্ট পরিচয় পাই তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে (১৩১৪-১৬), 'পূর্ব ও পশ্চিম'-নামক প্রবন্ধটিতে (১৩১৫), 'ভারততীর্থ'-নামক বিখ্যাত কবিতাটিতে (১৩১৭) এবং রাম-মোহন-শতবার্ষিকী উপলক্ষে পঠিত অভিভাষণদ্বয়ে (১৩৪০)। তিনি নিজেও ছিলেন এই ভারতপথেরই পথিক এবং তাঁর স্বজাতিকেও ওই নির্দিষ্ট যাত্রাপথেই আহ্বান করে গিয়েছেন। এই ভারতপথের বৈশিষ্ট্য কি, তা বিচার করে দেখা অবশ্যকর্তব্য।

গোরা যখন নিজের জন্মগত পরিচয় লাভ করল তখনই সে বহু অনুসন্ধানের পর নিজের সত্যকার আত্মার পরিচয়ও লাভ করল। তখনই বলতে পারল, আজ আমি "সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি"। এই আত্মোপলব্ধির ফলেই সে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছে—

> আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।...

আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।

—গোরা, ৭৬

'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস'। এই প্রশ্নের আলোচনার গোড়াতেই তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্যই সমাহৃত"। তবে সে ইতিহাস কাদের? রবীন্দ্রনাথের মতে সে ইতিহাস সমস্ত মানবের বা মহামানবের এবং সেই মহামানবের ইতিহাস ভারতবর্ষের আধারে একটি বিশেষ রূপ ও বিশেষ কল্যাণসাধনের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করবে। তাই তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন—

'ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই।'

—'সমাজ', পূর্ব ও পশ্চিম (১৩১৫)

তাই যদি হয় তবে মহামানবের ভারতীয় ইতিহাসে আমাদের স্থান কোথায়, আমাদের কর্তব্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—

বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই আমরা আছি, মহাভারতবর্ষ গঠনের এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে; একদিন যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ। একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড 'আমরা'র মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ আরও যে-কেহ আসিয়া এক হউক না—তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

—'সমাজ', পূর্ব ও পশ্চিম

মহাকালের যে অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আশ্রয় করে অভিব্যক্তি লাভ করছে, রবীন্দ্রনাথের মতে তার লক্ষ হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত মানবকে ভারতবর্ষের মধ্যে মিলিত করা এবং ভারতবর্ষকেও সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে প্রসারিত করা ; আমরা সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত পৃথিবীও আমাদের ; আমাদের জন্যে বুদ্ধ খ্রীস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করেছেন। এই ব্যাপক বিশ্ববোধের ভিত্তির উপরেই তিনি পূর্ব ও পশ্চিমকে ভারতবর্ষের ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কেননা, "ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনা" করাই ভারতীয় ইতিহাসের বর্তমান যুগের অভিপ্রায়। এই যুগাভিপ্রায়কে সার্থক ও সফল করে তোলারই মহৎ ব্রত ধারণ করেছেন ভারতের নবযুগ-প্রবর্তক মহামনীষীরা—রামমোহন রায়, রাণাড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ।—

> যখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির যোগ-সাধন হইবে, তখন ভারত-ইতিহাসের যে-পর্বটা চলিতেছে সেটা শেষ হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।
>
> —'সমাজ', পূর্ব ও পশ্চিম

ভারতবর্ষে ইতিহাসের গতিকে বিশ্বাভিমুখী করে তোলার দ্বারাই, পূর্ব ও পশ্চিমের যথার্থ মিলনের দ্বারাই, আমরা নিজেরা সার্থক হব এবং ভারতবর্ষে ইতিহাসের অভিপ্রায়কেও সফল করতে পারব। ভারতীয় ইতিহাসের এই বিশ্বমিলনাভিমুখী পথকেই রবীন্দ্রনাথ 'ভারতপথ' নামে অভিহিত করেছেন। আর 'ভারততীর্থ'-নামক যে বিখ্যাত রচনাটির মধ্যে তাঁর এই সত্যোপলব্ধি সংহত ও উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, সে কবিতাটিকেও তিনি 'ভারতপথের গান' নামে অভিহিত করেছেন। 'ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানাজাতি ও নানা শক্তির সমাগম' হয়েছে তাদের সকলের সম্মিলিত ঐক্যের মধ্যেই ভারত-ইতিহাসের নবতর ও উজ্জ্বলতর উদ্‌বোধন ঘটবে। সেই প্রদীপ্ত প্রভাতের প্রত্যাশাতেই কবি বিশ্বের সমস্ত জাতিকে ভারতবর্ষের মহামানবের মিলনতীর্থে আহ্বান করেছেন।—

> এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান,
> এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীস্টান।

ভারতের ব্রত হল ঐক্যসাধনা এবং যত বড়ো বিরাট্ দেশ এই ভারতবর্ষ, তত বড়োই তার এই ঐক্যের সাধনা। প্রাচীন কালের ইতিহাসে দেখা যায়—

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা।

এইটেই হল ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরতম প্রবণতা। তাই কবি নিঃসংশয়-চিত্তেই তার ভাবী পরিণতি সম্বন্ধেও বলতে পেরেছেন—

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।

ভারতের সেই চিরন্তন বিরাট্ ঐক্যের সাধনা এবং ভবিষ্যতের তদ্রূপ বিরাট্ ঐক্যপরিণতির বাণী কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট্ হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এই ভারততীর্থ কবিতার প্রায় সমকালে রচিত 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' ইত্যাদি জাতীয় সংগীতটিতেও অখণ্ড ভারতের মিলনবাণীর মন্ত্র উদ্গীত হয়েছে।—

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি' তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টানী—
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসনপাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।

'পথ ও পাথেয়' (রাজাপ্রজা) নামক প্রবন্ধটিতে (১৩১৫) রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসকে আরও বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করে তার অন্তরতম প্রবণতা কোন্ দিকে এবং তার সার্থক পরিণতি কোথায় তাই দেখিয়েছেন।—

ভারতবর্ষের মতো নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধগ্রস্ত দেশে তাহার সমস্যা নিতান্তই দুরূহ। ঈশ্বর আমাদের উপর একটি সুমহৎ কর্মের

ভার দিয়াছেন। আদিকাল হইতে জগতে যতগুলি বড়ো বড়ো শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই কোনো না কোনো বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

—'রাজাপ্রজা', পথ ও পাথেয়

অতঃপর আর্য-অনার্যের মিলন, বৌদ্ধধর্মের মিলনমন্ত্রের প্রভাবে ভারত ও মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের মধ্যে একাত্মতাস্থাপন, শঙ্করাচার্যকর্তৃক খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়সমূহকে অখণ্ড বৃহত্ত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা ও ইসলামধর্মরূপী ঐক্যমন্ত্রবাহী আর এক মানব-মহাশক্তির আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—

তখন চৈতন্য, নানক, দাদূ, কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য—শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্মগুলির বিচ্ছেদক্ষত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে—রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী—ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই একেকটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপমাত্র নহে, ইহারা পরস্পরগ্রথিত,…ইহারা…বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর আর-কোনো দেশেই এত বড়ো বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই—এত জাতি এত ধর্ম এত শক্তি কোনো তীর্থস্থলেই একত্র হয় নাই—একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। …ভারতবর্ষের

মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা একক ব্রহ্মকে প্রেমে জ্ঞানে ও কর্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্মশালার কঠোর সংকীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক—ভারত-ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খ্রীস্টান, পূর্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের বিরুদ্ধে নহে—ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতি কঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূর কাল হইতে এখানকার তপোবনে একের তত্ত্ব উপনিষদ্ এমন আশ্চর্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। ...তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম অন্যান্য দেশের মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সংকীর্ণ করিয়া দেখিবেন না। ... যে-ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎ শক্তিপুঞ্জদ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপে বিরাট্ মূর্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, সমস্ত আঘাত-অপমান সমস্ত বেদনা যাহাকে এই পরমপ্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতনভাবে কে করিবেন, কে একান্ত ভক্তির সহিত ভারত-বিধাতার পদতলে নিজের নির্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিবেন। ভারতের মহাজাতীয় উদ্‌বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়।

—'রাজাপ্রজা', পথ ও পাথেয়

অন্যত্র তিনি বলেছেন—

এখানে নানাজাতের লোক একত্র এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটেনি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান-মন্ত্র হচ্ছে সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্—এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোনো

দেশেই নয়। যতই দুরূহ হক এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।...ভারতবর্ষের এই শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন...সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারত-পথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদূ।...সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়।...তাঁর মৃত্যুর পর একশত বৎসর অতীত হল।...কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা, তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে।...তার অন্য দিক্‌ চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবী কালের অভিমুখে।... তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে-কালে ভারতের মহাইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।

—'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায় (১৯৩৩)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আজীবন সাধনার ফলে আমাদের যে-পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং যে-পথে তিনি আমাদের পুনঃপুনঃ আহ্বান করে গিয়েছেন, সে হচ্ছে এই মহা-ভারতেরই পথ, এই মহা-জাতীয়তার পথ। ভারতপথিক রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর যে উক্তি উপরে উদ্‌ধৃত করা গেল, বলা বাহুল্য সেটি তাঁর নিজের সম্বন্ধেও সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য। বস্তুতঃ তিনি নিজেই ছিলেন ওই ভারতপথের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপথিক।

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্মের যে শাখাটি বিশ্বমৈত্রীর প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে প্রায় সমগ্র এসিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তুরকিস্থান থেকে জাপান ও মঙ্গোলিয়া থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত সর্বমানবকে জাতিবর্ণনির্বিশেষে একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল, তার নাম মহাযান। যে মহাতরণী তখন উদ্‌ভাবিত হয়েছিল সে তরণী ছোটো ছিল না; দেশবিদেশের ছোটো-বড়ো উঁচুনীচ সকল নরনারীরই ঠাঁই হয়েছিল সে মহাতরণীতে। গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সমগ্র ভারতবর্ষই ওই মহাযানধর্মী; এবং

ভারতবর্ষের ইতিহাস বস্তুতঃ ওই ভারত-মহাযানেরই ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আর্য-অনার্য, গ্রীক-পারসিক, শক-হূণ, আরব-তুরকি, পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ইংরেজ প্রভৃতি কত জাতি যে এই মহাতরণীতে আরোহণ করে একই সার্থকতা, একই অখণ্ড মহাজাতীয়তার লক্ষ্যাভিমুখে যাত্রা করে কালসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বস্তুতঃ ভারত-মহাযানের যাত্রাপথই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারত-মহাপথ রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের একটি মতবাদ সর্বাস্তিবাদ নামে পরিচিত। সর্বাস্তিবাদীদের দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের ক্ষুদ্রবৃহৎ সমস্ত কিছুরই সার্থকতা স্বীকৃত হয়ে থাকে, কোনো কিছুরই অস্তিত্ব অস্বীকার্য নয়। ভারত-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকেও সর্বাস্তিবাদী নামে অভিহিত করলে অন্যায় হয় না। কেননা, ভারতবর্ষকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তাতে মহাভারতবর্ষগঠনের উপাদান হিসাবে দেশী-বিদেশী, প্রাচীন-নবীন সমস্ত জাতি, শক্তি ও ধর্মমতেরই সার্থকতা ও উপযোগিতা স্বীকৃত। ভারতবর্ষে তিনি যে মহাজাতিসমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, সেই সমন্বয়ের সাধনায় প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ধর্মমতেরই সমবেত আত্মোৎসর্গ একান্ত আবশ্যক। 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীর' ছাড়া যে মা'র অভিষেক সুসম্পন্ন হতে পারে না, এ-বাণী তো তাঁরই।

যা হক, রবীন্দ্রপ্রদর্শিত এই ভারতমহাপথের সম্যক্ পরিচয় লাভ করা চাই, নতুবা রবীন্দ্রনাথকেই যথার্থভাবে বোঝা যাবে না। তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতবর্ষের যে উজ্জ্বল ও পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছিল, ধ্যানী রবীন্দ্রনাথকে সত্যভাবে জানতে হলে ভারতবর্ষের সেই রূপটিকেও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা চাই। কেননা, সাধনা ও ধ্যান-লব্ধ সত্য এবং ধ্যানী সাধকের আত্মস্বরূপ একই প্রতিষ্ঠাভূমিতে অভিন্নরূপে মিলিত হয়ে যায়। মহাযানধর্মী ভারতবর্ষের বিশ্বরূপ দর্শন করতে এবং তার ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের লক্ষ্যাভিমুখী মহাপথের সন্ধান পেতে রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় রত হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে তাঁর ওই সাধনার ইতিহাসটিও বিশদভাবে জানা চাই। সে ইতিহাসকে সংহতরূপে দেখা যায় গোরা উপন্যাসে ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের অভিব্যক্তিতে, আর বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় তাঁর সমগ্র রচনা-

বলীতে ও তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী কর্মসাধনাতে। কিন্তু সে ইতিহাস বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের যে বিশ্বতোমুখী রূপ দর্শন করেছিলেন তার তিনটি প্রকাশ। প্রথম প্রকাশ ভূগোলগত, দ্বিতীয় প্রকাশ ইতিহাসগত এবং তৃতীয় প্রকাশ আদর্শ বা ভাবগত। কিন্তু এই তিনটি প্রকাশ পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, বরং কার্যকারণসূত্রে অতি ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপের দ্বারাই তার ঐতিহাসিক রূপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ভূগোলের রঙ্গমঞ্চেই ইতিহাসের নাট্যলীলা চলে, শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়; কোনো দেশের ঐতিহাসিক নাট্যলীলায় ওই দেশের ভৌগোলিক রূপও অন্যতম শ্রেষ্ঠ অথচ মূক অভিনেতারই কাজ করে, এ-কথা বললেই অধিকতর সত্য বলা হয়। আর কোনো জাতির ইতিহাসকেও কতকগুলি চঞ্চল ও আকস্মিক ঘটনার সমষ্টিমাত্র রূপে দেখাও সত্য দেখা নয়। আপাতচঞ্চল ঘটনাপ্রবাহের অন্তরে থাকে একটি অচঞ্চল প্রতিষ্ঠাভূমি এবং আকস্মিকতার মায়াযবনিকার অন্তরালে দেখা যায় কোনো-একটি বিশেষ পরিণতি ও স্থির লক্ষের অভিমুখে জাতীয় আত্মাভি-ব্যক্তির অবিচলিত গতি। অপ্রকাশের গুপ্ত গুহা থেকে উৎসারিত হয়ে অনন্ত প্রকাশের অভিমুখে জাতীয় আত্মা ও চিত্তাভিব্যক্তির যে প্রবাহ, তারই নাম জাতীয় ইতিহাস। তাই কোনো জাতির আত্মস্বরূপের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে ওই জাতির ইতিহাসকে সত্যরূপে জানা চাই। কেননা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—

'ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়ের চরম কথাটি হচ্ছে, আত্মানং বিদ্ধি।'

—প্রবাসী ১৩৪৯ আশ্বিন, পৃ ৫৩৫

"নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা।" অর্থাৎ ইতিহাসের ভিতর দিয়েই প্রত্যেক জাতির আত্মোপলব্ধি ঘটে। যা হক, ইতিহাসের নিত্য চাঞ্চল্যের অন্তরালে জাতীয় চিত্তের অন্তর্নিহিত যে আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ পরিপূর্ণ সার্থকতার অভিমুখে নিরন্তর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে সেটিই হচ্ছে জাতির ভাবরূপ।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ, ঐতিহাসিক রূপ ও ভাবরূপ, এই তিন রূপেরই অপূর্ব পরিচয় পাই। ওই ভাবরূপ আবার সমাজ ও ধর্ম এই দুইটি পৃথক্ অথচ সংশ্লিষ্ট মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমাজের

আদর্শ ও ধর্মের আদর্শকে আশ্রয় করেই ভারতবর্ষের ভাবরূপ ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে ভাবরূপী ভারতবর্ষের আত্মা কখনও রাষ্ট্ররূপ বা রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রয়াস করেনি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ, ঐতিহাসিক রূপ এবং সমাজ ও ধর্মগত ভাবরূপের কথা সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা চাই, নতুবা ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয় আমাদের কাছে সত্যরূপে প্রতিভাত হবে না।

সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, ভারতভূমির বিশাল বিস্তারের মধ্য দিয়ে এই যে চিরন্তন ভারতপথ প্রসারিত হয়ে চলেছে মহামানবের মিলনলক্ষের অভিমুখে, আধুনিক কালে সে পথ এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশের হৃদয়তীর্থে। ভারত-ইতিহাসের চরম অভিপ্রায়টির উজ্জ্বলতম অভ্যুদয় ঘটেছে ভারতভূমির এই পূর্বদিগন্তে। তাই রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্ট করেই বলতে হয়েছে—

> একথা ভুলিলে চলিবে না, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের ভার বাঙালির উপরেই পড়েছে।
>
> —জাপানযাত্রী, ১৫

আর রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন সেই সর্বোত্তম ভারতপথিক বাঙালি যাঁর প্রতিভার করস্পর্শে ভারততীর্থের এই মহামানবের মিলনমন্দিরের দ্বার আজ সহসা উন্মুক্ত হয়ে গেল আমাদের বিস্মিত নেত্রের সম্মুখে। তাই তো রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে ভারত-জননীকে সম্বোধন করে মুগ্ধ বাঙালির কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথেরই এই বাণী—

> আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
> তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
> ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
> তোমার দুয়ার আজি খুলে গেল সোনার মন্দিরে ॥

রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ কি ভাবে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে, সৌভাগ্যবশতঃ তার আদি ইতিহাসটুকু রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই পাচ্ছি।—

> যখন বালক ছিলুম ঘরের কোণের বাতায়নে বসে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোটো পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইরের দিক্ থেকে দেশের এমন কোনো মূর্তি দেখিনি যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে। বিদেশী বণিকের হাতে-গড়া কলকাতা শহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা সুগভীর ও সুদূরবিস্তৃত। সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম বলেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।
>
> এমন সময়ে আমার আট-নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছুকালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের এক বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহুদেশ বহুকাল ও বহুচিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই নদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞান ধর্ম তপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।
>
> তারপর আর কয়েক বৎসর পরেই পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয় পর্বতে নিয়ে যান।···এই প্রথম দেখেছি হিমালয় পর্বতকে। ···হিমালয় এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের—যা একদিকে দুর্গম, আর-এক দিকে সর্বজনীন।
>
> — কালান্তর', বৃহত্তর ভারত

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপটিও যে-আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সে আলোক হচ্ছে পুণ্যের

আলোক, সত্যের আলোক, কল্যাণের আলোক। ভারতবর্ষের বাইরের রূপটিকেও তিনি তাঁর অন্তরের আলোকেই উজ্জ্বল করে দেখেছেন এবং তার কাছে হৃদয়ের ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করেছেন। ভারতবর্ষের এই অপূর্ব কল্যাণময় পুণ্যমূর্তি রবীন্দ্রকাব্যে যেভাবে ফুটে উঠেছে আর কোনে কবির রচনাতে তার তুলনা দেখিনে। ভারতবর্ষের নদী-পর্বত-প্রান্তরের বাহ্য সৌন্দর্য, বাহ্য গৌরব ও বাহ্য বিশালতার বর্ণনাই সাধারণতঃ দেখি আমাদের সাহিত্যে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভারতদৃষ্টিতে যে একটি অপূর্ব মহিমা ফুটে উঠেছে তা অতুলনীয়। পূর্বে তাঁর রচনা থেকে যে-সমস্ত গদ্যাংশ উদ্ধৃত করেছি তাতেও দেখা গিয়েছে ভারতের ভৌগোলিক মূর্তিকেও তিনি কি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন। মহাভারতবর্ষ, বৃহৎ ভারতভূমি, ভারতের মহাক্ষেত্র, ভারতের পুণ্যভূমি, ভারততীর্থ প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগের মধ্যে যে শ্রদ্ধানত মনোভাবটি ফুটে উঠেছে, তাঁর কবিতায় ও গানে তাই পূজা ও আত্মনিবেদনের সুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপূর্ব মহিমায় মাহমান্বিত হয়ে উঠেছে।—

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে, দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল-নভতল,
বিমল আলোকে চির উজ্জ্বল
নীরব আশিস-সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ 'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে. হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা মোর সনাতন স্বদেশে।

—উৎসর্গ, ১৬

এ দৃষ্টি হৃদয়ের দৃষ্টি। অন্তরের রূপ দেখতে হলে অন্তরের দৃষ্টিই চাই। বাহ্য দৃষ্টিতে অন্তরের রূপ ধরা পড়ে না। ভারততীর্থ কবিতাটির প্রথমেই

আছে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপের ধ্যান, তার পরে আছে তার ঐতিহাসিক ও ভাবরূপের স্তবমন্ত্র। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বরূপকেও অন্তরের দৃষ্টিতে দেখার সাধনা প্রকাশ পেয়েছে ওই প্রথমাংশটিতে। তাই তো তিনি বলতে পেরেছেন—

ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

—গীতাঞ্জলি, ১০৬

গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথমেই ভূ ভুর্বঃ স্বঃ বলে চিত্তকে জগতের বিশ্বমূর্তির ধ্যানে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলে। এও যেন ঠিক সেই রকম ভারতবর্ষের সত্যস্বরূপকে অন্তরে ধারণা করবার পূর্বে তার ভূস্বরূপের ধ্যানের উদ্‌বোধনমন্ত্রবিশেষ।

এই ভারতভূমি শুধু যে পুণ্যভূমি তা নয়; সে যে আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের "জনকজননী-জননী"। এই কল্যাণরূপিণী ভারতভূমির কল্যাণ-হস্তের স্পর্শে বিশ্বপৃথিবী কৃতার্থতা লাভ করেছে।—

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
অয়ি জনকজননী-জননী!
নীলসিন্ধুজলধৌত-চরণতল,
অনিলবিকম্পিতশ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভাল হিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী।...
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিতকরুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী।

—কল্পনা, ভারতলক্ষ্মী (১৩০৪)

যে দেবতাত্মা হিমালয়পর্বত কালিদাসের লেখনীতে বিরাট্ ভারতাত্মা রূপ ধারণ করে আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে, সেই ধ্যানগম্ভীর ভূধরটিও কি-ভাবে রবীন্দ্রনাথের বালক-বয়সেই তাঁর মনে একটা বিশাল ও গম্ভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। পরিণত বয়সেও ওই হিমাদ্রি তাঁর চিত্তে কি অপূর্ব মূর্তিতে প্রতিভাত হয়েছে, তার প্রমাণ রয়েছে 'উৎসর্গ' কাব্যে।—

> তুমি আছ হিমাচল, ভারতের অনন্তসঞ্চিত
> তপস্যার মতো।···
> একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি
> ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করেছে আকূতি,
> সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
> শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বাসিছে মেঘধূম্রস্তূপে।
> ···ভারতের হৃদয়-সমুদ্র এত কাল
> করিয়াছে উচ্চারণ ঊর্ধ্বপানে যে বাণী বিশাল,—
> অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে,
> রেখেছ সঞ্চয় করি, হে হিমাদ্রি, তুমি স্তব্ধ শিরে।
> তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
> ভারতের পরিচয় শান্ত-শিব-অদ্বৈতের সনে।
>
> —উৎসর্গ, ২৭

রবীন্দ্রনাথের এই যে ভারতদৃষ্টি যার ফলে তিনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সত্তার মধ্যে তার মানস সত্তার রূপ দেখতে পান, সেই দৃষ্টি ভারতবর্ষেরই সনাতন দৃষ্টি। এ দৃষ্টির পরিচয় পাই ভারতবর্ষেরই পুরাণে এবং মহাভারতে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ দৃষ্টি ঠিক আধুনিক কালের স্বাদেশিকতার অর্থাৎ patriotism-এর দৃষ্টি নয়, এ দৃষ্টি হচ্ছে ভারতেরই ধ্যানদৃষ্টি। বিষ্ণুপুরাণের 'ভারতবর্ষবর্ণন' অধ্যায়ে এই দৃষ্টির অতি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

> উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
> বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥···
> অত্র ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
> যতোহি কর্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ ॥···

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ২।৩।১, ২২, ২৪

অর্থাৎ সমুদ্রের উত্তর এবং হিমালয়ের দক্ষিণবর্তী যে ভূভাগ ভারতবর্ষ নামে খ্যাত, জম্বুদ্বীপের সমস্ত দেশের মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ। কেননা, অন্য সব দেশই ভোগভূমি, কিন্তু ভারতবর্ষ হচ্ছে কর্মভূমি। তাই দেবতাদের মধ্যেও ভারতবর্ষের এই গৌরবগীতি প্রচলিত আছে যে, "ভারতভূমি হচ্ছে স্বর্গ ও ধর্মাদি অপবর্গ লাভের মার্গস্বরূপ, সেই ভারতভূমিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা দেবতাদের চেয়েও ধন্য"।

লক্ষ করবার বিষয় এই যে, অন্য সমস্ত দেশই ভোগভূমি কিন্তু ভারতবর্ষ হচ্ছে কল্যাণ ও পুণ্যকর্মের ভূমি এবং সে-জন্যেই পুরাণে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথও তাঁর বহু প্রবন্ধে ঠিক এই কথাটিই নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা আমাদের কাছে প্রতিপন্ন করেছেন। আরও লক্ষ করা উচিত যে, পুরাণে ভারতভূমিকেই স্বর্গাপবর্গস্বরূপ মানুষের পরমার্থলাভের মার্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুরাণকথিত 'ভারতমার্গ' আর রবীন্দ্রব্যাখ্যাত 'ভারতপথ' একই বস্তু। জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ প্রভৃতি সমস্ত মার্গের সমন্বয়স্থল-স্বরূপ যে মহামার্গ, তারই নাম ভারতমার্গ।

যা হক, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সত্তার এই যে ভাবময় রূপের পরিচয় পেলাম পুরাণে, তার পূর্ণতর পরিচয় পাই মহাভারতে। বৃহৎ ভারতবর্ষের একটি গভীর পরিচয় সংহত হয়ে আছে মহাভারত নামটির মধ্যেই। ভারতবর্ষীয় ভূসত্তার যে অপূর্ব রূপ ভারতীয় অন্তরের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে তার মর্মকথাও রবীন্দ্রনাথই আমাদের জানিয়েছেন।—

> ভারতবর্ষের একটি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক মূর্তি আছে। এর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান, প্রাচীন কালে তার ছবি অন্তরে গ্রহণ করার ইচ্ছে দেশে ছিল দেখতে পাই।··· ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি করবার একটি

অনুষ্ঠান ছিল, সে তীর্থভ্রমণ। দেশের পূর্বতম অঞ্চল থেকে পশ্চিমতম অঞ্চল এবং হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র এর পীঠস্থান রয়েছে, সেখানে তীর্থ স্থাপিত হয়ে একটি ভক্তির ঐক্যজালে সমস্ত ভারতবর্ষকে মনের ভিতরে আনবার সহজ উপায় সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ। একে সম্পূর্ণভাবে মনের ভিতরে গ্রহণ করা প্রাচীন কালে সম্ভবপর ছিল না। আজ সার্ভে করে মানচিত্র এঁকে ভূগোলবিবরণ গ্রথিত করে ভারতবর্ষের যে ধারণা মনে আনা সহজ হয়েছে, প্রাচীন কালে তা ছিল না। এক হিসাবে সেটা ভালোই ছিল। সহজ ভাবে যেটা পাওয়া যায়, মনের ভিতরে তা গভীরভাবে মুদ্রিত হয় না। সেইজন্য কৃচ্ছ্র সাধন করে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হত, তা সুগভীর এবং মন থেকে সহজে দূর হত না।

…সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে-বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল ধর্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত। মহাভারত-পাঠ যে আমাদের ধর্ম-কর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক্ থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করবার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে। আর, তীর্থযাত্রীরাও ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে দেশকে স্পর্শ করতে করতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ-ভাবে ক্রমশঃ এর ঐক্যরূপ মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন।

—প্রবাসী, ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ২৪৪

ভারতবর্ষের যা সত্য পরিচয় তার—

আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তা হলেই আমরা ধন্য। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে। এই কথাটি যদি ধ্রুব করে মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তা হলে আমরা নিজেকে বিশুদ্ধ করে ভারতবাসী বলতে পারব।

—কালান্তর, বৃহত্তর ভারত

কিন্তু যে সত্য ভারতবর্ষ অন্তরে উপলব্ধি করেছিল, তার—

> আলোকদীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বন্ধ রাখতে পারেনি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ড-সীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল।

আর সত্যের আলোকে আত্মপ্রকাশের এই প্রেরণাতেই—

> আপন সীমার বাধা সে ভাঙতে পেরেছে, বাইরের ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্র পারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।
>
> —কালান্তর, বৃহত্তর ভারত

আধুনিক কালের পরিক্রমার দ্বারা যাঁরা ভারতবর্ষকে ঘনিষ্ঠ ও সত্যরূপে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। কিন্তু ভারতবর্ষকে সত্যতর রূপে এবং নিত্যকালের আলোকে উজ্জ্বলতর রূপে প্রত্যক্ষ করার অভিপ্রায়ে তিনি যাত্রা করলেন বৃহত্তর ভারত পরিক্রমায়। গেলেন চীনে-জাপানে, সিয়ামে-ব্রহ্মে, জাভায়-বালীতে। ভারতবর্ষের সীমার বাইরে বৃহত্তর ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দূরের থেকে স্বদেশের মূর্তিকে তিনি যে নূতন দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন, তার কথা বলেই এই আলোচনা সমাপ্ত করব। বালী-দ্বীপের রাজা যখন প্রসঙ্গ-ক্রমে "সুমেরু-হিমালয়-বিন্ধ্য-মলয়-ঋষ্যমূক, গঙ্গা-যমুনা-নর্মদা-গোদাবরী-কাবেরী-সরস্বতী" প্রভৃতি ভারতীয় পুরাণোক্ত ভৌগোলিক নামমালা আবৃত্তি করে গেলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের মনে কি সুগভীর শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছিল তার পরিচয় রয়েছে তাঁর জাভাযাত্রীর পত্রে।—

> আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল। তখন সে আপনার নদীপর্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। তার তীর্থগুলি এমন করে বাঁধা হয়েছে—দক্ষিণে কন্যাকুমারী, উত্তরে মানস-সরোবর, পশ্চিম সমুদ্রতীরে দ্বারকা, পূর্বসমুদ্রে গঙ্গাসংগম—যাতে করে তীর্থভ্রমণের দ্বারা ভারতবর্ষের

সম্পূর্ণ রূপটিকে ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে গভীর ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু ভারতবর্ষের ভূগোল জানা যেত তা নয়, তার নানাজাতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনিই হত। সেদিন ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি একটা সত্য সাধনা ছিল বলেই তার আত্মপরিচয়ের পদ্ধতিও আপনিই এমন সত্য হয়ে উঠেছিল।...
সেদিনকার ভারতবর্ষের এই আত্মমূর্তি-ধ্যান সমুদ্র পার হয়ে পূর্ব মহাসাগরের এই সুদূর দ্বীপপ্রান্তে এমন করে স্থান পেয়েছিল যে, আজ হাজার বছর পরেও সেই ধ্যানমন্ত্রের আবৃত্তি এই রাজার মুখে ভক্তির সুরে বেজে উঠল—এতে আমার ভারি বিস্ময় লাগল। এই সব ভৌগোলিক নামমালা এদের মনে আছে বলে নয়, কিন্তু যে-প্রাচীন যুগে এই নামমালা এখানে উচ্চারিত হয়েছিল সেই যুগে এই উচ্চারণের কী গভীর অর্থ ছিল সেই কথা মনে করে। সেইদিনকার ভারতবর্ষ আপনার ঐক্যটিকে কত বড়ো আগ্রহের সঙ্গে জানছিল এবং সেই জানাটিকে স্থায়ী করবার জন্যে ব্যক্ত করবার জন্যে কী রকম সহজ উপায় উদ্‌ভাবন করেছিল তা স্পষ্ট বোঝা গেল আজ এই দূর দ্বীপে এসে—যে দ্বীপকে ভারতবর্ষ ভুলে গিয়েছে। রাজা কী রকম উৎসাহের সঙ্গে হিমালয়-বিন্ধ্যাচল-গঙ্গা-যমুনার নাম করলেন, তাতে কি রকম তাঁর গর্ব বোধ হল! অথচ এ-ভূগোল বস্তুতঃ তাঁদের নয়...পৃথিবীতে ভারতবর্ষ জায়গাটি যে কোথায় এবং কী রকম, সে সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ তাঁর অস্পষ্ট ধারণা। ...তবুও হাজার বছর আগে এই নামগুলির সঙ্গে যে সুর মনে বাঁধা হয়েছিল সেই সুর আজও এদেশের মনে বাজছে। সেই সুরটি কত বড়ো খাঁটি সুর ছিল তাই আমি ভাবছি। আমি কয়েক বছর আগে ভারতবিধাতার যে-জয়গান রচনা করেছি তাতে প্রদেশগুলির নাম গেঁথেছি—বিন্ধ্য-হিমাচল যমুনাগঙ্গার নামও আছে। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্র-পর্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবলমাত্র একটি দেশপরিচয়-গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া ভালো। দেশাত্মবোধ বলে

একটা শব্দ আজকাল আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি,
কিন্তু দেশাত্মজ্ঞান নেই যার তার দেশাত্মবোধ হবে কেমন করে ?
—জাভাযাত্রীর পত্র, ১০ আগষ্ট ১৯২৭

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা তাঁরই সংকল্পিত ভৌগোলিক নামগাঁথা দেশপরিচয়ের গান পাই নি। কিন্তু যে দেশাত্মজ্ঞানের অভাবের কথা তিনি পুনঃপুনঃ বলেছেন এবং অন্যত্র যে দেশ-দেখা চোখের অভাবের জন্যে দুঃখ করেছেন, সেই দেশাত্মজ্ঞান এবং দেশ-দেখা দৃষ্টি লাভ করতে হলে আমাদের পক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্যেরই আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাঁর রচনায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক রূপের যে অভিব্যক্তি ঘটেছে সেটিও খুবই ঔৎসুক্যকর। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাই রবীন্দ্রদৃষ্ট বাংলাদেশের ভৌগোলিক রূপবৈচিত্র্য সম্বন্ধে এস্থলে কোনো কথাই বলা গেল না।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রূপ

১

ভারতবর্ষ চিরকালই রবি-উপাসক। সেই সুদূর বৈদিক যুগেও সূর্যের জ্যোতির্মহিমা ভারতবর্ষের চিত্তকে যেভাবে মুগ্ধ ও উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, তেমন আর কিছুই নয়। তার প্রমাণ এই যে, সেই আদিকালে যে সাবিত্রী-মন্ত্র সরস্বতী নদীর তীরে ঋষিকণ্ঠে প্রথম উদ্‌গীত হয়েছিল সে মন্ত্র ক্রমবিস্তার লাভ করে আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র ত্রিসন্ধ্যা উচ্চারিত হচ্ছে। পরবর্তী কালে যে বিষ্ণু ভারতীয় দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হলেন তিনিও সূর্যেরই প্রকাশভেদমাত্র এবং বিষ্ণুচক্র হচ্ছে বস্তুতঃ রবিচক্রেরই নামান্তর। বলা বাহুল্য সূর্য ও বিষ্ণু উভয়েই বিশ্বের স্থিতি ও পালনের দেবতা। আজ যে আমাদের দেশে 'রবি'-ভক্তির এত প্রাবল্য দেখছি তার হেতু এই যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারতবর্ষের সেই চিরন্তনী স্থিতি ও পালনীশক্তি সংহত ও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষের ধ্যানদৃষ্টিতে সবিতৃদেব শুধু যে বাইরের জগৎকেই দীপ্তি দেন তা নয়, তার অন্তর্জগৎকেও উদ্‌দীপ্ত করে তোলেন। তাই সাবিত্রী-মন্ত্রের প্রার্থনা হচ্ছে, "ভর্গো দেবস্য ধিয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" অর্থাৎ তাঁর জ্যোতি আমাদের ধীশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলুন। মানুষের ধীশক্তিকে উদ্‌দীপ্ত ও উদ্‌বুদ্ধ করে তোলার এই যে অদ্ভুত ক্ষমতা, রবীন্দ্রনাথের ভাস্বর প্রতিভায় পূর্ণমাত্রাতেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তাই দীর্ঘ রজনীর অবসানে ভারতবর্ষের ধীজ্যোতির মূর্তপ্রতীকরূপে আবির্ভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন স্বজাতির চিত্তাকাশকে উদ্‌ভাসিত করে তুললেন, তখন স্বভাবতই রবির বন্দনাগানে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

> রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরিভালে।
> গাহে বিহঙ্গম পুণ্যসমীরণ নবজীবনরস ঢালে॥

এই উক্তি তো রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেই সব চেয়ে বেশি প্রযোজ্য। ভারতের পূর্বাকাশে এই যে রবির উদয় হয়েছে তার আর অস্তগমন নেই, একথা আজ আমরা নিঃসংশয়েই উপলব্ধি করেছি।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে আমাদের বর্তমান দৈন্যপ্রাপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তিনি আমাদের অতীতকে চিরকালের জন্য সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন আমাদের বর্তমানের সম্পদ্, এখন হয়েছেন অতীতের ঐশ্বর্য। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ যেমন ক্রমশঃ সুদে আসলে বেড়ে উত্তরাধিকারীকে শ্রীসম্পন্ন করে তোলে তেমনি রবীন্দ্রনাথ আমাদের অতীত ইতিহাসভাণ্ডারে যে অক্ষয় সম্পদ্ গচ্ছিত রেখে গেছেন, যত দিন যাবে ততই তা ক্রমবর্ধমান-রূপে আমাদের জাতীয় চিত্তকে সমৃদ্ধ করতে থাকবে। অতীতের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সঞ্চিত সম্পদের মূল্য কতখানি, তা ভালো করে উপলব্ধি করা চাই। একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, শুধু ভারতবর্ষ নয়, পরন্তু পৃথিবীর সকল দেশই 'স্মৃতি' শাস্ত্রের দ্বারা, অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে আগত জাতীয় অভিজ্ঞতার স্মৃতির দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই স্মৃতি-শাস্ত্রেরই অপর নাম ধর্মশাস্ত্র, কেননা এই জাতীয় স্মৃতিই সমাজকে কল্যাণের মধ্যে ধারণ করে রাখে। এই যে ধর্ম বা বিধৃতি-শক্তি, এইটিই হচ্ছে অতীতের প্রধান গুণ। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> বর্তমানে যখন নিতান্ত দুর্ভিক্ষ নিতান্ত উৎপীড়ন দেখি তখন অতীতের মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে যাই। কেন না, অতীত-কাল ধরণীর মত আমাদের অচলপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখে। যখন বাহিরে রৌদ্রের খরতর তাপ, আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়ে না, তখন শিকড়ের প্রভাবে আমরা অতীতের অন্ধকার নিম্নতম দেশ হইতে রস আকর্ষণ করিতে পারি।
>
> —'সমালোচনা', অনাবশ্যক

অতীতকাল আমাদের শিকড়ে এই যে জীবনরস সঞ্চারিত করে বর্তমানের খরতাপের মধ্যেও আমাদের সজীব ও সতেজ রাখে, অতীতের ভাণ্ডারে সে রসের জোগান দেন কারা? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, পরলোকগত অর্থাৎ দেশের স্মৃতিলোকগত মনীষীরাই অতীতের উৎস থেকে ওই প্রাণরসের জোগান দেন। অতীতের উৎসধারা শুকিয়ে গেলে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মরুভূমিতে পরিণত হবে। ব্যাস-বাল্মীকি জনক-যাজ্ঞবল্ক্য, কৃষ্ণ-বুদ্ধ, চন্দ্রগুপ্ত-অশোক, কালিদাস-ভবভূতি, নানক-কবীর প্রভৃতি আমাদের স্মৃতিলোকবাসী মনীষীরা যদি আমাদের জীবনরসের ধারাকে অব্যাহত না

রাখতেন, তাহলে বর্তমানের ঊষরক্ষেত্রে আমরা কি একেবারেই শুকিয়ে মরতাম না ? সৌভাগ্যবশতঃ আজ রবীন্দ্রনাথও আমাদের অক্ষয়স্মৃতিস্বর্গবাসী অমরবৃন্দের মধ্যে উপনীত হয়ে এই মুমূর্ষু জাতির চিত্তে অফুরন্ত অমৃতরস সঞ্চারের ভার নিলেন। অতএব আর ভয় নেই, আমাদের আর ভয় নেই। যে জাতির স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের মতো মহামনস্বী স্থান নিয়েছেন, সে জাতির আর জগতের কাছে বিস্মৃত ও উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা নেই।

২

যথার্থ মনস্বী যাঁরা, আমাদের দেশে তাঁদের ত্রিকালদর্শী বলে আখ্যাত করা হয় এবং স্থলবিশেষে এই ত্রিকালদর্শিতার প্রতীকস্বরূপ ত্রিনয়নের কল্পনাও করা হয়। বস্তুতঃ ত্রিকালদর্শিতাই যে মনস্বিতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ওরকম একজন ত্রিকালদ্রষ্টা মনীষী। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যেমন প্রত্যক্ষবৎ প্রতিফলিত হয়েছে, তেমন আর কারও দৃষ্টিতে হয়েছে কি না সন্দেহ। আধুনিক ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনধারার ক্ষীণতা এবং ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্টতা ও অবাস্তবতা লক্ষ করেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমাদের অতীতের উৎস প্রায় শুকিয়ে এসেছে এবং এও অনুভব করলেন যে, ওই অতীতকে যথার্থ ও যথোচিতভাবে সঞ্জীবিত করে তুলতে না পারলে বর্তমানের প্রাণধারাকে গভীর ও প্রবল করে তোলার আশা নেই। তাই বর্তমানকে জাগাবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের মূক অতীতকে কথা বলাবার সাধনাতে ব্রতী হলেন। তিনি সেই চিরবিগতকে সম্বোধন করে বললেন—

কথা কও, কথা কও;
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও।…
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।

বস্তুতঃ আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মৃত ও মূক অতীতকে যেমন জীবন্ত ভাষায় কথা বলিয়েছেন, তেমন আর কেউ পারেন নি। এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> বাংলা সাহিত্যে যে এত পুরাতত্ত্বের আলোচনা দেখা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ আমাদের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল অতীত-কালকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে।
>
> —'সমালোচনা', অনাবশ্যক

রীতিমত পুরাতাত্ত্বিক আলোচনা না করেও তিনি নিজে ভারতবর্ষের অতীতকে যেভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন, নিছক প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনাতে তা সম্ভব নয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ দেশের ঐতিহাসিক মাল-মসলা নিয়ে কারবার করেন, অতীতের দেহসংগঠন করাই তাঁদের মুখ্য কাজ। কিন্তু সে দেহে প্রাণসঞ্চার করেন দেশের কবি ও সাহিত্যিকগণ। দেশের অতীতকে এই যে নবপ্রাণে উজ্জীবিত করে তোলার সাধনা, এ হচ্ছে রবীন্দ্রসাধনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর বহু কবিতা ও নাটক এই উজ্জীবনসাধনার পূত হোমাগ্নিশিখার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে প্রসঙ্গ একটু পরে উত্থাপন করা যাবে। কিন্তু শুধু অতীতের রূপসাধনা নয়, অতীতের তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনাতেও তাঁর দৃষ্টি যে কত গভীর, তা ভাবলে চমৎকৃত হতে হয়।

৩

প্রথমেই দেখা যাক দেশের অতীতের প্রতি তাঁর মমতা কতখানি।—

> দেশ ও কালেই আমরা বাস করি। অথচ দেশের উপরেই আমাদের যত অনুরাগ। এক কাঠা জমির জন্য আমরা লাঠালাঠি করি, কিন্তু সুদূরবিস্তৃত সময়ের স্বত্ব অনায়াসেই ছাড়িয়া দিই। অথচ যদি আমরা অতীতকে হারাই তবে আমরা কতখানি হারাই! আমাদের কতটুকু প্রাণ থাকে! একটি নিমেষমাত্র লইয়া কিসের সুখ! আমাদের জীবন যদি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন জলবিম্বমাত্র হয়, তবে তাহা অত্যন্ত দুর্বল জীবন। কিন্তু আমাদের জীবনের জন্মশিখর হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরসংগম পর্যন্ত যদি যোগ

থাকে তবে তাহার কত বল! তবে তাহা পাষাণের বাধা মানিবে না।...আমি পরগাছা (মাত্র) নহি...মাটির ভিতরে প্রসারিত আমার অতীতের উপর আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, যখন পাপে তাপে শোকে কাতর হইয়া পড়ি তখন সেই তীর্থস্থানে গমন করি।...আমার এ অতীতের পথ যদি মুছিয়া যাইত তবে আমি কি হইতাম!

—'সমালোচনা', অনাবশ্যক

অতীতের সঙ্গে যোগরক্ষার এই যে প্রয়োজনীয়তা, তাকে তিনি ব্যক্তিগত, সমাজগত ও জাতিগত দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করেছেন। প্রথমেই ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত।—

কিছুই তো থাকে না, সবই তো চলিয়া যায়, তথাপি যে দুটি-একটি চিহ্ন অতীত রাখিয়া গিয়াছে, ইহাও মুছিয়া ফেলিতে চায়, এমন কে আছে?...পুরাতন দিনের একখানি চিঠি একটি আংটি...একটা যা-হয় কিছু অত্যন্ত যত্নপূর্বক রাখিয়া দেয় নাই, এমন কেহ আছে কি? যাহার জ্যোৎস্নার মধ্যে পুরাতন দিনের জ্যোৎস্না, যাহার বর্ষার মধ্যে পুরাতন দিনের মেঘ লুকায়িত নাই, এত বড় অপৌত্তলিক কেহ আছে কি? পৌত্তলিকতার কথা বলিলাম, কেন না, প্রত্যক্ষকে দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌত্তলিকতা। জগৎকে দেখিয়া জগতাতীতকে মনে আনা পৌত্তলিকতা। একটি চিঠি দেখিয়া যদি আমার অতীত কালের কথা মনে পড়ে তবে তাহা পৌত্তলিকতা নহে তো কি? ঐ চিঠিটুকু আমার অতীত-কালের প্রতিমা। উহার কোনো মূল্য নাই, কেবল উহার মধ্যে আমার অতীতকাল প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই উহার এত সমাদর।

অতঃপর এ বিষয়টারই সামাজিক দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন।—

আমাদের আচারব্যবহারে কতকগুলি চিরন্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সেগুলি ভালও নয়, মন্দও নয়, কেবল দোষের মধ্যে তাহারা অনাবশ্যক, তাহাদের দেখিয়া কঠোর জ্ঞানবান্ লোকের মুখে হাসি আসে, এই ছুতায় তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে। মনে

> করিলে তুমি কতকগুলি অর্থহীন অনাবশ্যক হাস্যরসোদ্দীপক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে মাত্র—কিন্তু আসলে কি করিলে! সেই অর্থহীন প্রথার মন্দিরমধ্যে অধিষ্ঠিত সুমহৎ অতীতদেবকে ভাঙিয়া ফেলিলে...তোমার পূর্বপুরুষদিগের একটি স্মরণচিহ্ন ধ্বংস করিয়া ফেলিলে। তোমার কাছে তোমার মায়ের যদি একটি স্মরণচিহ্ন থাকে, বাজারে তাহার দাম নাই বলিয়া তোমার কাছেও যদি তাহার দাম না থাকে তবে তুমি মহাপাতকী। তেমনি অনেক-গুলি অর্থহীন প্রথা পূর্বপুরুষদিগের ইতিহাস বলিয়াই মূল্যবান্।

এই কটি কথার মধ্যে নিজের সমাজ ও তার অতীতের প্রতি কি ঐকান্তিক অনুরাগ ও সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এবার জাতিগতভাবে দেশের অতীতের প্রতি তিনি কি মনোভাব পোষণ করতেন দেখা যাক—

> ইতিহাস সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যায়। আজ দৈবাৎ যদি (কালিদাসের) স্বহস্তে লিখিত মেঘদূত পুথিখানি পাই, তবে তাঁহার অস্তিত্ব আমার পক্ষে কেমন জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে।...ইহা হইতে তীর্থযাত্রার একটি প্রধান ফল অনুমান করা যায়। আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি সেই তীর্থে যাই যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপর বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই! যখন দেখি ফুটন্ত ছুটন্ত বর্তমান-স্রোতের উপর পুরাতন কালের একটি...জীর্ণ অবশেষ নিশ্চলভাবে বসিয়া... অতীতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে তখন, এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে, যে মুহূর্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই মহা-অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে!
>
> —'সমালোচনা', অনাবশ্যক

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘজীবনে এই মহা-অতীতের দিকে বার বার মুগ্ধনেত্রে ফিরে তাকিয়েছেন এবং আমাদের দৃষ্টিকেও সেদিকে উৎসুক করে তুলেছেন।

৪

তাই তিনি জোর করেই বলেছেন—

> যেসকল দেশ ভাগ্যবান্, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উলটা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।
>
> —'ভারতবর্ষ', ভারতবর্ষের ইতিহাস

যে-ইতিহাস এমন করে আমাদের মাতৃভূমিকে আমাদের দৃষ্টি থেকে আচ্ছন্ন করে রাখে, অন্যত্র তাকে তিনি 'বিদেশীর ইতিবৃত্ত' বলে বর্ণনা করেছেন। এই বৈদেশিক ইতিবৃত্তই আমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটায়। তাকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—

> অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ,
> ওগো মিথ্যাময়ী,
> তোমার লিখন 'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
> হবে আজি জয়ী।

এই মিথ্যা ও ভ্রান্ত দৃষ্টির জালকে ছিন্ন করে স্বদেশের তথা তার ইতিহাসের সত্যরূপকে উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়োজনীয়তা যে কতো গুরুতর, সেদিকে তিনি আমাদের দৃষ্টিকে পুনঃপুনঃ আকর্ষণ করেছেন। কেন না, এই মিথ্যাময়ী বৈদেশিক ইতিবৃত্তকথার বহির্ভূত যে ভারতবর্ষ—

> সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ। সেই যোগের বহু বর্ষ-কালব্যাপী ঐতিহাসিক সূত্র বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের হৃদয় আশ্রয় পায় না।..নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধকে এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে, কোথা হইতে আমরা প্রাণরস আকর্ষণ করিব?
>
> —'ভারতবর্ষ', ভারতবর্ষের ইতিহাস

দেশের সত্য ইতিহাস উদ্ধারের গুরুত্বের কথা এমন করে আর কে বলেছেন?

শুধু তাই নয়, কোন্ ঐতিহাসিক পথে অগ্রসর হলে দেশের মর্মকেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যাবে, তার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। "ইতিহাস সকল দেশে

সমান হইবেই এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়", এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করে তিনি নানাস্থানে নানাপ্রকারে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, পোলিটি-ক্যাল বা রাষ্ট্রীয় উত্থানপতনের কাহিনীই ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান কথা নয়।—

> ইংরাজের ছেলে জানে তাহার বাপপিতামহ অনেক যুদ্ধজয়, দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যব্যবসায় করিয়াছে, সেও নিজেকে রণগৌরব, ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি আমাদের পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যবিস্তার করেন নাই—এইটে জানাইবার জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাঁহারা কি করিয়াছিলেন জানি না, সুতরাং আমরা কি করিব তাহাও জানি না।…ছেলেবেলা হইতে আমরা যে শিক্ষা পাই তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহভাব জন্মে।—

অথচ

> রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক্ হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সেই নিজের দিক্ হইতে ভারতবর্ষকে না দেখিয়া আমরা শিশুকাল হইতে তাহাকে খর্ব করিতেছি ও নিজে খর্ব হইতেছি।
>
> —'ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতবর্ষের নিজের সেই বিশেষ দিক্‌টি কি, তাও তিনি দেখিয়েছেন। সেটি হচ্ছে ভারতবর্ষের ধর্মনীতি সমাজব্যবস্থা ও চিন্তাবৈশিষ্ট্যের দিক্। বৈদেশিক ইতিবৃত্তকারও এ কথার সত্যতা অস্বীকার করতে পারেন নি।—

> The more attractive story of the development of Indian thought is expressed in religion and philosophy, literature, art and science.
>
> —V. A. Smith.

তা-ছাড়া, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ নিছক তথ্যপরতা থেকে আকর্ষণ করে তত্ত্ব বা সত্যের দিকে ফেরাতেও প্রয়াস করেছেন। ভারতীয় ইতিহাসের মর্মগত তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে

ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া…বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

—'ভারতবর্ষ', ভারতবর্ষের ইতিহাস

এই উক্তির (১৯০২) বহুকাল পরে (১৯২০) ভিনসেন্ট স্মিথও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে—

India offers unity in diversity…India beyond all doubt possesses a deep underlying unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or by political suzerainty. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners and sects.

এই যে বৈচিত্র্যময় ঐক্য, এতো ভারতবর্ষের ঐকান্তিক ঐতিহাসিক সাধনারই ফল। এই ঐক্যসাধনার প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার, সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের মর্মগত ঐক্যতত্ত্ব স্বীকার করেও ওই ঐক্যের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে বলেছেন—

But the limitations of that unity are many.

ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনা যে আজও সমাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করেনি, তার প্রতি লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করে বলেছেন—

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে।

যা হক, উক্ত ঐক্যসাধনার ফলে ভারতীয় ইতিহাস যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই…স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে।…পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই।… ভারতবর্ষ পুলিন্দ শবর ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে…নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে।…এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি।…ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

—'ভারতবর্ষ', ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতীয় প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যের কথা ঐতিহাসিকগণ আজ সম্পূর্ণ সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষিতসম্প্রদায় আজও এ কথার তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

যা হক, রবীন্দ্রনাথ ভারতপ্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য এবং তার ইতিহাসের ঐক্যতত্ত্বের কথা বলেই নিরস্ত হননি, নানা প্রবন্ধে তিনি ওই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের ইতিহাসের তথ্যবিশ্লেষণেও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টির অব্যর্থ লক্ষপরতাও কম বিস্ময়ের বিষয় নয়। এস্থলে সে প্রসঙ্গের উত্থাপন করব না।

৫

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হচ্ছে ভারতীয় ইতিহাসের দীর্ঘকাল বিস্মৃত অথচ মর্মগত ও গভীর ব্যঞ্জনাময় কাহিনীগুলিকে কবিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করে তোলা।

দূরে বহু দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

এই কয়েকটি পংক্তির মধ্য দিয়ে কবি যেন আমাদের সকলকেই বহু পূর্বজন্মের স্মৃতিমাখা ঐতিহাসিক স্বপ্নলোকে ফিরে যাবার পথরেখাটি দেখিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। কবি নিজেই বলেছেন যে, কালিদাসের মেঘদূত কাব্য পাঠকালে—

গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশে দেশান্তরে।
এইরূপে মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাও তেমনি মুক্তগতি মেঘের মতোই আমাদের মনকে যুগযুগান্তর পার করে অতীত ইতিহাসের অলকাপুরীতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 'মানসী'র 'মেঘদূত', 'ক্ষণিকা'র 'সেকাল', 'কল্পনা'র 'স্বপ্ন' প্রভৃতি কবিতায় কালিদাসের কালটি দীর্ঘ বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের চোখে মোহময় স্বপ্নের আলোকে যে অপূর্ব রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে, তার তুলনা নেই। তখন স্বতই কবিকে সম্বোধন করে বলতে ইচ্ছে করে—

সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে তুমি ছাড়া, করি অবারিত
কবির বিলাসপুরী—অমর ভুবনে!

শুধু কালিদাসের কাল নয়, ভারত-ইতিহাসের প্রত্যেক যুগের ছবিই রবীন্দ্রনাথের চিত্রতুলিকাস্পর্শে সজীব ও অমর হয়ে ফুটে উঠেছে।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি
ধরিতে দরিদ্রবেশ, শিখায়েছ বীরে।
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে।

ইত্যাদি কয়েকটি পংক্তির মধ্যে ভারতবর্ষের অন্তরের চিরন্তন ভাবরূপটিকে যে অক্ষয় বর্ণে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা আমাদের হৃদয়েও চিরন্তন হয়েই বিরাজ করবে। 'চিত্রা' কাব্যের 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটিতে যেন সমগ্র উপনিষদের যুগটাই সজীব হয়ে ধরা দিয়েছে। মনে হয় একদিকে কালিদাসের কাল এবং অপর দিকে বুদ্ধদেবের কাল, প্রাচীন ইতিহাসের এই দুটি যুগই যেন রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল। 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'মূল্যপ্রাপ্তি', 'নগরলক্ষ্মী' প্রভৃতি বহু কবিতায় এবং 'চণ্ডালিকা' ও 'নটীর পূজা' নাটকে বুদ্ধদেব ও তাঁর যুগের মর্মকথাটি এমনভাবে মূর্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে, যেন বহু শতাব্দীর ব্যবধানে আজও আমরা তার হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারি।

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দমূরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধা হাস্য-জ্যোতি।

এই দুটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে বুদ্ধদেবের দেহমনের যে রূপ ফুটে উঠেছে, নিপুণতম চিত্রকর বা ভাস্করের পক্ষেও তা লোভের বিষয়। 'গুরুগোবিন্দ', 'বন্দীবীর', 'শেষ শিক্ষা', 'প্রার্থনাতীত দান' প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র কবিতা শিখ-ইতিহাসের অন্তরের রূপকে আমাদের কাছে যেমন প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় করে তোলে, বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের পক্ষেও তা সহজসাধ্য নয়। এইরূপে মারাঠা রাজপুত এবং কবীর তুলসীদাস-প্রমুখ সাধকগণের যে যথার্থ ইতিহাস, তারই মর্মস্পন্দনকে সামান্য কয়েকটি কবিতার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরে প্রতিস্পন্দিত করে তুলেছেন। বস্তুতঃ তাঁর 'কথা' কাব্যখানিকে ভারত-ইতিহাসের মর্মকোষ বলে অভিহিত করলে কিছু-মাত্র অন্যায় হয় না। এই প্রসঙ্গে 'কাহিনী' গ্রন্থখানিও উল্লেখযোগ্য। 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'ভাষা ও ছন্দ', 'পতিতা', 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি রচনার মধ্যে যেমন রামায়ণকাহিনীর প্রতিরূপ ফুটে উঠেছে, তেমনি 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'বিদায়-অভিশাপ', 'নরকবাস' প্রভৃতি রচনাতে মহাভারত-উপাখ্যানের এককেটি তরঙ্গ যেন আমাদের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কিংবা তাঁর সমকালে আর কারও রচনায়

সত্যকাম জাবালের সময় থেকে পেশোয়া রঘুনাথ রাওএর সময় (১৭৭৩) পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের এত বিভিন্ন যুগের এত বিচিত্র কাহিনী এমন গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠেনি। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি কাব্যে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকে আশ্রয় করা হয়েছে বটে, কিন্তু সে-সব উপাখ্যান কাব্যকথার অবলম্বনরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। বঙ্কিমসাহিত্যে অনেকগুলি ঐতিহাসিক কথার সাক্ষাৎ পাই বটে, কিন্তু সেগুলিও উপন্যাসরচনার উপলক্ষ মাত্র। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যে ইতিহাসের বিষয়কেই কাঠামোরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কারও রচনাতেই যথার্থ ইতিহাসের যা প্রাণ বা মর্মকথা তা ধরা পড়েনি, অর্থাৎ ভারতবর্ষের জীবনবাণী ওসব কাহিনীর মধ্যে ধ্বনিত হয়নি। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস এবং দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি সম্বন্ধেও একথা অল্পাধিক প্রযোজ্য। সত্যেন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতাতেও ঐতিহাসিক আখ্যান প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেগুলি ঘটনার পঞ্জী বা ইতিহাসের কঙ্কালমাত্র। বস্তুতঃ যেসব ঐতিহাসিক ঘটনার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের জীবন মাঝে মাঝে উজ্জ্বল শিখায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে, সে সব ঘটনার ঐতিহ্য রবীন্দ্রসাহিত্যে যেমন চিরন্তনরূপে প্রতিফলিত হয়েছে তেমন আর কারও রচনায় হয়নি, একথা বললে বোধ করি কারও প্রতি অবিচার করা হবে না।

৬

পূর্বে বলেছি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ত্রিকালদর্শী মনীষার অধিকারী। তাঁর অতীতদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কতকটা বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা গেল। তাঁর সমকালীন ঘটনাবলীকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার বিশ্লেষণ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে তার একাংশ দেখানোও সম্ভব নয়। তাঁর দীর্ঘজীবনকালে ভারতবর্ষে যে ঘটনার ধারা খরগতিতে প্রবাহিত হয়ে গেছে সে এক বিরাট্ ইতিহাস; অথচ সে মহা-ইতিহাসের প্রত্যেকটি গুরুত্বময় ঘটনাই রবীন্দ্রসাহিত্যে গভীরভাবে রেখাঙ্কিত হয়ে আছে। ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল, অর্থাৎ লর্ড লিটনের সময়কার দিল্লী-দরবার থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কোনো বৃহৎ ঘটনাই তাঁর অনুভূতি তথা

সাহিত্যকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। তার যথার্থ মূল্য নির্ণয়ের সময় এখনও আসেনি, ভাবী কালের জন্যে তাকে এখনও দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনকালটা হচ্ছে ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণ। যে কালের ত্রিবেণীসঙ্গমে তিনি তাঁর সোনার তরী নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন তার উত্তাল বর্তমানের তরঙ্গরাশির চূড়ায় চূড়ায় একদিক্ থেকে সুদূর বিগতের নব-ব্যঞ্জনার আভা এবং অপর দিক্ থেকে আসন্ন সম্ভাব্যতার অরুণ কিরণ পড়ে তাকে অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত করে তুলেছিল; তারই প্রতিচ্ছায়া রবীন্দ্রসাহিত্যকে এমন মায়ার আলোকে অনুরঞ্জিত করে তুলেছে। তাই তাঁকে যেমন একদিকে ভারতবর্ষের বিগত মহিমার দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকতে দেখি, তেমনি তাঁকে অনাগতের উজ্জ্বল আবির্ভাবের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে থাকতেও দেখি। ওই আবিষ্ট দৃষ্টির আভাসই প্রতিফলিত হয়েছে এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে।

ওগো মা
　　তোমার কি মুরতি আজ দেখি রে!

তোমার
　　দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

তোমার
　　মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,

তোমার
　　আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী।
　　　　কোথা সে তোর দরিদ্রবেশ,
　　　　　কোথা সে তোর মলিন হাসি,
　　　　আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
　　　　　ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।

ওগো মা
　　তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।

তোমার
　　দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

অনাগত ভারতবর্ষের এই অপূর্ব রূপের কথা আরও বহু কবিতাতেই ধ্বনিত হয়েছে। যেমন—

১ হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কি বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
নয়ন মুদিয়া ভাবীকাল পানে
চাহিনু শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গলবিজয়শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।

২ এ দুখ বহন করো মোর মন,
শোনোরে একের ডাক,
যত লাজ ভয় করো করো জয়,
অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ,
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

৩ সে উদার প্রত্যুষের প্রথম অরুণ
যখনি মেলিবে নেত্র প্রশান্ত করুণ
শুভ্রশির অভ্রভেদী উদয়শিখরে,
হে দুঃখী জাগ্রত দেশ, তব কণ্ঠস্বরে
প্রথম সংগীত তার যেন উঠে বাজি,
প্রথম ঘোষণা ধ্বনি।

বালককাল থেকে এই মহাপ্রভাতের জন্ম তাঁর হৃদয় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় দীর্ঘ জীবনের অবসান কালে তিনি তার অরুণাভাসও দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর সহস্রতন্ত্রী বীণাকে সেই পরম প্রত্যুষের আগমনী ঝঙ্কার শোনার সৌভাগ্য আমাদের হল না। তাই

জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও তাঁকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলতে হয়েছে—

> ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। ...আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।
>
> —'কালান্তর', সভ্যতার সংকট

আমরাও কবির এই আশার বাণীর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁরই ভাষায় বলব—

> জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
> সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে।
> কিন্তু তথাপি—
> সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি'
> হে ভারত সর্বদুঃখে রহ তুমি জাগি'
> সরল নির্মল চিত্তে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রূপ

দ্বিতীয় পর্যায়

রামায়ণ-মহাভারতের মহত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, এদের "সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিতেছে।" রামায়ণ-মহাভারতে "ভারতবর্ষ কি বলিতেছে, কোন্ আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ইহাই আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয়।" বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে বসলে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিই সর্বাগ্রে মনে আসে। কিছুকাল পূর্বে কোন মনস্বী বলেছিলেন ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসের পার্শ্বেই রবীন্দ্রনাথের স্থান। এই মন্তব্যের মধ্যে অতি সংক্ষেপে অথচ অতি সত্যরূপে রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপ নিরূপিত হয়ে গেছে। কেন না ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসের রচনার ন্যায় রবীন্দ্ররচনাতেও ভারতবর্ষ সমগ্ররূপে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণীই নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এই হিসাবে রবীন্দ্রসাহিত্যকে নূতন যুগের নূতন মহাভারত বলে বর্ণনা করলে অসংগত হবে না। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" এই প্রবাদবাক্য রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কেও অনায়াসেই প্রয়োগ করা চলে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচিত্র ছন্দে চিরন্তন ভারতীয় বাণীরই বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে ; তার ছন্দস্পন্দনের মধ্যে ভারতবর্ষের হৃদয়স্পন্দনই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। "আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর", এই উক্তি যে কত সত্য তা উপলব্ধি করতে না পারলে রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপই অজ্ঞাত থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়শোণিতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষেরই অন্তরের ধারা কিভাবে প্রবাহিত হয়েছে তা আমাদের জানা চাই। নতুবা তাঁর সমস্ত সাধনা আমাদের কাছে একান্তভাবেই নিরর্থক হবে।

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ বৈদিক আলোচনার আবহাওয়াতে মানুষ। বৈদিক সূক্ত ও সামগানের সুরঝঙ্কার অল্পবয়সেই তাঁর মনকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। তার ফল ফলেছে দুইভাবে। প্রত্যক্ষতঃ রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষে বৈদিক রচনার বাংলা অনুবাদ করেছেন গদ্যে ও পদ্যে। সেগুলি একত্র

সংকলিত হলে রবীন্দ্রমানসের একটা দিক্ উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হবে। উক্ত বৈদিক আবহাওয়ার পরোক্ষ প্রভাবের গুরুত্বই আমাদের কাছে বেশি। ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলিতে ঋষিকণ্ঠে প্রকৃতিবন্দনার যে অপূর্ব সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হয়েছিল, আধুনিককালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানেই তার প্রতিরূপ দেখা যায়। বৈদিক সূক্ত ও সামের সঙ্গে তুলিত হতে পারে এমন রচনা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোনো কবির কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছে কি না জানি না।

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে উপনিষদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। তার কারণও সুপরিজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় উপনিষদের ভাবধারা এমন-ভাবেই অনুস্যূত হয়ে আছে যে, এই দুইকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ আধুনিক কালের বিজ্ঞানসুলভ যুক্তিনিষ্ঠা এবং প্রাচীনকালের ঋষিসুলভ তত্ত্বদৃষ্টির সমবায়েই রবীন্দ্রমানস গঠিত হয়েছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনে এই দুই মননভঙ্গির মিলন ক্রমশই গভীরতর হয়েছে। তাঁর গদ্য ও পদ্য কত অজস্র রচনায় যে এই মিলনের ছাপ অক্ষয় হয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু-একটি রচনার কথা স্মরণ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি সামান্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত ‘চিত্রা’ কাব্যের ‘ব্রাহ্মণ’ নামক অপূর্ব কবিতাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি। ‘নৈবেদ্য’ কাব্যের অধিকাংশ কবিতাতেই উপনিষদের মনোগত পরিবেশ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সে পরিবেশকে বাস্তব রূপ দেবার প্রয়াসও রবীন্দ্রসাধনায় সুস্পষ্ট। সে সাধনার আরম্ভে তিনি ভারতের কাছে প্রার্থনা জানান—

> যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
> যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
> মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
> চিত্ত ভরিয়া লব।
> মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
> দাও সে মন্ত্র তব।

এই যে উপনিষদ্-যুগের তপোবনজীবনের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ, তারই ফলে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এখানকার

আশ্রমজীবনকে তপোবনের আদর্শেই গড়ে তোলবার কাজে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগকেও তিনি আমাদের কাছে নূতন জীবনে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছেন। 'কালমৃগয়া' ও 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটক এবং 'অহল্যার প্রতি', 'পতিতা', 'ভাষা ও ছন্দ' প্রভৃতি কবিতায় আমরা রামায়ণ-কাহিনীর মহিমা নূতন করে উপলব্ধি করি। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রামচরিত্রের মহত্ত্ব যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকে যথার্থতই অপূর্ব বলতে হয়। রঘুবংশ উত্তরচরিত বা রামচরিতমানসেও রামচন্দ্রের চরিত্র এমন উদার মহিমার অধিকারী হতে পারেনি। আর মহাভারতের গুরুত্বকে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে নানা গদ্য রচনায় আমাদের উপলব্ধিগোচর করে তুলেছেন তা নয়, মহাভারতের যুগের প্রাণস্পন্দনকেও তিনি আমাদের অনুভবগ্রাহ্য করে তুলেছেন তাঁর বিবিধ কাব্যনাট্যে। এই প্রসঙ্গে শুধু তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা', 'কচ ও দেবযানী', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতি রচনার উল্লেখমাত্র করেই ক্ষান্ত হব।

অতঃপর বৌদ্ধ যুগের কথা। বুদ্ধদেব ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে এবং মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর হৃদয় আকৃষ্ট হয়। তাঁর এই শ্রদ্ধা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই এই উক্তিতে—

> এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
> সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,···
> শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
> তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
> প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
> এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।
>
> —জন্মদিনে, ৬ (১৩৪৭, বৈশাখ ২৬)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নাটকে গানে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ যুগের কাহিনী এত অজস্র ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা যেন সে যুগটাকেই প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করি। বোধ করি ভারত-ইতিহাসের আর কোনো যুগই রবীন্দ্রসাহিত্যে এমন জীবন্ত

হয়ে উঠতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে 'মালিনী', 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা' এবং 'কথা'কাব্যের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'মূল্যপ্রাপ্তি' প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি' গানটি সুপরিচিত। এই গানটিতেও বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন বিদ্যমান। ১৯৩০ সালে সারনাথে মূলগন্ধকুটী বিহারের উদ্‌বোধন উপলক্ষে 'বুদ্ধদেবের প্রতি' নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাতেই তাঁর মনোভাবের স্পষ্টতম প্রকাশ ঘটেছে। শুধু বাণীতে নয়, কার্যেও তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে এদেশে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তার প্রমাণ বিশ্বভারতীতে পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা। এই উপলক্ষে তিনি নানা দেশ থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতকে এখানে আনান। এখানকার শিক্ষার্থীকেও সিংহলাদি বৌদ্ধ দেশে পাঠান। তিনি নিজেও সদলে সিংহল, ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, শ্যাম, চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধস্মৃতিপূত দেশে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর তৎকালীন গদ্য-পদ্য ইংরেজি-বাংলা রচনাতে ভারতের ওই মহামানব ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ধর্মপদের পদ্যানুবাদ এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের গদ্যানুবাদেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। ইদানীং কালে ওই আংশিক অনুবাদ দুইটি প্রকাশিত হয়েছে।

অতঃপর কালিদাসের যুগ। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে সমৃদ্ধ ও সুখী ভারতবর্ষের যে স্বপ্নময় রূপ কবি কালিদাসের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তা কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে একান্তভাবেই মুগ্ধ করেছে। এই মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তিনি কালিদাসের ভারতবর্ষকে কী গভীর অনুরাগের সহিত দেখেছেন তার নিদর্শন রয়েছে তাঁর প্রবন্ধে ও কবিতায়। কেন জানিনা তিনি কালিদাসের ভারতবর্ষকে কোনো নাটকে রূপ দিতে চেষ্টা করেননি। 'সেকাল'এর 'স্বপ্ন'ময় ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, সে যুগের ভারতবর্ষের সংস্কৃতিময় রূপটিও তাঁর চিত্তকে কম আকর্ষণ করেনি। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার সমালোচনা উপলক্ষে তিনি বস্তুতঃ তৎকালীন সংস্কৃতিরই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি কালিদাসের ভারতবর্ষের ছবি এঁকে এবং তাকে ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাকে সমগ্রভাবে মজ্জাগত করে নিয়েছিলেন। তাই দেখি ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে কালিদাসের প্রভাব রবীন্দ্র-

সাহিত্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে। বিশেষ করে কুমারসম্ভবের শিবের আদর্শ এবং হরপার্বতীর প্রেমের স্বরূপ, এই দুটিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে আত্মগত করে নিয়েছিলেন। এ কথা বলা অসংগত হবে না যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ধারায় উপনিষদের, তাঁর কল্পনায় কালিদাসের এবং ছন্দকলায় জয়দেবের প্রভাব অপরিসীম। 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী' ইত্যাদি কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় কবিসত্তার সঙ্গে কিভাবে কালিদাসের ভাববস্তু এবং জয়দেবের ছন্দোরীতি অবিভাজ্যরূপে মিশে গিয়েছে তা অতি সহজেই লক্ষ করা যায়।

কালিদাসের পরেই ভারতবর্ষের অবনতির যুগ। সে যুগের কোনো ছবিই আমাদের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। তাই একমাত্র কাদম্বরী-চিত্র ছাড়া সে যুগের অন্য কোনো ছবিই রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখা যায় না। তার পরে এল হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত ও সমন্বয়ের যুগ। রবীন্দ্রসাহিত্যে এ যুগের যে ছাপ দেখা যায় তাতে ওই সমন্বয়ের মহিমাই বিশেষভাবে কীর্তিত হয়েছে। তাঁর বাল্যরচনা 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকাটি পৃথ্বীরাজ, চাঁদকবি ও মহম্মদ ঘোরীর ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু এটিতে বস্তুতঃ তৎকালীন ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয়ের ছায়ামাত্রও নেই। কিন্তু কবির পরিণত বয়সের রচনায় এই যুগেরও মহত্ত্বের ছবিটি স্পষ্ট হয়েই প্রকাশ পেয়েছে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিল রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি সাধকদের জীবন ও বাণীতে। ১৩০৯ সালে রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে বৈদেশিক বিজেতাদের রাজত্বকালীন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> 'বিদেশ যখন ছিল, দেশ তখনও ছিল, নহিলে এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম, ইঁহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লী এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।'
>
> —'ভারতবর্ষ', ভারতবর্ষের ইতিহাস

তৎকালীন ইতিহাসে 'প্রকৃত ভারতবর্ষের' পরিচয় পাওয়া যেত না বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় সে পরিচয়কে সত্য রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। মধ্যকালীন প্রকৃত ভারতবর্ষের যাঁরা স্রষ্টা, কাশী ও নবদ্বীপ ছিল যাঁদের কর্মকেন্দ্র, সেই সাধকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল অল্প বয়সেই। শ্রীচৈতন্যের চরিত্রমাহাত্ম্যের কথা তাঁর বাল্যরচনাতেই পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সেই বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। সুতরাং তাঁর পক্ষে তৎকালের চৈতন্যের মহত্ত্ব উপলব্ধি বিস্ময়ের বিষয় নয়। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সাগ্রহ সহায়তায় মারাঠী সাধক তুকারামের অনেকগুলি অভঙ্গের তিনি বাংলা অনুবাদও করেন ষোল-সতের বছর বয়সেই। কবীরের চরিত্রমাহাত্ম্য তাঁকে কতখানি আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'অপমান-বর' নামক বিখ্যাত কবিতাটিতে। শিখ-গুরুদের ধর্মনিষ্ঠার প্রতিও তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল বালকবয়সেই। বারো বছর বয়সের সময় তিনি পিতার সঙ্গে অমৃতসরে মাসখানেক ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

> অমৃতসরে গুরু দরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেক দিন সকাল বেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখমন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ উপাসকদের মধ্যে বসিয়া সহসা এক সময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন।
>
> —'জীবনস্মৃতি', হিমালয়যাত্রা

সুতরাং শিখদের ধর্মনিষ্ঠা যে সেকালেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বিচিত্র নয়। এই প্রভাবের অন্যতম প্রথম ফল 'নিষ্ফল উপহার' নামক বিখ্যাত কবিতাটি (১২৯৫)। শুধু ধর্মনিষ্ঠা নয়, এই যুগের ত্যাগ, বীরত্ব, নির্ভীকতা, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতিও তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপনা ও প্রেরণা দিয়েছে। বীরত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ 'গুরুগোবিন্দ' কবিতাটি (১২৯৫) উল্লেখযোগ্য। ওই যুগে ভারতবর্ষ শিখ, রাজপুত ও মারাঠা জাতিকে আশ্রয় করে আপন মহত্ত্বে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই প্রধানতঃ এদেরই গৌরবগাথা রচনা করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর 'কথা' কাব্যটিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের আত্মস্বরূপ যেমন মূর্ত হয়ে

উঠেছে কোনো ইতিহাস গ্রন্থে তা হওয়া সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ মানসী কাব্যে এক স্থানে লিখেছেন—

জগতে যত মহৎ আছে
হইব নত সবার কাছে।

এই যে দেশকাল নির্বিশেষে সকলের মহত্ত্ব স্বীকার, তারই একটি বিশেষ-রূপ পাই 'কথা' কাব্যে। এই কাব্যে শিখ, রাজপুত, মারাঠাদের কীর্তিগাথার সঙ্গে আরঙ্‌জেবের মহত্ত্ব স্বীকারেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি, 'মানী' নামক বিখ্যাত কবিতাটিই তার নিদর্শন। দুঃখের বিষয় মধ্যযুগের বাংলা দেশের কোনো কীর্তিগাথা 'কথা' কাব্যে স্থান পায়নি। কেননা তাঁর মতে বাঙালি জগতের মৃত্যুশালা থেকে গৌরবের পাশ পায়নি। আমাদের পিতামহদের বিরুদ্ধে তাঁর সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, তাঁরা আমাদের জন্য অন্নের সংগতি রেখে গেছেন, কিন্তু মৃত্যুর সংগতি রেখে যাননি। "এত বড় দুর্ভাগ্য, এত বড় দীনতা কি হইতে পারে?" আমাদের পিতামহরা মৃত্যুগৌরবের ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত করলেও আমাদের স্বামী-সহমরণ-পরায়ণা পিতামহীরা আমাদের জন্য সেই অমূল্য অধিকারের সঞ্চয় রেখে গেছেন। তাই তিনি বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকেই প্রণাম জানিয়ে তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন—

> হে আর্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জান নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্বদ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। বাংলা দেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতিদ্বারা পূত হইয়াছে, আজ হইতে এই কথা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনী, অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক।

—'বিচিত্র প্রবন্ধ', মা ভৈঃ (১৩০৯ কার্তিক)

'শিবাজি-উৎসব' কবিতাতেও এ আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে যে, মারাঠার প্রান্তর থেকে বীরত্বের বজ্রশিখা তার বিদ্যুৎবহ্নিতে যেদিন

ভারতবর্ষের আকাশকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, "সেদিনো শোনেনি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে কি ছিল বারতা"।

বাঙালির সেই যুগব্যাপী তন্দ্রাতুর নিশ্চেষ্টতার অবসানে তাই তিনি মারাঠা বীর শিবাজিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে বলেছেন,

মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো,
"জয়তু শিবাজি"।
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি'।

—সঞ্চয়িতা, শিবাজি-উৎসব

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে শিখ মারাঠার কীর্তিকাহিনীকেই কাব্যের ছন্দে প্রতিধ্বনিত করেছেন তা নয়, তিনি শিখ মারাঠার ইতিহাসও অতি যত্নের সহিত ব্যাখ্যা করেছেন। সে ব্যাখ্যা সুপরিচিত নয়, কিন্তু আজও তার প্রচুর মূল্য আছে। সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে আমরা উপকৃত হব।

মারাঠাগৌরবের অবসান ঘটে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে। 'বিচারক' নামক কবিতাটিতে এই শেষ অধ্যায়ের একট উজ্জ্বল শিখাকে তিনি উজ্জ্বলতর করে বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন। তার পরেই ইংরেজ-রাজত্বের আরম্ভ এবং ভারতীয় বীর্যমহিমার নির্বাণযুগ। কিন্তু উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে সে বীর্য আর-একবার তার ভস্মাচ্ছাদন ত্যাগ করে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে ১৮৫৭-৫৮ সালের ভারতবিদ্রোহের রূপে। এই বিদ্রোহবহ্নির উজ্জ্বলতম শিখা প্রকাশ পায় মারাঠি বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রানী লক্ষীবাঈ-এর চরিত্রে। এই বীরনারীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বাল্যরচনায় হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন অতি অকুণ্ঠ ভঙ্গিতে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই লক্ষীবাঈ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সমবয়সী এবং তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিন বৎসর পরেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

দেখা গেল, সুদূর ঋগ্‌বেদের যুগ থেকে নিজের জন্মের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেকটি উজ্জ্বল অধ্যায়ই রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আর একথাও সুবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথের জীবন-চরিত ও সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, একটিকে না জেনে অপরটি জানা সম্ভবপর নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি

ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে যে সব মহাপুরুষ আমাদের দেশকে বিশ্বজগতের কাছে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেবকেই নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়। কাজেই তাঁর আবির্ভাবের তিথি হিসাবে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিটি আমাদের পক্ষে খুবই গৌরবের দিন। বস্তুতঃ এই তিথিটি আমাদের জাতীয় উৎসবের তিথি বলে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ মহাপুরুষদের জন্মদিনকে আমরা যে মর্যাদা দিয়ে থাকি বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিকে সে মর্যাদা দেওয়া হয় না। দেশের চিরকালীন মহাপুরুষদের যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে হৃদয়ে গ্রহণ করতে না পারলে জাতীয় জাগরণ কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টিকে এদিকে পুনঃপুনঃ প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে বুদ্ধমহিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাদানের গুরুত্বের কথা তিনি নানাভাবেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা আছে।

নানাপ্রকার সামাজিক বিপ্লবের ফলে বুদ্ধদেব তাঁর নিজের দেশেই বিস্মৃতপ্রায় হয়েছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষাংশ থেকে ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণ তথা ইতিহাসচর্চার ফলে বুদ্ধদেবকে আমরা ক্রমশঃ এক নূতন মহিমায় মণ্ডিত করে দেখতে শিখছি। যে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) বৈদান্তিক ধর্মের পুনরুদ্‌বোধনব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন ঠিক সেই সময়েই সিংহলের দেবমিত্র ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩) বৌদ্ধধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাদানে প্রয়াসী হন। বস্তুতঃ ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হয়ে উভয়েই ভারতীয় ধর্মগৌরবের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির ধর্মরাজিক চৈত্যবিহার (১৯২০) এবং সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহার (১৯৩১) প্রতিষ্ঠা ধর্মপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সৌভাগ্যবশতঃ বুদ্ধদেবের মৈত্রী, করুণা ও সেবার আদর্শকে ভারতবর্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই মহৎ প্রয়াসে দেবমিত্র ধর্মপাল বহু বাঙালি মনস্বীর আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। এঁদের

মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সেন, নীলকমল মুখোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালি সাহিত্যিকরাও দীর্ঘকাল যাবৎ নানাভাবে বুদ্ধদেবের চারিত্রিক মহত্ত্ব উপলব্ধির ভূমিকা রচনা করে আসছিলেন। য়ুরোপে রিস্ ডেভিডস্‌দম্পতি-প্রমুখ মনীষীদের ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে বুদ্ধদেবের ত্যাগোজ্জ্বল পূতচরিত্র এবং জ্ঞানোজ্জ্বল মৈত্রী-ধর্মের প্রতি একটা সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছিল। আমাদের দেশেও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র বসু-প্রমুখ মনস্বীদের ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে শিক্ষিতসমাজের চিত্ত গৌতম বুদ্ধের চরিত্রমহিমা ও তৎপ্রচারিত ধর্ম-গৌরবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বৌদ্ধধর্ম" নামক গ্রন্থখানি (১৩০৮) বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংরেজ কবি এডুইন অর্নোল্‌ডের *Light of Asia*-নামক বিখ্যাত কাব্য (১৮৭৯) তৎকালীন ইংরেজি-জানা ভারতীয়গণের মনে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। গিরিশ ঘোষের 'বুদ্ধচরিত' নাটক (১২৯২) এবং নবীন সেনের 'অমিতাভ' কাব্যে (১৩০২) শুধু যে তৎকালীন বাঙালি মনই প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়, এসব গ্রন্থ তখনকার জাতীয় চিত্তকে গৌতম বুদ্ধের মহত্ত্বের প্রতি উন্মুখ করে তুলতেও অনেকখানি সহায়তা করেছিল। এইসব কারণেই সিংহলী মনীষী অনাগারিক ধর্মপাল যখন বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুজ্জীবন মন্ত্রের পতাকা বহন করে কলকাতায় এলেন তখন তিনি সহজেই শিক্ষিত বাঙালির মনের আনু-কূল্য লাভ করতে পেরেছিলেন।

ভাব ও আদর্শের দিক্ থেকে যাঁরা তাঁর যাত্রাপথের সহায়ক হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথের—

> মৈত্রী করুণার মন্ত্র দিতে দান
> জাগ হে মহীয়ান্ মরতে মহিমায়,
> সৃজিছে অভিচার নিঠুর অবিচার
> রোদন হাহাকার গগন-মহী ছায়॥
>
> —'বেলাশেষের গান', বুদ্ধপূর্ণিমা

বঙ্গে এল বুদ্ধবিভা, কিন্তু সে নাই বেঁচে,
নগর পুণ্ড্রবর্ধনও নেই—স্বপ্ন হয়ে গেছে;
নেই বালিকা উপাসিকা, আমরা তারই হয়ে
বরণ করি বুদ্ধবিভা চিত্তপ্রদীপ লয়ে,
চৈত্য দিয়ে যত্নে ঘিরি বুদ্ধবিভূতিরে,
নিরঞ্জনা-তীরের স্মৃতি ভাগীরথীর তীরে॥

—'বেলাশেষের গান', বুদ্ধবরণ

এই পঙ্‌ক্তিগুলি বাংলা সাহিত্যের পাঠকের নিকট সুপরিচিত। অবনীন্দ্র-নাথপ্রমুখ শিল্পীরাও বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি দেশের মনকে আকর্ষণ করতে কম সহায়তা করেননি। আর, একথা বলাই বাহুল্য যে, বুদ্ধদেব ও তাঁর আদর্শকে দেশের চিত্তে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সমস্ত প্রয়াসের সহিতই রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক যোগ ছিল। বস্তুতঃ উপনিষদের পরেই বুদ্ধদেবের চারিত্রিক মহত্ত্ব ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শের প্রতি তাঁর হৃদয়ের টান ছিল সব চেয়ে বেশি। তাঁর সাহিত্যসাধনার মধ্যেই এর যথেষ্ট পরিচয় আছে। তাঁর বহু গানে, কবিতায় ও নাটকে বুদ্ধদেব ও তৎপ্রবর্তিত জীবনদর্শনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

মূল বিষয়ের অবতারণা করার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ভাবপরিবেশ সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভাবনীয় শুভ সন্ধিক্ষণে। যে যুগে তিনি আমাদের দেশের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছিলেন সে যুগটাকে বলা যায় ভারতীয় চিত্তবৃত্তির পুনরুদ্দীপনের সন্ধিপর্ব। ইতিহাসে দেখা যায় যখন বিভিন্ন সভ্যতা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে তখনই এক নবতর বিদ্যুৎ-জ্যোতির স্ফুরণ ঘটে মানুষের চিত্তাকাশকে উদ্ভাসিত করে তোলে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও দেখতে পাই যবনসভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা ও আরব-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যুগে যুগে ভারতীয় প্রতিভার দীপ্তিস্ফুরণ ঘটেছিল; সেই দীপ্তিতেই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে ভারতীয় মনীষার যে পুনরুদ্দীপন ঘটেছে, ব্যাপকতায় গভীরতায় তথা বিচিত্রতায় তার তুলনা

নেই। এই পুনরুদ্দীপ্ত ভারতমনীষার উজ্জ্বলতম কেন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। আতস কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর-এক পিঠে তারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, তেমনি সমগ্র ভারতবর্ষে এই নব চিত্তোদ্‌বোধনের ব্যাপ্ত প্রভা এবং আর-এক দিকে সমগ্রটির একটি সংহত জ্যোতি; এই কেন্দ্রীভূত জ্যোতিটিই রবীন্দ্রপ্রতিভা। বস্তুতঃ এই যুগে ভারতবর্ষের যেখানে যে উচ্চ আদর্শ, গভীর চিন্তা বা মহৎ কর্মের আভা ফুটে উঠেছে তখনই তা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শপ্রবণ ও অসাধারণ গ্রহণক্ষম চিত্তে প্রতিফলিত হয়েছে।

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি একটু গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখা যাবে এই পুনরুজ্জীবনের ঋতুতে প্রাচীন ভারতের সমস্ত যুগের সমস্ত আদর্শ ই যেন নূতন প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠেছে। স্বামী দয়ানন্দ ও শ্রদ্ধানন্দ বৈদিক যুগের আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন; রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে নবজীবন দান করতে; অনাগারিক ধর্মপালের সাধনা হল বৌদ্ধ জীবনাদর্শকে ফিরিয়ে আনা; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের লক্ষ শংকরাচার্যের তথা ভারতবর্ষের পৌরাণিক আদর্শকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করা; বঙ্কিমচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণানন্দ প্রমুখ অনেকেই চেষ্টিত হয়েছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন রূপ ও শাখাকে দেশের সামনে উজ্জ্বল করে ধরতে; অরবিন্দের লক্ষ হচ্ছে যোগসাধনা তথা নবভাগবত ধর্মের প্রতিষ্ঠা। এছাড়া আরও যে সব অপেক্ষাকৃত গৌণ ধর্মান্দোলন এ যুগে দেখা দিয়েছে, এস্থলে সে সবের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যা হক, এসব আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়; কেননা, তার দ্বারা তাঁর মানস সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ হবে। বলা বাহুল্য, এই সব প্রচেষ্টাই সমভাবে রবীন্দ্রনাথের মানসিক আনুকূল্য অর্জন করতে পারেনি। বস্তুতঃ এসব আন্দোলনের অনেকগুলি তাঁর জীবনাদর্শের অল্পবিস্তর প্রতিকূলই ছিল। বুদ্ধদেব-প্রবর্তিত জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর মনোভাব কিরূপ ছিল, এস্থলে তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, ধর্মপালের সমস্ত কার্য রবীন্দ্রনাথের সমর্থন না পেলেও ধর্মপালের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি যে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল সে বিষয়ে সংশয় নেই। ১৯০১ সালেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্ত প্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি

সেখানে ইংরাজ বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না।…পূর্বদেশে তাহার বিপরীত। প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম।" আর, ১৯৩১ সালে সারনাথে ধর্মপালের উপস্থিতিতে মূলগন্ধকুটি বিহারের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন তাতে তাঁর মনোভাব অতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে—

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু, আয়ু কর দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু হোক প্রাণবান্।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি,
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি
এনে দিক অজেয় আহ্বান।
—'পরিশেষ', বুদ্ধদেবের প্রতি

এই ক'টি পঙ্‌ক্তি থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে বুদ্ধদেবের প্রেমধর্মকে এদেশে পুনঃপ্রবর্তিত করার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ কত গভীর ছিল। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে (বৈশাখ ১৩৪৭) এসেও বুদ্ধদেবের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এস্থলে তাও স্মরণীয়।—

কালপ্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি'
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে,—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,…
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে।
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে,—
প্রবেশি-মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও॥
—'জন্মদিনে', ৬

এই শ্রদ্ধার সূচনা হয়েছিল বহুকাল পূর্বে। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন অল্প তখনই তিনি প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে আসেন, একথা তাঁর জীবনস্মৃতি থেকেই জানা যায়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করেছেন তার অধিকাংশই রাজেন্দ্রলালের *Sanskrit Buddhist Literature* নামক বিখ্যাত গ্রন্থ (১৮৮২) থেকে সংগৃহীত। সুতরাং অনুমান করা যায়, বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি তাঁর এই অনুরাগ অন্ততঃ আংশিকভাবে রাজেন্দ্রলালের কাছে প্রাপ্ত। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন—

> বাংলা দেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।
>
> —‘জীবনস্মৃতি’, রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ঠাকুর পরিবারের আবেষ্টনীর মধ্যেও বৌদ্ধসংস্কৃতির চর্চা ছিল। তার সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ সত্যেন্দ্রনাথের “বৌদ্ধধর্ম” নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি (১৩০৮)।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি এই যে আকর্ষণ, তা যে শুধু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেই প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়। তাঁর নানা প্রকার কার্যকলাপের মধ্যেও এর যথেষ্ট পরিচয় পাই। বহুকাল পূর্বে তিনি বলেছিলেন,

> গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন, ধর্মপদ গ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। —‘প্রাচীন সাহিত্য’, ধম্মপদ (১৯০৬)

এই প্রসঙ্গেই অন্যত্র বলেছেন,

> ভারতীয় সংস্কৃতির বহুতর উপকরণ বৌদ্ধ শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে। আমাদের দেশে বহুদিন-অনাদৃত এই বৌদ্ধ শাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ...এই বৌদ্ধ শাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে, একথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক যুবা বৌদ্ধ শাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না?
>
> —‘প্রাচীন সাহিত্য,’ ধম্মপদ (১৯০৬)

আমরা জানি সেই যুগেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের রথীন্দ্রনাথপ্রমুখ ছাত্রদের বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ বলেন তখনকার দিনে তাঁকে ধম্মপদ গ্রন্থখানি আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করতে হয়েছিল এবং অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" নামক কাব্যখানি বাংলায় অনুবাদ করতে হয়েছিল। এই অনুবাদ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হবার কথাও হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে তখন আর তা হয়ে ওঠেনি। এই অনুবাদ ও সংশোধনের পাণ্ডুলিপি এখনও আছে এবং কিছুকাল পূর্বে তা বিশ্বভারতী কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এক সময়ে ধম্মপদের বাংলা পদ্যানুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁর এ কাজ সমাপ্ত হয়নি। ধম্মপদের ওই অসমাপ্ত অনুবাদ বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৫৫ শ্রাবণ-আশ্বিন) প্রকাশিত হয়েছে। যা হক, বিংশ শতকের গোড়ার দিকেই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলেন। পরবর্তী কালে এই সংকল্পকে তিনি কার্যক্ষেত্রেও রূপ দিয়েছিলেন। সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতি আলোচনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে বিশ্বভারতী।

বুদ্ধদেবের প্রধান স্মরণতিথি দুটি, বৈশাখী পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা—বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্বাণের তিথি; তাই এই তিথিটি বুদ্ধপূর্ণিমা নামে খ্যাত। আর, আষাঢ়ী পূর্ণিমা হচ্ছে ধর্মচক্রপ্রবর্তন তিথি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনে এই দুটি তিথির গুরুত্ব যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার করেছেন। শান্তিনিকেতনে প্রত্যেক বছরই আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে ধর্মচক্রপ্রবর্তনোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত (২১ ফাল্গুন, ১৩৩৩) 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি' ইত্যাদি গানটিও সুপরিচিত। এই গানটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বিশিষ্ট রচনা বলে স্বীকার্য। আজকের এই মহাঅশান্তির দিনে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলির উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করবেন।—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি নিত্যনিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন, তব দক্ষিণ পাণি,

তব শুভ সংগীতরাগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য ॥

১৩৪২ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলকাতার শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন তাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ওই ভাষণের প্রথমেই তিনি বলেন—

আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

—প্রবাসী, ১৩৪২ আষাঢ়, পৃ ৩০১। 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সংকলিত

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে রচিত আর একটি গানও উল্লেখযোগ্য—

সকল কলুষ তামসহর জয় হোক তব জয়,
অমৃতবারি সিঞ্চন কর নিখিল ভুবনময়।
জ্ঞান-সূর্য উদয়ভাতি ধ্বংস করুক তিমিররাতি।
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি, অপগত কর ভয় ॥

বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের স্থান বলে বুদ্ধগয়া এবং তাঁর ধর্মচক্রপ্রবর্তনের স্থান বলে সারনাথ (প্রাচীন নাম 'ইসিপতন মিগদাব') মহাতীর্থ বলে গণ্য হয়েছে। এসব মহাতীর্থ দর্শনের সার্থকতা রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। 'সমালোচনা' পুস্তকের (১৮৮৮) প্রথম প্রবন্ধে এক স্থানে তিনি বলেছেন—

আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যখন সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপরে বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই! যখন দেখি স্ফুটন্ত ছুটন্ত বর্তমান স্রোতের উপর পুরাতন কালের একটি প্রাচীন জীর্ণ অবশেষ নিশ্চলভাবে বসিয়া অতীতের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আছে, অতীতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে যে

মুহূর্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই মহা অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে।

—'সমালোচনা', অনাবশ্যক

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪ সালে বুদ্ধগয়া গিয়েছিলেন এবং বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, একথা আমরা জানি। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানি লিখেছেন,—

Only once in his life, said Rabindranath, did he feel like prostrating himself before an image, and that was when he saw the Buddha at Gaya.

—*Visva-Bharati Quarterly*, 1943 April, p. 179

রবীন্দ্রনাথ ধর্মচক্রপ্রবর্তনতীর্থ সারনাথে কখনও গিয়েছিলেন কিনা জানি না. তবে পরবর্তী কালে তিনি যে ধর্মচক্র-বিজিত বৃহত্তর জগতে জাভায়-বালিতে শ্যামে-ব্রহ্মে চীনে-জাপানে গিয়ে সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ ভগবান তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন, সেকথা তাঁর ছন্দোময় ভাষায় বাঁধা পড়ে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। যবদ্বীপে বরোবুদুরের বৌদ্ধমন্দির দর্শন উপলক্ষে কবির কণ্ঠে নিঃসংশয়ে এই বাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—

সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া,
তাই আসিয়াছে দিন,—
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির,
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র—"বুদ্ধের শরণ লইলাম"।

—'পরিশেষ', বোরোবুদুর

শ্যামদেশে গিয়ে (১৯২৭) বৌদ্ধ সংস্কৃতির সজীব ও সচল রূপ দেখে তিনি বলেছেন—

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্ন স্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণ কীর্ণ মূক শিলা রূপে—
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহুযুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।
সে অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব!
আমি আজি তারে দেখি লব—
ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা,
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
এ নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্য যুগ হতে—
যে যুগের গিরিশৃঙ্গ পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গল দিনকর।

—'পরিশেষ', সিয়াম (প্রথম দর্শনে)

বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধসংস্কৃতির কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে, সে বিষয়েও সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে একদিকে আচার ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান এবং অপরদিকে দার্শনিক তত্ত্বের প্রাধান্য; মানবসম্পর্ক এবং প্রেম করুণা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি বিকাশের প্রতি এ ধর্মের লক্ষ অপেক্ষাকৃত কম। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্মে মানবসম্পর্ক ও উক্ত হৃদয়বৃত্তি বিকাশের গুরুত্বই সব চেয়ে বেশি;

নিছক আচার ও অনুষ্ঠানকে ও-ধর্ম কিছুমাত্র গুরুত্ব দেয় না। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই জ্ঞানের মর্যাদা স্বীকৃত হয় সত্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের জ্ঞান মূলতঃ তত্ত্বমুখী, আর বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান মূলতঃ প্রেমমুখী। এ পার্থক্য উপেক্ষণীয় নয়। এসব কারণে স্বীকার করতে হয় যে, ব্রাহ্মণ্য আদর্শের চেয়ে বৌদ্ধ আদর্শই আধুনিক কাল তথা আধুনিক মনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। সুতরাং মানবধর্মের অর্থাৎ মৈত্রীধর্মের উপাসক রবীন্দ্রনাথের চিত্ত যে স্বভাবতই বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি অনুকূল হয়ে উঠেছিল, এটা কিছুই বিচিত্র নয়। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি এই—

> সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন।…এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচারব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। …আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম, তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।
>
> —'কালান্তর', সভ্যতার সঙ্কট

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আচারমূলক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম কেন আধুনিক মনের উপযোগী নয়। বৌদ্ধধর্মে এই আচারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে সমাজরক্ষার চিরন্তন ভিত্তিস্বরূপ মানবহৃদয়ের কতকগুলি বিশিষ্ট গুণকে।

একথা সর্ববিদিত যে, বৌদ্ধসংস্কৃতি মূলতঃ অহিংসা ও করুণার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রসাহিত্যেও দেখি এই অহিংসা ও করুণার মহিমা বিশেষভাবে কীর্তিত হয়েছে। এই জন্যেই তো "হিংসায় উন্মত্ত" পৃথিবীতে তিনি বুদ্ধদেবের পুনরাবির্ভাবকে এমন বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন—'নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী'। শুধু তাই নয়, পশুহিংসাও রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে পীড়িত করেছে। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব বুদ্ধচরিত্রকে দুটিমাত্র বাক্যদ্বারা বর্ণনা করেছেন।—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম।

রাজর্ষি ও বিসর্জন গ্রন্থে পশুবলির নিষ্ঠুরতাকে যেভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে, তার থেকে সহজেই অনুমান করা যায় অহিংসা নীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ কত গভীর। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটকে ব্যাধের শরে ক্রৌঞ্চপাখির মৃত্যুতে বাল্মীকির হৃদয়ে যে গভীর করুণার সঞ্চার হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকেই তাঁর আন্তরিকতা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। 'কালমৃগয়া' নাটকেও অনিচ্ছাক্রমে নিহত ঋষিকুমারের মৃত্যুতে দশরথের হৃদয়ে যে গভীর বেদনার সঞ্চার হয়েছিল, তা আমাদের হৃদয়কে ব্যাকুল করে তোলে। তাঁর পরবর্তী কালের রচনাতেও অহিংসা ও করুণার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এখানে সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসেও তিনি পশুবলিবিরোধী আন্দোলনকে কি ভাবে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন, এ প্রসঙ্গে সে কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অহিংসা ও করুণার পরেই ত্যাগের মহিমা। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ চিরকালই ত্যাগধর্মের উপাসক। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', উপনিষদের এই বাণী ছিল তাঁর অন্যতম মূলমন্ত্র।

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার, ক্ষয় নাই—

এই কথা রবীন্দ্রনাথের মতো করে আর কেউ বলতে পারেন নি। এইজন্যই তো তিনি মহাত্যাগী তথাগতকে আহ্বান করে বলেছেন—

এস দানবীর দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা।

'কথা' কাব্যের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'মস্তকবিক্রয়', 'মূল্য প্রাপ্তি', 'নগরলক্ষ্মী', 'পূজারিণী' প্রভৃতি রচনায় বুদ্ধদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ত্যাগের মহিমা যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নাই। 'কথা' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, 'এই কাব্যখানির ঐতিহাসিক চিত্রগুলি ত্যাগেরই চিত্র।' বৌদ্ধযুগে তথা শিখ-মারাঠার অভ্যুদয়যুগে—

> ভারতবর্ষ তখনকার জাতীয় জীবনবাণীকে ত্যাগের সুরে খুব কঠিন করিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে কি রকমের ত্যাগ? যে ত্যাগের আবেগে নারী একমাত্র পরিধেয় বসন প্রভু বুদ্ধের নামে

উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, যে ত্যাগ নৃপতিকে ভিখারীর বেশ পরিধান করাইয়া দীনতম সন্ন্যাসী সাজাইয়াছে (তুলনীয়ঃ হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যজিতে মুকুটদণ্ড ইত্যাদি), পূজারিণী রাজদণ্ডের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া পূজার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে ··এ সকল ত্যাগের কাহিনীই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের ভিতর হইতে জাগাইয়া তুলিলেন।

—অজিত চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথ'

এই যে ত্যাগের কথা বলা হল, তার লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বমৈত্রী; বিশ্বমানবের মৈত্রী প্রতিষ্ঠার মধ্যেই ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থত্যাগের সার্থকতা। এই বিশ্ব-মৈত্রীর সাধনাই যে ভগবান্ তথাগতের জীবনব্রতের মূলবস্তু, একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আর যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রুদ্রবীণার ঝঙ্কার দিয়ে আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, পূর্ব, পশ্চিম সকলকে আহ্বান করেছেন—

মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে,
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

যে রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের কল্যাণবার্তা নিয়ে বহুবার বিশ্বপ্রদক্ষিণ করেছেন, তাঁর জীবনসাধনারও মূল লক্ষ যে বিশ্বমৈত্রী, তা আজ সর্বজনবিদিত। এই লক্ষগত সমতাও বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অন্যতম প্রধান হেতু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই যে বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ, তার মূলে রয়েছে সর্বমানবের ঐক্যের তত্ত্ব। এই ঐক্যতত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি গুরুত্ব দান করতেন, তা তাঁর একঃ অবর্ণঃ ব্রহ্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যায় তথা তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনায় বহুস্থলেই সুস্পষ্ট হয়ে আছে। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলেই ছিল এই ঐক্যের সাধনা—

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট্ হিয়া।

ভারতীয় সাধনার এই ঐক্যতত্ত্ব বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছিল। তাই তো বুদ্ধের বাণী সমস্ত জগৎকেই এক মৈত্রীর সূত্রে বাঁধতে পেরেছিল। বৌদ্ধসংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল। সেইজন্যই শ্যামদেশকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—

সে মন্ত্র ভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুব কেন্দ্র সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে,
সর্ব জনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে॥

—'পরিশেষ', সিয়াম

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র। সংস্কারমুক্ত বুদ্ধি ও অকলঙ্ক চরিত্রের আদর্শ গ্রহণ হচ্ছে বুদ্ধশরণের ভিতরের কথা। বিশ্বমৈত্রী ও করুণা হচ্ছে ধর্মশরণের মূলতত্ত্ব। আর, সংঘশরণ হচ্ছে শক্তি-সাধনার প্রতীক। কেননা সংঘই সর্বশক্তির উৎসকেন্দ্র। 'সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে'। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে আশ্রয় করে যে মহা-শক্তির সৃষ্টি করেছিল, তার বিপুল পরিণতির কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই মহাশক্তির সন্ধান পেয়েই প্রিয়দর্শী অশোক দিগ্‌বিজয়ের লোভ ত্যাগ করে ধর্মবিজয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে এই ধর্ম-বিজয়ের পতাকা কালক্রমে এক দিকে গ্রীস-ম্যাসিডোনিয়া ও মিশর-সাইরিনি থেকে অপর দিকে চীন-তিব্বত ও কোরিয়া-জাপান পর্যন্ত সগৌরবে বাহিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য এই বিশ্ববিজয়ে একবিন্দু রক্তও ক্ষরিত হয়নি। এই ধর্মাশ্রিত সংঘশক্তির বিজয়াভিযান, বিশ্বমৈত্রীর এই দিগ্‌বিজয়কাহিনীর তুলনা নেই পৃথিবীর ইতিহাসে। এই বিশ্ববিজয়বাহিনীর নায়ক ছিলেন প্রিয়দর্শী অশোক, গুণবর্মন্, কাশ্যপমাতঙ্গ ও কুমারজীব, চৈনিক ভিক্ষু

ফা হিয়ান, হিউএন্থ্সাঙ্ ও ইৎসিঙ্ এবং আরও অনেকে। এই মৈত্রীসংঘের শক্তিতে কেমন করে রাজাও ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেছিলেন, দীনদরিদ্রও রাজার অধিক সম্মান পেয়েছিলেন, সাগরগিরিও কেমন অবলীলায় লঙ্ঘিত হয়েছিল, এক দেশ আর এক দেশের সেবায় ও কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করেছিল—সে কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব ও অতুলনীয়। যিনি এই মহাশক্তির উৎসস্থল, যিনি ভারতবর্ষকে এই ভাবে বিশ্বজগতের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাদান করেছিলেন, সেই ভগবান্ বুদ্ধ যে রবীন্দ্রনাথের তথা চিন্তাশীল ভারতীয় মাত্রেরই শ্রদ্ধাপাত্র বলে গণ্য হবেন, সেটা কিছুই বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথ পুনঃপুনঃ আমাদের সংঘশক্তির অভাবের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। এক স্থানে তিনি বলেছেন—

> আমাদের দেশে বারংবার ইহাই দেখা গিয়াছে যে, এখানে শক্তির উদ্ভব হয়, কিন্তু তার ধারাবাহিকতা থাকে না। মহাপুরুষেরা আসেন এবং তাঁহারা চলিয়া যান ; তাঁহাদের আবির্ভাবকে ধারণ করিবার, লালন করিবার, তাহাকে পূর্ণ পরিণত করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক সুযোগ এখানে নাই। ইহার কারণ আমাদের বিচ্ছিন্নতা। যে মাটিতে আঠা একেবারে নাই, সেখানেও বায়ুর বেগে বা পাখীর মুখে বীজ আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহা অঙ্কুরিত হয় না। কারণ সেখানকার মাটি রস ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অন্ত নাই ; ধর্মে, কর্মে, আহারে, বিহারে, আদানপ্রদানে সর্বত্রই বিচ্ছিন্নতা। এই জন্য ভাবের বন্যা নামে, কিন্তু বালুর মধ্যে শুষিয়া যায়। এই জন্য মহৎ চেষ্টা বৃহৎ চেষ্টা হইয়া উঠে না এবং মহাপুরুষ দেশের সর্বসাধারণের ক্ষমতাকে সমুজ্জ্বলভাবে সপ্রমাণ করিয়া নির্বাণলাভ করেন।

—শরৎকুমার রায়-প্রণীত 'শিখগুরু ও শিখজাতি' গ্রন্থের ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ লিখিত "ইতিহাস" গ্রন্থে (১৩৬২) সংকলিত।

রবীন্দ্রনাথ সংহতিশক্তির উপাসক। যেখানেই তিনি সংহতিশক্তির স্ফুরণ দেখেছেন সেখানেই শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। সেই জন্যই তিনি শিখ ও মারাঠা শক্তির সংঘবদ্ধ অভ্যুদয়ের ইতিহাস থেকে আমরা কি শিখতে পারি

তাই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সংহতিশক্তির সর্বোত্তম বিকাশ শিখ ও মারাঠার ইতিহাসে ঘটেনি, ঘটেছিল বৌদ্ধসংঘের কীর্তি-কলাপে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে যে সংঘশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিল তার প্রভাব দেখতে পাই জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে। বৌদ্ধ সংহতির এই বহু বিচিত্র কর্মের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার অতুলনীয় ভাষায় বর্ণনা করে গিয়েছেন।

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পুরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে
আনন্দমুখর উদ্‌বোধন,—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্তিতে কর্মে
চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,
আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে,
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে,…
সে মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।

—'পরিশেষ', সিয়াম (প্রথম দর্শনে)

এর থেকে সহজেই বোঝা যায়, সর্বাঙ্গীণ জীবনবিকাশের জন্য কবি বৌদ্ধ সংহতি ও সংস্কৃতির প্রতি কেন এতখানি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

আমাদের দেশের যেসব বিচ্ছিন্নতা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে পীড়িত করেছে, তার মধ্যে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাই প্রধান। সর্বমানবের সমতার আদর্শের উপরেই তাঁর জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠিত। 'Religion of man'-কে যিনি নিজের ধর্ম বলে মেনে নিয়েছেন, তিনি কখনও মানুষের জন্মগত পার্থক্যকে স্বীকার করতে পারেন না। যে ব্রাহ্মণ মানুষের জন্মগত উচ্চনীচতার ভিত্তির

উপরে আমাদের সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন তার মনকে অশুচি বলে অভিহিত করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। তাই তো তিনি ব্রাহ্মণ ও পতিতকে সম্বোধন করে বলেছেন—

এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমানভার।

এই জন্যেই তো তিনি 'সবার পরশে পবিত্রকরা তীর্থনীরে' মঙ্গলঘট ভরে মার অভিষেক সম্পন্ন করতে দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন। আর, এই জন্যই মহাত্মাজীর অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনকে তিনি এমন আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিলেন। বুদ্ধদেবের ধর্মও সর্বমানবের সমতার উপরে প্রতিষ্ঠিত; জাতিহিসাবে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ওই ধর্ম স্বীকার করে না। এইটেও ওই ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার অন্যতম প্রধান হেতু। মালিনী, নটীর পূজা ও চণ্ডালিকা, এই তিনখানি বৌদ্ধ উপাখ্যান-মূলক নাটকেই এ কথার অনুকূল বহু উক্তি পাওয়া যাবে। 'পূজারিনী' কবিতায় বৌদ্ধবিরোধী অজাতশত্রু বলেছেন—

বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার।

'নটীর পূজা'তেও রত্নাবলীর মুখে প্রকাশ পেয়েছে—"মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে বিনাশ করেছেন। ব্রাহ্মণরা তো তখন থেকেই বলছে, যে যজ্ঞের আগুন উনি নিভিয়েছেন, সেই ক্ষুধিত আগুনই একদিন ওঁকে খাবে"। 'মালিনী' নাট্যের উপাখ্যানটি তো প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মের উদার বিশ্বজনীনতার সঙ্গে সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িকতার বিরোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডালিকাতেও চণ্ডালকন্যার মুখেই বলা হয়েছে, "ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল"। পক্ষান্তরে ধর্মবলে সব মানুষই যে সমভাবে শ্রেষ্ঠতার অধিকারী হতে পারে এবং মহত্তের কাছে যে উচ্চনীচ ভেদ নেই, এটাই হচ্ছে চণ্ডালিকার অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধভিক্ষুকে দিয়ে বলিয়েছিলেন "বনবাসের

গোড়াতেই জানকী যে জলে স্নান করেছিলেন সে জল তুলে এনেছিল গুহক চণ্ডাল"। নটীর পূজাতেও দেখি রত্নাবলী যখন ভিক্ষু উপালিকে নাপিত বলে, সুনন্দকে গোয়ালার ছেলে বলে এবং সুনীতকে পুক্কসজাতীয় বলে অবজ্ঞা করেছিলেন, তখন ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা বললেন, "রাজকুমারী, এঁরা জাতিতে সবাই এক, এঁদের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জান না"। এই উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের একটি গভীরতম কথা প্রকাশ পেয়েছে। বুদ্ধদেব তাঁর উদার ও অকলঙ্ক ধর্মের স্পর্শে তথাকথিত পতিত ও অবজ্ঞাত জাতিসমূহকে যে আভিজাত্য দান করেছিলেন, তার মহত্ব রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল।

এই প্রসঙ্গে 'নটীর পূজা' নাটিকাটির বিশিষ্টতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই নাটিকাটি শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই একটি অপূর্ব বস্তু। এটিতে বৌদ্ধধর্মের মহত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের আকর্ষণ এবং সে সম্বন্ধে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যই অসাধারণ। তা ছাড়া, তৎকালীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে যে প্রচণ্ড ধর্মবিপ্লব সমাজবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দিয়েছিল তা এ পুস্তকখানিতে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিফলিত হয়ে এটিকে একটি বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে। তৎকালীন সমাজবিপ্লবের তরঙ্গোচ্ছ্বাস যেন ওই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যেই গভীর ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বস্তুতঃ সে যুগে যে বিপ্লবের আন্দোলনে ভারত-বর্ষের চিত্তাকাশ সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তার কাছে এপিক যুগের অস্ত্রঝনৎকার ও বীরত্ব গৌরবের কাহিনী ম্লান হয়ে যায়। এই বিপ্লববিক্ষুব্ধ পটভূমিকার উপরে রচিত এই রাজান্তঃপুর-কাহিনীটিতে যে নাট্যরস উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে তার সাহিত্যিক মূল্যও সামান্য নয়। কিন্তু এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা দেখাতে চেষ্টা করলাম—অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী, ঐক্য, সংহতি এবং সর্বমানবের সমতা, প্রধানতঃ এই ক'টি নীতিই বৌদ্ধসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসংস্কৃতির মধ্যে গভীর যোগসূত্ররূপে কাজ করেছে। এজন্যই চারিত্রপূজারী রবীন্দ্রনাথ পুণ্যচরিত বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। এক জায়গায় তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে বলেছেন, "অনন্ত কারুণিক বুদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা

দিয়েছেন, তবু তো এখানে নরকের শিখা নিবল না"। এই জন্য তিনি তাঁর আদর্শের পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা করে বলেছেন—

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী ;
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।

ভারতবর্ষের আজ বড়ই দুর্দিন। যে ভারতবর্ষ একদিন বুদ্ধদেবের আদর্শকে আশ্রয় করে বিশ্বজগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মৈত্রী ও শান্তির বাণী বহন করে নিয়েছিল, সেই ভারতবর্ষ আজ আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যে অবজ্ঞাত ও অবমানিত। ভারতবর্ষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাই ব্যাকুলচিত্তে বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করে বলেছেন—

ঐ নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে তব জন্মভূমি,
সেই নাম আরবার এদেশের নগরে প্রান্তরে দান কর তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি॥

—'পরিশেষ', বুদ্ধদেবের প্রতি

...নের
... কথা নয়।
...ক, কৃষ্ণবিহারী
... ১৮৬৫ সালে
...র অন্তরঙ্গ বন্ধু।
...র সভাপতিত্বে যে
...হলেন কৃষ্ণবিহারী ও
...থের সম্পাদকতায় ও

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে অশোক

১

রবীন্দ্রনাথের 'কথা' গ্রন্থখানির (১৯০০) অধিকাংশ কবিতাই এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত যাতে ভারতবর্ষের ত্যাগ বীর্য ও মহত্ত্বের আদর্শ উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়। উপনিষদের পর্ব থেকে মারাঠা পর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সকল কালের ইতিহাস থেকেই তিনি উক্ত আদর্শের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম ও মহত্তম আদর্শ যে রাজর্ষি অশোক, তাঁরই কোনো উল্লেখ নেই এই গ্রন্থের কোনো কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের মতে "ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম"। সুতরাং কথা কাব্যটিতে যে বৌদ্ধ উপাখ্যান থেকে বহু উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তা কিছু বিচিত্র নয়। স্বয়ং বুদ্ধদেবের চরিত্রমহিমার ছবি ফুটে উঠেছে কয়েকটি কবিতায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিশ্বপ্রেমের আদর্শ যাঁর চরিত্র ও কর্মকে আশ্রয় করে সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছে, 'কথা' কাব্য তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। 'কথা' কাব্যের পরেও রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতায় বা নাটকে অশোকের উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ বৌদ্ধ কাহিনী ও আদর্শ মুখ্যতঃ তাঁরই কাব্য নাটকের যোগে বাঙালির কাছে সুপরিচিত হয়েছে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এ প্রসঙ্গে মালিনী, নটীর পূজা, চণ্ডালিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামান্য পশুবলির বেদনা তাঁকে 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন' লিখতে উঠেছে করেছে। কিন্তু কলিঙ্গযুদ্ধে অসংখ্য নরবলির যে অনুশোচনা ধর্মপ্রাণ আলোচনা চিরকালের জন্য সমরপরিহারে প্রবর্তনা দিয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথের এই সংক্ষি কিছুমাত্র প্রেরণা জোগাল না। অথচ সামান্য ক্রৌঞ্চবধের করুণা, ত্যাগ, তিভাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। অশোকের কাহিনীতে যে এই ক'টি নীতিই চনার উপযোগিতা নেই, তাও নয়।

কাজ করেছে। শ বোধ করি কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অ সর্বপ্রথমে অশোকচরিত্রের মহত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে বলেছে (১৮৯২) সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে অশোকবিষয়ক

প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'অশোকচরিত' নাটক সংযোজিত হয়েছে। এই বইখানি সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তকার সুকুমার সেন বলেন—

> অশোকচরিত বাঙ্গালায় একটি উৎকৃষ্ট জীবনী। বইটিতে লেখকের লিপিচাতুর্যের, ইতিহাসনিষ্ঠার এবং অনুসন্ধিৎসার সবিশেষ পরিচয় আছে।
>
> —'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড (৩য় সং), পৃ. ২৩৯-৪০

বোঝা যাচ্ছে, ঐতিহাসিকের কাছেও অশোকচরিতের নাটকীয়তার আকর্ষণ ছিল। অতঃপর ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯০৭) এবং গিরিশচন্দ্রও (১৯১১) 'অশোক' নামে নাটক রচনা করেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীও অশোক-কাহিনীকে ভারতীয় গাথাকাব্যের উপযোগী বিষয় বলে অনুভব করেছিলেন (মহাভারতী, ১৯৩৬)। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে অশোকচরিত্রগত ভারতমহিমা কিছুমাত্র স্পন্দন জাগাল না কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে।

'কথা' কাব্যের পর রবীন্দ্রনাথ আর গাথাকবিতা লেখেন নি বলা চলে। সুতরাং অশোক সম্বন্ধে কোনো গাথা লিখলে 'কথা' রচনার সময়েই লিখতেন, এ কথা মনে করা অসংগত নয়। কথার অধিকাংশ কবিতাই ১৮৯৭-৯৯ সালে লেখা। এর বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। 'মালিনী' (১৮৯৬) রচনার সময় থেকেই এই বইটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা যায়। এই বইএর 'অশোকাবদান' অবলম্বনে অশোকের উপরে গাথাকবিতা রচনা করা অনায়াসেই চলত। কিন্তু অশোকাবদানের উপন্যাস-গুলি বাস্তবতা ও মহত্ত্ব-বর্জিত। সম্ভবতঃ এজন্যই উক্ত অশোকাবদান থেকে তিনি গাথা বা নাটক রচনার কোনো প্রেরণা পান নি। কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোকচরিত' (১৮৯২) বইখানিও তাঁর কাছে অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা হিসাবেই হক বা অন্য যে কারণেই হক, কৃষ্ণবিহারী দীর্ঘকাল ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬৫ সালে 'নব-নাটক' রচনার সময়ে দেখি তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আবার ১৮৮২ সালে ঠাকুরবাড়ির উৎসাহে রাজেন্দ্রলালের সভাপতিত্বে যে 'সারস্বত-সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়, তার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণবিহারী ও রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় ও

রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় ১৮৯১ সালে প্রকাশিত 'সাধনা' পত্রিকারও প্রধান লেখক ছিলেন কৃষ্ণবিহারী। 'সাধনা'র প্রথম বর্ষ থেকেই তাতে তাঁর 'বুদ্ধচরিত' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। আর দ্বিতীয় বর্ষের পৌষসংখ্যাতে তাঁর 'অশোকচরিত' গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এখানে ওই সমালোচনাটি সমগ্রভাবেই উদ্‌ধৃত করছি।—

> এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় দুর্লভ। শুধু বঙ্গভাষায় কেন, কোন বিদেশীয় গ্রন্থে অশোকের চরিত এত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা সমস্ত জানিতে হইলে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। গ্রন্থকার তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফল একাধারে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ পাঠকবর্গের মহৎ উপকার করিয়াছেন। এই অশোকচরিত পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবস্থা, ভাষা, সভ্যতার উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের আর একটি গুণ এই যে, ইহা অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের উপসংহারে অশোকচরিত সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সংযোজিত হইয়াছে। ইহাকে একটি ফাউস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। ফাউটিও ফেলার সামগ্রী নহে, উহাতেও একটু বেশ রস আছে।
>
> —সাধনা, ১২৯৯ পৌষ, পৃ ১৭৯-৮০

কৃষ্ণবিহারীর 'অশোকচরিত' জীবনীখানি যতই সুলিখিত হক এবং তাঁর 'অশোকচরিত' নাটিকাখানিও যতই উপাদেয় হক, রবীন্দ্রনাথ তার থেকে কোন প্রবর্তনা পান নি। এমনও হতে পারে যে, কৃষ্ণবিহারী একটি নাটিকা রচনা করেছেন বলেই তিনি এ বিষয়ে 'মালিনী'র ন্যায় নাট্য রচনায় বিরত ছিলেন, আর গাথারচনার উপযোগী উপাদানও উক্ত ইতিহাসগ্রন্থে পান নি। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ঐতিহাসিক উপকথা অবলম্বনেই গাথানাটকাদি রচনা করেছেন, ইতিহাসের প্রধান চরিত্র বা মূল আখ্যানকে কখনও অবলম্বন করেন নি। রাজর্ষি, বিসর্জন, মুকুট, বউঠাকুরাণীর হাট, প্রায়শ্চিত্ত, মালিনী, কথা, নটীর পূজা, চণ্ডালিকা প্রভৃতির

কথা স্মরণ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। ইতিহাসের মূলধারা বা প্রধান চরিত্র তাঁর চিন্তাকে উদ্রিক্ত করেছে এবং সময়বিশেষে প্রবন্ধরচনার উপাদান জুগিয়েছে, কিন্তু কাব্য নাট্যাদি রচনায় প্রবৃত্ত করে নি। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চিন্তার গভীরতা ও বিস্তার কতখানি তা তাঁর ইতিবৃত্ত-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। এ সব প্রবন্ধ সংকলন করে 'ইতিহাস' নামে যে গ্রন্থখানি পরবর্তী কালে (১৩৬২ শ্রাবণ) প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রতি লক্ষ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যায়।

২

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ অতি গভীর। ভারতীয় সংস্কৃতির যিনি একজন মুখ্য ব্যাখ্যাতা, তাঁর পক্ষে ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি গভীর আগ্রহ না থাকাই বিচিত্র। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে দুটি চরিত্রে, সে দুই চরিত্র বুদ্ধ ও অশোক। বুদ্ধচরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সুবিদিত। অশোকচরিত্রের প্রতিও তেমনি শ্রদ্ধা থাকাই প্রত্যাশিত। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোকের কথা তেমন সুপরিজ্ঞাত নয়। তার কারণ কি? মনে হতে পারে যে, বুদ্ধদেব আদর্শচরিত্র ধর্মপ্রবর্তক, তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা থাকাই স্বাভাবিক; অশোক তো সে পর্যায়ভুক্ত নন, তিনি হচ্ছেন মুখ্যতঃ ইতিহাসের রাষ্ট্র-রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদাসীনতাও বিচিত্র নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ তো শুধু ধর্মবিকাশের ইতিহাসকে নিয়েই নয়; ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি যে বিভাগেই ভারতীয় মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে সেখানেই তাঁর আগ্রহ। তা ছাড়া রাজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, যদুনাথ বাংলাদেশের এই তিনজন যশস্বী ঐতিহাসিকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন, তাঁর পক্ষে তো ভারতীয় ইতিহাসের সর্বক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ অশোকের ন্যায় মহৎ চরিত্রে, আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। আসল কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ অশোকচরিত্রকে কাব্যনাট্যাদি অনুভূতির ক্ষেত্রে অবতারণ করেন নি, ঐতিহাসিক মননের ক্ষেত্রে রেখেই তিনি তাঁর মহত্ত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি প্রবন্ধরচনাকালে প্রয়োজনমত অশোকের

প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য স্বভাবতঃই তাঁর কাব্যনাটকাদির মতো জনপ্রিয় নয়; তাই অশোক সম্বন্ধে তাঁর অভিমতও সুবিদিত নয়।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী থেকে অশোক সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্‌ধৃত করে দেখাতে চেষ্টা করব, অশোক-চরিত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল।

তার আগে দেখা দরকার, অশোকচরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা দেয় কখন। আমার মনে হয়, বিংশ শতকের পূর্বে সে আগ্রহ যথোচিত পরিমাণে জন্মেনি। তৎপূর্ববর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোকপ্রসঙ্গ আমার চোখে পড়ে নি। উনবিংশ শতকের শেষদিকে এডুইন আর্‌নল্‌ডের *Light of Asia* কাব্য এবং ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফলে বুদ্ধচরিত্রের প্রতি আমাদের দেশে শ্রদ্ধান্বিত আগ্রহের সঞ্চার হয় প্রচুর পরিমাণেই। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটকে (১৮৮৭) এবং নবীনচন্দ্রের 'অমিতাভ' কাব্যে (১৮৯৫) তার সাক্ষ্য রয়েছে। অশোকচরিত্রের প্রতি তৎকালে তেমন আগ্রহ দেখা দেয়নি। রমেশচন্দ্রের *History of Civilization in Ancient India* (১৮৯০) গ্রন্থের একটি অধ্যায় ও কৃষ্ণবিহারীর 'অশোকচরিত' (১৮৯২), তৎকালে এই দুটি ছাড়া ইংরেজিতে বা বাংলাতে অশোক সম্বন্ধে আর কোনো বই ছিলনা বললেই হয়। আর এই দুটি বইও এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। বস্তুতঃ অশোকের জীবনও উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত কাহিনী ও কিংবদন্তীর কুয়াশা ভেদ করে যথার্থ ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে ভালো করে ফুটে উঠতে পারেনি। বিংশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই অশোকচরিত্র ভারত ইতিহাসের উদয়াচলে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেল। ১৯০১ সালে *Heritage of India* গ্রন্থমালায় ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের *Asoka, The Buddhist Emperor of India* নামক প্রামাণিক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ওই বৎসরেরই একেবারে শেষদিকে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির প্রতি বাঙালির মন আকৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে অশোকের যথার্থ ইতিহাস আলোচিত হয়েছে অতি বিশদভাবেই। তার দুবছর পরেই প্রকাশিত হয় রিস ডেভিড্‌সের সুবিখ্যাত *Buddhist India* বইখানি। ঠিক এই সময়েই দেখি রবীন্দ্রনাথও

তাঁর কোনো কোনো প্রবন্ধে অশোক সম্বন্ধে অতি সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। সেগুলি একটু মন দিয়ে অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ অশোকের বিবরণ ইতিহাস হিসাবেই গভীরভাবে মন দিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন।

৩

রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোকের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থের 'সারবান্ সাহিত্য'-নামক প্রবন্ধে (১২৯৮) —'অশোক এবং হর্ষবর্ধনের মধ্যে কে আগে কে পরে' এই উক্তিটিতে। উক্ত প্রবন্ধটি রচিত হয় কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোকচরিত' প্রকাশের কাছাকাছি সময়ে। উদ্ধৃত ব্যঙ্গোক্তিটুকুর মধ্যে অশোকচরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের কোনো পরিচয় আভাসেও প্রকাশ পায় নি। সে পরিচয় প্রকাশ পেতে শুরু করেছে বিংশ শতকের গোড়া থেকে।

১৯০৩ সালে 'সাহিত্যের সামগ্রী' নামে একটি প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১৩১০ কার্তিক) রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে অশোক সম্বন্ধে লিখলেন—

> জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনো কালে মরিবে না, সরিবে না, —অনন্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন।
>
> পাহাড় কালাকালের কোনো বিচার না করিয়া তাহার ভাষা বহন করিয়া আসিয়াছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন। কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথা কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে। কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে, অশোকের সেই মহাবাণীও কত শত বৎসর মানব-হৃদয়কে বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে। পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল,

মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল, কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা অশোক কখনও কল্পনাও করেন নাই, তাহার শিল্পীরা পাষাণফলকে যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী ড্রুয়িদগণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তরস্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহু সহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতা লাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি যত বড়ো সম্রাট্‌ই হন, তিনি কি চান তিনি কি না চান, তাঁহার কাছে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানাইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এত যুগ ধরিয়া সকল মানুষের মনের আশ্রয় চাহিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাজচক্রবর্তীর সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পথের লোক কেহ বা চাহিতেছে, কেহ বা চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাই বলিয়া অশোকের অনুশাসনগুলিকে আমি যে সাহিত্য বলিতেছি তাহা নহে। উহাতে এইটুকু প্রমাণ হইতেছে…মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।…সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা।

—'সাহিত্য', সাহিত্যের সামগ্রী (১৯০৩)

এই অংশটুকু পড়লে অনায়াসেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ অশোকের প্রতি শুধু যে শ্রদ্ধাই পোষণ করতেন তা নয়। তিনি অশোক-ইতিহাসের মূল উপাদান যে অনুশাসনাবলী, তার পাঠোদ্ধারের বিবরণ প্রভৃতি বিষয়েও গভীর ঔৎসুক্য পোষণ করতেন। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত, যে বিদেশী প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে পাহাড়ে খোদাই-করা ব্রাহ্মীলিপির মূক ইঙ্গিতপাশ থেকে অশোকের বাণীর উদ্ধার সাধন করে তাঁর অভিপ্রায়কে সার্থকতা দান করলেন, সেই বিদেশী মনস্বীর নাম জেমস্‌ প্রিন্‌সেপ (১৭৯৯-১৮৪০)। তিনি ১৮৩৪ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির

পাঠনির্ণয় করতে সমর্থ হন। তারই ফলে অশোকের অনুশাসনগুলির পাঠ তথা অর্থ উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অশোক আপনার কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর" করতে চেয়েছিলেন, তাঁর হৃদয়ের আদর্শকে চিরস্থায়িত্ব দিয়ে মানুষের হৃদয়ে অমর করে রাখাই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা। এ কথা যে সত্য, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে অশোকের শিলানুশাসনগুলিতেই। তাতে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, তাঁর পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র প্রভৃতি উত্তর পুরুষরাও তাঁর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হক, এই হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা। অন্যত্র বলেছেন, তাঁর ধর্মলিপিগুলিকে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে লিখে রাখবার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলি চিরস্থায়ী হক এবং তাঁর বংশধরগণ এগুলি অনুবর্তন করুক। "এতায় অথায় অয়ং ধংমলিপি লিখিতাঃ চিরথিতিক হোতু তথা চ প্রজা অনুবততু" (পঞ্চম শিলানুশাসন)।

অনেক পরবর্তী কালে একখানি পত্রে (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯) রবীন্দ্রনাথ অশোকলিপির যে কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন, এখানে তাও তুলে দেওয়া গেল।—

> কাল গাড়ি চলতে চলতে তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম। কিন্তু সে এমন একটা নাড়া খাওয়া চিঠি। ভূমিকম্পে আগাগোড়া ফাটল-ধরা বাড়ির মতো। তার অক্ষরগুলো অশোকস্তম্ভের প্রাচীন অক্ষরের মতো আকার ধারণ করেছে, পড়িয়ে নিতে গেলে রাখাল বাঁড়ুজ্জের শরণ নিতে হয়।
>
> —"পথে ও পথের প্রান্তে" (১৯৩৮), ২৮

৪

ইতিহাসে দেখা যায়, এক এক সময়ে দেশের চিত্ত এক-একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে নিজের সমগ্র ও সংহত শক্তিকে অত্যুজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশিত করে। যখন সে রকম অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের অভাব ঘটে, তখন সে শক্তি যদি জাগ্রত থাকে তবে কোনো সাধারণ মানুষকে আশ্রয় করে শুদ্ধভাবে মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজশক্তি একবার বিপুল ব্যক্তিত্বশালী সম্রাট্ অশোককে আশ্রয় করে কিরূপ উজ্জ্বল শিখায় দীপ্যমান হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, সে ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করে ছিল। তাই দেখি নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে তিনি অশোকের মহৎ দৃষ্টান্তের কথা দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন।

১৯০৪ সালে দেশের সমাজশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ ও সংহত করবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১৩১১ ভাদ্র, পৃ ২৫৭) অশোকপ্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেন।—

> স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমা-স্বরূপ হইবেন।
>
> সমাজে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সকল সময়েই শক্তিমান্ ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে।···অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সহিত যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্য বলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে। আমরা ক্ষুদ্র দোকানির মতো সমস্ত লাভ লোকসানের হিসাব হাতে হাতে দেখিতে চাই; কিন্তু বড়ো ব্যাপারের হিসাব তেমন করিয়া মেলে না। দেশে এক-একটা বড়ো দিন আসে, সেই দিন বড়ো লোকের তলবে দেশের সমস্ত হিসাবের সালতামামি নিকাশ বড়ো খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্তী অশোকের সময় একবার বৌদ্ধসমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল।
>
> —'আত্মশক্তি' (রচনাবলী ৩), স্বদেশী সমাজ (১৯০৪)

বোঝা যাচ্ছে—প্রাচীনকালে দেশে একবার বড়ো দিন এসেছিল, বড়ো লোকও এসেছিলেন, রাজচক্রবর্তী অশোক; তিনি ছিলেন দেশের সমাজ-শক্তির প্রতিমাস্বরূপ, তাঁর মধ্যেই দেশের চিত্ত নিজেকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করবার অবকাশ পেয়েছিল; তাঁর তলবে দেশের সমস্ত হিসাব নিকাশও বড়ো খাতায় প্রস্তুত হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই ঐতিহাসিক উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে অশোকের প্রতি এমন নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে অশোক শুধু বৌদ্ধসমাজের প্রতিভূ ছিলেন না; বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ-নির্বিশেষে তিনি স্বরাজ্যের সকল প্রজারই প্রতিভূপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ কথা তাঁরই নির্দেশে উৎকীর্ণ বিভিন্ন শিলানুশাসনে অক্ষয়লিপিতে আজও বিরাজমান রয়েছে।

দেবানং পিয়ে পিয়দসি রাজা সবপাসংডানি চ পবজিতানি চ ঘরস্তানি চ পূজয়তি, দানেন চ বিবিধায় চ পূজায় পূজয়তি নে, ন তু তথা দানং ব পূজা ব দেবানং পিয়ো মংঞতো যথা কিতি সারবঢী অস সবপাসংডানং ॥

—দ্বাদশ শিলানুশাসন

এর অর্থ॥ দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) প্রব্রাজিত ও গৃহস্থ সর্বসম্প্রদায়কেই পূজা করেন (অর্থাৎ সম্মাননা করেন), দানের দ্বারা ও অন্য বিবিধ উপায়েই পূজা করেন। কিন্তু দান বা পূজাকে দেবগণের প্রিয় সেরূপ (মহৎকার্য বলে) মনে করেন না যেরূপ মনে করেন সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধিসাধনকে ॥

বস্তুতঃ সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধিসাধনের চেয়ে মহত্তর কর্ম আর কি হতে পারে? পরে দেখব অশোক শুধু মানুষ নয়, পশুদের কল্যাণসাধনকেও কর্তব্য বলে মনে করতেন। যিনি মানুষ ও পশু উভয়েরই কল্যাণবিধানে তৎপর হয়েছিলেন, তিনি যে বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়েরই সারবৃদ্ধিসাধনে ব্রতী হবেন তা বিচিত্র নয়।

৫

১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়া* দর্শন করতে যান (১৩১১ আশ্বিন)। সঙ্গে ছিলেন সস্ত্রীক আচার্য জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরও কয়েকজন। তার কয়েক মাস পরেই দেখি 'উৎসবের দিন' নামে এক প্রবন্ধে তিনি অশোকের জীবনাদর্শের মর্ম ব্যাখ্যা করছেন (বঙ্গদর্শন, ১৩১১ মাঘ)। এ প্রবন্ধে বুদ্ধগয়ার উল্লেখ নেই। কিন্তু এর দুবছর পরে

* রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় আবার যান ১৯১৪ সালে (১৩২১ আশ্বিন)। গীতালির কয়েকটি গান এখানে রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে নিকটবর্তী বারবরা পর্বতে অশোক-নির্মিত গুহাগৃহ দেখতে যান; কিন্তু অপ্রত্যাশিত বাধায় তাঁকে পথ থেকেই ফিরে আসতে হয়। দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২০; রবীন্দ্রজীবনী ১৩৫৫, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৬১

লেখা আর এক প্রবন্ধে বুদ্ধগয়ার শিল্পকলার প্রসঙ্গে অশোকের জীবনাদর্শের আর এক বিশিষ্টতার পরিচয় দেন। সে কথা একটু পরেই যথাস্থানে বলা যাবে। তার আগে 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

> এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট্ অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কি সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি। সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মত গৃহ হইতে গৃহান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজন ছিল না। ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে, ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য ; ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে এক মুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড় বড় রাজার বড় বড় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, বিস্মৃত, ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গল শক্তির আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গৌরব হইতে, তাহার সহায়তা হইতে মানুষ আর কোনদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে সমস্ত স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।
>
> —'ধর্ম', উৎসবের দিন (১৯০৫)

এই অংশটিতে কাব্যের হৃদয়াবেগ এবং ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা, দুইই সমপরিমাণে বিদ্যমান আছে। এটি পড়বার সময় কবির তীব্র অনুভূতি হৃদয়ে এমনই গভীরভাবে সঞ্চারিত হয় যে, অশোকের উপর কোনো কবিতা নেই বলে আক্ষেপ বোধ করবার আর কোনো অবকাশ থাকে না। বস্তুতঃ

'শিবাজী উৎসব' কবিতাটির মূলে রয়েছে যে ব্যগ্র হৃদয়াবেগ, এই অশোক-প্রশস্তিটির মধ্যেও তারই স্পন্দন অনুভূত হয়। দুটি প্রশস্তি রচনারই উপলক্ষ হচ্ছে উৎসবদিনের পক্ষে স্বাভাবিক শ্রদ্ধামিশ্রিত আনন্দনৈবেদ্য রচনার ব্যাকুলতা। অথচ সে শ্রদ্ধা ও আনন্দ রবীন্দ্রসুলভ গভীর সত্যনিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এখানে কাব্য ও ইতিহাস পরস্পরের অনুষঙ্গী হয়েছে।

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র
অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব॥

—'উৎসর্গ': সংযোজন, ১২

হৃদয়ানুভূতির আবেগঢালা এই গানটি রচনার কালে (১৯০২ ॥ ১৩০৯ বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথের অন্তরে অশোকের পুণ্যচরিত ও তাঁর মহাজীবনের স্পর্শপূত রাজাসনের কথা জাগরূক ছিল কিনা, তা নিশ্চয় করে জানবার উপায় নেই। তবে অশোকাদর্শের কথা সে সময়ে তাঁর মনে থাকা যে অসম্ভব ছিল না, সে কথা বলা যায়। কেন না পূর্বেই বলেছি, ১৯০১ সালে ভিনসেণ্ট স্মিথের *Asoka* এবং সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত 'বৌদ্ধধর্ম' প্রকাশের পরেই শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অশোকের মহান্ জীবনাদর্শের প্রতি।

৬

'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে অশোকের শ্রান্তিহীন সেবাপরায়ণতা ও রাজশক্তিকে মঙ্গলের দাসত্বে নিয়োগের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

এই মঙ্গলনিষ্ঠতা শুধু যে বিশ্বের দুঃখ নিরসন তথা সেবার ব্রতকেই প্রেরণা জোগায় তা নয়, যথার্থ সৌন্দর্যসৃষ্টির কামনাকেও গতি ও শক্তি দান করে এই মঙ্গলবুদ্ধি। এই বিষয়টা অতি বিশদভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে ১৯০৬ সালে রচিত 'সৌন্দর্যবোধ' নামক প্রবন্ধটিতে। তাতে দেখি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ার শিল্পসৌন্দর্যের প্রসঙ্গে অশোকের মঙ্গলসাধনব্রতের কথাই উত্থাপন করেছেন (বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ পৌষ)। এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্‌ধৃত করি।—

> সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতি লাভ করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগল্‌ভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণগন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একাকার হইয়া উঠিয়াছে।
>
> সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনো জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ সাদাসিধা হইয়া থাকে, সেটা সৌন্দর্যবোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়। অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় ছিল? তাঁহার রাজবাটীর ভিতরে কোনো চিহ্নও তো দেখিতে পাই না। কিন্তু অশোকের রচিত স্তূপ ও স্তম্ভ বুদ্ধগয়ায় বোধি-বটমূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, রাজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই, কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের ভোগকে এই পূজার অর্ঘ্য তিনি এমন করিয়া দেন নাই।
>
> —'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ (১৯০৬)

অশোক শুধু যে বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের মঙ্গলময় স্মরণ-ক্ষেত্রকেই কলাসৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন তা নয়। বস্তুতঃ বুদ্ধদেবের স্পর্শপূত প্রত্যেকটি স্থানকেই অশোক সৌন্দর্যসৃষ্টির দ্বারা স্মরণীয় করে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গৌতম বুদ্ধের জন্মক্ষেত্র লুম্বিনী গ্রাম এবং ধর্মচক্রপ্রবর্তনক্ষেত্র সারনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭

অনেক স্থলেই রবীন্দ্রনাথ অশোকের নাম করেন না, কিন্তু অশোকের কথা স্মরণ করেই যে তিনি মন্তব্য করেছেন তাও অস্পষ্ট থাকে না। ১৯১২ সালে রচিত 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধের (প্রবাসী, ১৩১৯ বৈশাখ) একস্থানে তিনি মন্তব্য করেছেন—

> যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন, তখনও ধর্মসমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এ ভেদ বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।
>
> —'পরিচয়', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (১৯১২)

'বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন' বলতে যে অশোকের রাজত্বকালই সূচিত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এ অনুমানের পক্ষে সন্দেহাতীত প্রমাণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, ধর্মসমাজের এই বিভাগের উল্লেখ। অশোকের অনুশাসনগুলিতে পুনঃপুনঃই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের কথা পাওয়া যায় এবং এই শব্দ দুইটিও প্রায় সর্বত্র একত্র সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। যেমন, তৃতীয় শিলানুশাসনে আছে 'ব্রাহ্মণসমনানং সাধু দানং'। আর এ কথাও সত্য যে, অশোক-অনুশাসনে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ছাড়া অন্যপ্রকার সমাজভেদের কথা নেই বললেই হয়; ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বিভাগগুলির যে কিছুমাত্র উল্লেখ নেই তাও সত্য। তবে অশোকের আমলে ব্রাহ্মণ-শ্রমণ ছাড়া 'আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায়' হয়েছিল কিনা, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিল কিনা, একথা নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। যা হক, 'বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন' যে অশোকের রাজত্বকালেরই জ্ঞাপক তাতে দুই মত হতে পারে না। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ অশোককে বিশেষভাবে বৌদ্ধনৃপতি এবং তাঁর রাজত্বকালকে বিশেষভাবে বৌদ্ধযুগ বলে মনে করতেন, এ অনুমানের হেতু আছে। ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁর পূর্বোক্ত পুস্তকে অশোককে The Buddhist Emperor of India এই বিশেষণের দ্বারা চিহ্নিত করেছেন; রিস ডেভিড্‌সও তাঁর বইএর নাম দিয়েছেন *Buddhist India*; সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' বইতে অশোককে বৌদ্ধরাজা রূপেই উপস্থাপন করেছেন। আমার মনে হয়, এ সব কারণেই রবীন্দ্রনাথও বৌদ্ধযুগ বলতে

বিশেষভাবে অশোকের রাজত্বকালের কথাই মনে করতেন। এরকম যে মনে করতেন তার প্রমাণ দিচ্ছি।

৮

১৯১২ সালেই ইউরোপযাত্রার প্রাক্কালে 'যাত্রার পূর্বপত্র' নামে এক প্রবন্ধে (তত্ত্ববোধিনী, ১৩১৯ আষাঢ়) রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেছেন।—

> বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে।
>
> —'পথের সঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র (১৯১২)

এখানে 'বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কাল' বলতে যে অশোকের রাজত্বকালকেই বোঝাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। শিল্প ও সাম্রাজ্য শক্তির চরম বিকাশের কথাতেও এই অনুমানই সমর্থিত হয়। উক্ত প্রবন্ধেরই আর এক অংশে এ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তর সমর্থন পাওয়া যায়।

> বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনই সমাজে এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা সম্প্রতি য়ুরোপে দেখিতেছি। রোগীদের জন্য ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা, এমন কি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হইয়াছিল এবং জীবের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল। তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় বর্বরজাতীয়দের সদ্‌গতির জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ বহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্যবান্ মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষাদান করিয়াছিল। সেজন্যই ভারতবর্ষ সেদিন

ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল। তখন য়ুরোপের খ্রীষ্টান সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল। ভারতবর্ষের সেই দুঃখব্রত আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জ্বল দীপ্তি কৃত্রিমতা ও ভাবরসাবেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্বাপিত হইয়াছে?

—'পথের সঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র (১৯১২)

নামতঃ উল্লিখিত না হলেও অশোকের রাজত্বই যে এই অংশটুকুর লক্ষ্য সে কথা বলে দেবার অপেক্ষাও নেই। কাব্যের আবেগস্পর্শহীন সরল পরিস্রুত ভাষায় অশোক-রাজত্বকালের ইতিহাসকে অতি সংহত আকারে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এটুকু পড়তে পড়তে কোনো কোনো স্থলে অশোকের বাণী যেন কানে ধ্বনিত হতে থাকে। অশোকানুশাসনের অনেক কথাই যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে নবজন্ম পরিগ্রহ করে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। যেমন—

> সর্বত বিজিতম্হি দেবানম্প্রিয়স্ রাঞো এবমপি প্রচংতেসু···দ্বে চিকীছা কতা, মনুসচিকীছা চ পসুচিকীছা চ। ওসুধানি চ যানি মনুসোপগানি চ পসোপগানি চ যত যত নাস্তি সর্বত্র হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ। মূলানি চ ফলানি চ যত যত নাস্তি সর্বত্র হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ। পংথেসু কূপা চ খানাপিতা, ব্রছা চ রোপাপিতা পরিভোগায় পসুমনুসানং॥
>
> —দ্বিতীয় শিলানুশাসন

এর অর্থ॥ দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোকের) রাজ্যের সর্বত্র এবং প্রত্যন্ত (অর্থাৎ প্রতিবেশী) রাজ্যগুলিতেও মানুষ ও পশুর জন্য দ্বিবিধ চিকিৎসাব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষ এবং পশুদের উপযোগী তরুগুল্মাদিও যেখানে যেখানে নেই সেই সব স্থানেই এনে রোপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ফলমূলও যেখানে যা নেই সেখানে তা এনে রোপণ করা হয়েছে। পশু ও মানুষের পরিভোগের জন্য পথে পথে কূপখনন ও বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

অশোক যে সর্বমানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ-সাধনাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা তাঁর অনুশাসনের নানাস্থানেই পাওয়া

যায়। আর অস্ত্রশক্তির দ্বারা দিগ্‌বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মশক্তির দ্বারা বিশ্ব-বিজয়ই অশোকের অনুশাসনাবলী তথা তাঁর জীবনাদর্শের মূল কথা, তাও সর্বজনবিদিত। এসব কথার সমর্থনে বহুল পরিমাণে অশোকবাণী উদ্‌ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ত্রয়োদশ শিলানুশাসন থেকে দু-একটি উক্তির উদ্‌ধৃতিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। যেমন, "এষে চ মুখমুতে বিজয়ে দেবানং প্রিয়স যো ধ্রমবিজয়ো।...স হি হিদলোকিকপারলোকিকে"। অর্থাৎ অশোকের মতে ধর্মবিজয়ই শ্রেষ্ঠ বিজয়, তাতে ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেরই কল্যাণ হয়।

তৎকালে বৌদ্ধধর্মাচার্যগণের অকাতর দুঃখবহনের ফলে কিভাবে 'বর্বর-জাতীয়দের সদ্‌গতি' সাধিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক এল. জে. সণ্ডার্স্‌-এর অভিমত উদ্‌ধৃত করি।—

The missions of King Asoka are amongst the greatest civilizing influences in the world's history; for they entered countries for the most part barbarous and full of superstitions and amongst these animistic peoples Buddhism spread as a wholesome leaven.

—*The Story of Buddhism* (১৯১৬), পৃ ১৬

বৌদ্ধযুগে অর্থাৎ অশোকের সময়ে ভারতবর্ষীয় সমাজে যে প্রেমমূলক ত্যাগ-ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল, আধুনিক যুগে তার প্রতিরূপ দেখা যায় সাম্প্রতিক ইউরোপের খ্রীষ্টান সভ্যতার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির পক্ষেও ইংরেজ ঐতিহাসিকের সমর্থন পাওয়া যায়।

অশোকের রাজত্বে (খ্রী পূ ২৭২-৩২) চিকিৎসা ও আরোগ্যদানের দ্বারা মানুষ ও পশুর সেবার যে আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল, তা ভারতবর্ষের চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল এবং তার প্রভাবও স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘকাল। অশোকের তিরোধানের ছয় শত বৎসরেরও অধিক কাল পরে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে (খ্রী ৩৮০-৪১৩) চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিএন ভারতবর্ষে আসেন। তিনি এদেশে ছিলেন মোট ছয় বৎসর (খ্রী ৪০৫-৪১১), তার মধ্যে তিনবৎসরই কাটান মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, সে সময় পাটলিপুত্রে একটি অতি উৎকৃষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়

ছিল; এটি পরিচালিত হত দেশের শিক্ষিত উদারহৃদয় ব্যক্তিদের সমবেত অর্থসাহায্যে; রাজ্যের সমস্ত দরিদ্র ও অসহায় লোকেরা এখানে আসত সর্ববিধ রোগের চিকিৎসার জন্যে; রোগের উপশম না হওয়া পর্যন্ত রোগীরা এখানেই থাকত এবং প্রত্যেকেই তার প্রয়োজনমত ওষুধ ও পথ্য দুইই পেত বিনামূল্যে; রোগীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও ছিল খুব ভাল। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা এই।—

It may be doubted if any equally efficient foundation was to be seen elsewhere in the world at that date; and its existence, *anticipating the deeds of modern Christian c harity*, speaks well both for the character of the citizens who endowed it, and for the genius *of the great Asoka, whose teaching still bore such wholesome fruit many centuries after his decease.*

—*Early History of India* (চতুর্থ সং), পৃ ৩১২-১৩

আলোচ্য প্রসঙ্গের পক্ষে বিশেষভাবে লক্ষণীয় কথাগুলি বক্রাক্ষরে চিহ্নিত করে দিলাম। যাহক, স্মিথের এই অভিমত থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, আধুনিক ইউরোপের খ্রীষ্টান সভ্যতার প্রেম ও ত্যাগের মহান আদর্শ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের যুগেই এদেশের সমাজে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ঐতিহাসিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ 'যাত্রার পূর্বপত্র' থেকে যে দুটি অংশ উদ্‌ধৃত করেছি তার মধ্যে কল্পনা ও ভাবাবেগের স্পর্শমাত্রও নেই, আছে নিছক ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একান্তরূপে বাস্তব জীবনাদর্শগত গভীর চিন্তার ছাপ।

৯

১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার অশোকের আদর্শের কথা উত্থাপন করেন 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'-নামক প্রবন্ধটিতে (প্রবাসী, ১৩২৪ মাঘ)। এবার মৌর্য-সম্রাট্ অশোকের কথা উত্থাপিত হয় মোগলসম্রাট্ আকবরের সঙ্গে তাঁর ধর্মগত আদর্শের তুলনা উপলক্ষে।—

বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগলসম্রাট্ আকবরও কেবল রাষ্ট্র সাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এই

জন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।

—'কালান্তর', স্বাধিকারপ্রমত্তঃ (১৯১৮)

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ অশোকের 'ধর্মবিজয়' আদর্শের কথা স্মরণ করেই এই মন্তব্য করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, অশোকের ধর্মবিজয়ের দুটি দিক্ ছিল,—এক দিক্ তাঁর স্বরাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত, আর-এক দিক্ তাঁর পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত। প্রতিবেশী নৃপতিদের রাজ্যে 'ধর্মদূত' পাঠিয়ে তাঁদের সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপন, এই ছিল অশোকের পররাজ্যে ধর্মবিজয় নীতির লক্ষ। এই ধর্মবিজিত পররাজ্যগুলিও অশোকের ধর্মসাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলে গণ্য। পক্ষান্তরে নিজ রাজ্যের সর্বত্র ধর্মমহামাত্য-প্রমুখ রাজপুরুষের নিয়োগ, সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি সমব্যবহার ও সর্বশ্রেণীর প্রজার সমান কল্যাণসাধনের দ্বারা ধর্মের অধিকার প্রতিষ্ঠা, এই ছিল অশোকের স্বরাজ্যে ধর্মবিজয়নীতির লক্ষ। এইভাবেই অশোক অস্ত্রবিজিত স্বরাজ্যকেও ধর্মবিজয়ের দ্বারা ধর্মসাম্রাজ্যে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আক্‌বর অশোকানুসৃত ধর্মবিজয়নীতির এই দ্বিতীয়াংশকেই আশ্রয় করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি তাঁর অস্ত্রবিজিত সাম্রাজ্যকেই ধর্মবিজিত সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। পররাজ্যে ধর্মবিজয়ের প্রয়াস আকবর করেন নি।

উভয় ক্ষেত্রেই অস্ত্রবিজিত রাষ্ট্রসাম্রাজ্যকে মৈত্রীবিজিত ধর্মসাম্রাজ্যরূপে গড়ে তোলবার ফলও হয়েছিল একই প্রকারের। অশোকের আমলে যেমন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের মিলনক্ষেত্র রচিত হয়ে জাতীয় জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছিল, আকবরের সময়েও তেমনি হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফি-ফকিরদের সাধনায় জাতীয় চিত্তে ঐক্যের সত্য অধিষ্ঠান রচিত হচ্ছিল। তা ছাড়া সর্বধর্মের 'সারবৃদ্ধি' ও 'সমবায়' নীতির দ্বারা অশোক যেমন ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক প্রভৃতি সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনসাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, আকবরও তেমনি তাঁর সুল্‌হ্-ই-কুল্ (সর্বধর্মে সমদৃষ্টি) নীতি,

জিজিয়া কর বর্জন এবং ইবাদতখানা (সমবেত উপাসনা গৃহ) প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-জৈন নির্বিশেষে সর্বজনীন মিলনভূমি রচনার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আকবরের 'দীন ইলাহি'র আদর্শও স্মরণীয়। ধর্মসাম্রাজ্যের অন্যতম অঙ্গ সর্বজনের কল্যাণসাধন এই ক্ষেত্রেও অশোক ও আকবরের নিরলস প্রয়াসের বর্ণনায় ইতিহাস মুখর। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ধম্মপদং' নামক প্রবন্ধের (বঙ্গদর্শন, ১৩১২) একটি উক্তিও স্মরণযোগ্য।

> আমাদের দেশে মোগল শাসনকালে শিবাজিকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্র-চেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজির ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', ধম্মপদং (১৯০৫)

শিবাজির ধর্মাদর্শও যে অশোক-আকবরের মতো সর্বংসহা নীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে বিষয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট। রাষ্ট্রচেষ্টাকে ধর্মচেষ্টার অঙ্গীভূত করা অর্থাৎ অস্ত্রার্জিত রাজ্যকেও ধর্মার্জিত রাজ্যে পরিণত করার আদর্শ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় অশোকের জীবনসাধনার ফলে। আর এই আদর্শ ভারতবর্ষের চিত্তকে এমনই গভীরভাবে অধিকার করেছিল যে, এ দেশের কল্পনালোকেও রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় আদর্শায়িত রাজা 'ধর্মরাজ' রূপে চিত্রিত ও অভিহিত হয়েছেন। এ হচ্ছে বাস্তবানুসারী কল্পনার এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রেও এই আদর্শের অনুবর্তন বন্ধ ছিল না। তাই আকবর ও শিবাজির রাষ্ট্রচেষ্টা অতি-সাম্প্রদায়িক ধর্মনীতিকে আশ্রয় করতে ভোলেন নি। এই সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ধর্মপ্রতিষ্ঠ রাজ্যকেই আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় কল্যাণরাষ্ট্র।

'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' প্রবন্ধ প্রকাশের (১৩২৪ মাঘ) কিছুকাল পরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আর একটি রচনাতেও অশোক ও আকবরের কথা একসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে বিধাতার রচিত ইতিহাসের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে।—

> বিধাতার রচা ইতিহাস আর মানুষের রচা কাহিনী এই দুই কথায় মিলে মানুষের সংসার। মানুষের পক্ষে কেবল যে অশোকের গল্প, আকবরের গল্পই সত্য তা নয়; যে-রাজপুত্র সাত-সমুদ্র-পারে সাত রাজার ধন মানিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য।
>
> —'প্রবাসী' ১৩২৭ বৈশাখ, গল্প বল।

এই রচনাটি পরে সংকলিত হয় 'লিপিকা' গ্রন্থে (১৯২২) 'গল্প' নামে। এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ এখানে বিধাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনার সত্য দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারত-ইতিহাস থেকে অশোক ও আকবরের নাম উল্লেখ করেছেন। 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' প্রবন্ধে প্রকাশিত অভিমতের সঙ্গে এই উক্তির যে সংগতি দেখা যায়, তা তাৎপর্যহীন নয়।

১০

'যাত্রার পূর্বপত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় কালে অর্থাৎ অশোকের সময়ে এবং তৎপরবর্তী যুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের ত্যাগধর্মকে বরণ করে নিয়েছিল, তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করে ভারতীয় ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হয়ে মানবকল্যাণের জন্যে অকাতরে দুঃখ বরণ করেছেন এবং ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করেই ভক্তগণকে 'বীর্যবান্ মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা' দান করেছিল। বুদ্ধদেব ও অশোকের ধর্মপ্রেরণার প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত দীর্ঘকাল পরেও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৩৫ সালে (বাংলা ১৩৪২, জ্যৈষ্ঠ ৪, বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি) কলকাতায় শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধজন্মোৎসব অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, তাতেও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টতর ভাষায়। ভাষণটি 'বুদ্ধদেব' নামে প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় (প্রবাসী, ১৩৪২ আষাঢ়, পৃ ৩০২-০৩)। তাতে তিনি বলেন—

> ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে।

ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেন না বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল দেশের মানুষকে। ...তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে, সকল কালের জন্যে। তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন যা দুঃসাধ্য, যা চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী বা বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান্ পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি—শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্জন গুহায়।

এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা প্রকাশ করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে। এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে ?

—'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সংকলিত, বুদ্ধদেব (১৯৩৫)

এই যে সকল কালের সকল মানুষের কল্যাণসাধনের প্রেরণা অশোকের অনুশাসনে তার প্রকাশ ঘটেছে বার বার। যেমন—"নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতৎপা" (ষষ্ঠ শিলানুশাসন), অর্থাৎ সর্বলোকের হিতসাধন অপেক্ষা মহত্তর কর্ম নেই। বুদ্ধের বাণীতে এই যে সকল মানুষের স্বীকৃতি, তাকে সর্বতোভাবে রূপ দিয়েছিলেন অশোক, আর ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার বাইরে দেশে দেশান্তরে তাকে ব্যাপ্তিও দিয়েদিলেন তিনিই। কিন্তু এ কাজ সহজ ছিল না। অশোক নিজেই বলেছেন,—'কলাণং দুকরং। যো আদিকরো কলাণস সো দুকরং করোতি" (পঞ্চম শিলানুশাসন), অর্থাৎ কল্যাণ দুষ্কর, যিনি আদি কল্যাণকৃৎ তিনি দুঃসাধ্য সাধন করেন। বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা এই যে,—এ ধর্ম দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেয়, তাতে বীর্যের স্থান নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন কঠিন বীর্যের উপরেই তার প্রতিষ্ঠা। যে প্রেমময় ত্যাগের আবেগ মানুষকে মানবকল্যাণের জন্য দেশে দেশান্তরে দুর্গমে দুস্তরে অভিযান করতে প্রেরণা দেয়, নিজের প্রাণ ও আরামকে তুচ্ছ করে দুঃখের মহত্ত্বকে বরণ করতে শিক্ষা দেয়, সেই ত্যাগ-প্রতিষ্ঠ প্রেমের বীর্যবত্তার তুলনা কোথায়? এই প্রেমের বীর্যই দুঃসাধ্য

সাধনে, সংগ্রামজয়ে ও সমস্ত বন্ধন ছেদনে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়। এই 'অমেয় প্রেমের' প্রভাব ও প্রেরণা কতখানি, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন তাঁর বোরোবুদুর ও সিয়াম কবিতায় (পরিশেষ কাব্যে)। ভগবান বুদ্ধ মানুষের অন্তরে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন কঠিন সাধনা ও দুঃসাধ্য প্রকাশের দিকে। সে প্রেরণা

> মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
> দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে,···
> বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে
> দুঃসাধ্য কীর্তিতে, কর্মে, চিত্রপটে, মন্দিরে, মূর্তিতে।
>
> —'পরিশেষ' সিয়াম, প্রথম দর্শনে (১৯২৭)

রবীন্দ্রনাথের অভিমতে এ সমস্ত দুঃসাধ্য কীর্তির চেয়েও মহত্তর রাজাধিরাজ অশোকের চারিত্রমহিমা, তাঁর ত্যাগনিষ্ঠা ও কল্যাণব্রত, আর এই জন্যেই মানুষের ইতিহাস জগতের শ্রেষ্ঠতম রাজার মর্যাদা নিবেদন করেছে তাঁকেই। অশোক নিজের অন্তরের হিংসাকে দমন করে সর্বজগতে অহিংসা প্রেম ও কল্যাণের ধর্ম প্রতিষ্ঠার ব্রত ধারণ করলেন। বুদ্ধের চরণে এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য আর কি হতে পারে? মরুপ্রান্তরে শৈলশিখরে সমুদ্রকূলে বিচিত্র কর্মকীর্তি প্রতিষ্ঠার চেয়েও এই চিত্তমার্জনার ব্রত যে মহত্তর, দুঃসাধ্যতর এবং অধিকতর ত্যাগ ও বীর্যবত্তার পরিচায়ক, তাতে কি সন্দেহ আছে?

১১

১৯৪০ সালে হিল্‌ডা সেলিগম্যান নামে একজন ইংরেজ লেখিকা ভারতবর্ষের মৌর্যরাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশ করেন। বইটির নাম *When Peacocks Called**। রবীন্দ্রনাথ এটির একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখেছেন মৃত্যুর অল্পকালমাত্র পূর্বে। ওই ভূমিকাটিতেও অশোকের রাজত্বকাল সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোক্ত অভিমতই সংক্ষিপ্ত অথচ সুদৃঢ় ভাষায় পুনঃপ্রকাশ পেয়েছে।—

* সেলিগম্যানের এই উপন্যাসখানি সাহিত্যসমাজে সমাদর লাভ করেছে এবং এটির একটি ভারতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে (১৯৫১)। প্রকাশক—হিন্দ কিতাব, বম্বে।

In an age of fratricide, aided by intellectual dehumanization in large areas of the world, it is difficult to restore the calm air so necessary for the realisation of great human ideals. Hilda Seligman has chosen in her book to reveal the organization side of *a great humanism which came with King Asoka of India*. My good thoughts go with the author in her venture to present ancient India through its message which has a *perennially modern* significance.

—Foreword (1940),
When Peacocks Called.

বিশেষভাবে লক্ষণীয় কথাগুলি বক্রাক্ষরে চিহ্নিত করে দিলাম। ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাবের মধ্যেও অশোক যে মহৎ মানবিক আদর্শ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, আজও তা জগতের অভীষ্টস্থানীয় হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, তৎকালে অশোকের কর্মপ্রেরণা বিশ্ববাসীকে যে 'বীর্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা' গ্রহণ করতে আহ্বান করেছিল, আজকের দিনেও তার মহনীয়তা কিছুমাত্র কমেনি। কারণ বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে অশোকের সাধনাপুষ্ট ওই মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ 'চিরকালের আধুনিক' অর্থাৎ চিরন্তন।

তাই দেখি মহৎ মনুষ্যত্বের প্রেরণাদাতা হিসাবে অশোকের সম্বন্ধে ১৯০৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন, মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ১৯৪০ সালেও তাঁর সে শ্রদ্ধা সমভাবেই উজ্জ্বল ছিল।

রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে একমাত্র বুদ্ধদেব ছাড়া ভারতবর্ষের অধুনাপূর্ব যুগের আর কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিই বোধকরি অশোকের মত এমন অকুণ্ঠ ও অজস্র প্রশস্তির অঞ্জলি লাভ করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস

'প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই।' এই অভিমতের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন—

> সকল সভ্যদেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস, জীবনী ও উপন্যাস আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না; যদি-বা ভারতসাহিত্যে ইতিহাস-উপন্যাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র (১৮৯৯)

আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরাও বলেন, ভারতবর্ষে ইতিহাসচেতনা দুর্বল ছিল বলেই এ দেশের সাহিত্যে ইতিহাস বা জীবনচরিতের এমন নৈরাশ্যকর বিরলতা। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করতে আধুনিক পণ্ডিতদের বহুজনসাধ্য ও দীর্ঘকালব্যাপী উঞ্ছবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু সে ইতিহাস আজও পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করতে পারেনি, কখনও পারবে বলে আশাও করা যায় না।

কিন্তু এই যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস উদ্ধারের ঐকান্তিক প্রয়াস, সে কোন্ আদর্শের ইতিহাস? বলা বাহুল্য, ভারতীয় সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের ইতিহাসের অভাবই পণ্ডিতদের আক্ষেপ বা অভিযোগের হেতু। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল পূর্বে মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় আমাদের স্বপ্রকৃতি-সচেতন করবার অভিপ্রায়ে বলেছিলেন—

> জাতিভেদে সর্বপ্রকার সাহিত্য-রচনার রীতি ভিন্ন হয়। ইতিবৃত্ত-প্রণয়নের প্রণালীও স্বতন্ত্র হয়।···ফলতঃ সকল জাতির কাব্য, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্রাদি তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ জাতীয় লক্ষণ প্রকাশ করে।···ভারতবাসীদিগের ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয় গ্রীক বা ইউরোপীয় ইতিহাসের অনুরূপে রচিত নয় বলিয়া ভারতবাসীর ইতিহাস নাই, এ কথাও অসংগত।···আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ ইতিহাস আছে।

—'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), ৪র্থ অধ্যায়: ঐতিহাসিক প্রকৃতিভেদ

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই-জাতীয় কথাই বলেছেন আমাদের আত্মসংবিৎ ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে।—

> ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথচাইলডের জীবনী পড়িয়া গেছে, সে খ্রীস্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে।…তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন যেখানে পলিটিক্স্ নাই সেখানে আবার হিস্ট্রী কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্য বলিয়াই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।
> যীশুখ্রীস্টের হিসাবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে খাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়। তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক্ হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়।
>
> —'ভারতবর্ষ,' ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৯০২)

ভূদেব-রবীন্দ্রনাথের এ-সব উক্তি সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পাশ্চাত্ত্য আদর্শে কালনিষ্ঠ ও বিষয়নিষ্ঠ ইতিহাস না থাকার ফলে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ ও কৌতূহল অতৃপ্ত রয়ে গেছে। সকল সভ্য দেশই নিজেদের ইতিহাস ও কীর্তিমান্ পুরুষদের জীবনচরিত আপন সাহিত্যে আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করে রাখে, কিন্তু ভারতবর্ষের সে আগ্রহ ছিল না, এটা আমাদের 'অসামান্যতা' হতে পারে, কিন্তু এই অসামান্যতা আমাদের দৈন্যেরও পরিচায়ক, ফলে দুঃখেরও কারণ। কালধর্মবশে আজ ইতিহাস ও জীবনচরিত সম্বন্ধে আমাদের মনে যখন সে আগ্রহ জাগল, তখন দেখলাম আমাদের পিতামহরা সে ভাণ্ডারে কোনো ধনই সঞ্চিত করে রাখেন নি, আর সেই ইতিহাসজিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করবার কোনো উপায়ও নেই। তাই তো আমাদের প্রত্নজিজ্ঞাসুরা লুপ্তরত্নোদ্ধারের আশায় মাটি

খুঁড়ে ও পুরাতত্ত্বের গহন বনে দীর্ঘকাল বিচরণ করে প্রাচীন ইতিহাসের ছিন্নপত্র কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ওই ছিন্নাংশগুলিকে অতি কষ্টে জোড়া দিয়েও একটি সমগ্র ও সুসংবদ্ধ কাহিনী উদ্ধার করা সম্ভব নয় বলে আক্ষেপ করছেন।

আমাদের বর্তমান আক্ষেপ প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে নয়, জীবনচরিত সম্বন্ধে। কেননা প্রাচীন ভারতের যেমন ইতিহাস নেই, তেমনি জীবনচরিতও নেই। অথচ পুরাকালে এদেশে যে অসাধারণ প্রতিভাশালী ও মহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল তার প্রচুর আভাস পাই। তাঁদের কীর্তির ভগ্নাবশেষও আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রমহিমার পরিচয় লাভের কোনো উপায় আজ নেই। প্রত্যেক সভ্যদেশেরই আকাশ উজ্জ্বল হয় সে-সব দেশের মহাপুরুষদের চারিত্র-মহিমার দীপ্তিতে। ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্ধকার হয়ে আছে ও-রকম চরিত্রদীপ্তির অভাবে। অভাবে বলা ঠিক হল না; কারণ ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অভাব কখনও ঘটে নি, কিন্তু ওই জ্যোতিষ্ক-রাজির অধিকাংশই আমাদের ইতিহাসহীনতার মেঘাবরণে আচ্ছন্ন থাকাতে আধুনিক কালের দৃষ্টিগোচর হতে পারছে না। ওই মেঘাবরণের আড়াল সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের যে-কয়টি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আভাস আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পেরেছে তাঁদের মধ্যে তিন জনের নাম সর্বাগ্রগণ্য—বুদ্ধ, অশোক ও কালিদাস।

২

বুদ্ধ, অশোক ও কালিদাস, এই তিনজনই হচ্ছেন প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। আরও বহু শক্তিমান্ পুরুষের কীর্তির আভাস বা অবশেষ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে; কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই না, কালের ব্যবধানে ও জীবনচরিতের অভাবে তাঁদের ব্যক্তিত্ব অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তাঁদের কীর্তিকলাপের মধ্যেও তাঁদের ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট নয়। বুদ্ধ, অশোক, কালিদাসেরও ইতিহাস বা জীবনচরিত আমরা পাই নি। এ কথা সত্য যে, বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধ ও অশোকের জীবনচরিতজাতীয় বহু আখ্যান পাওয়া যায়, যেমন ললিতবিস্তরে ও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে পাই বুদ্ধের

আখ্যান আর অশোকাবদানে আছে অশোকের আখ্যান। কিন্তু এগুলিকে কখনও যথার্থ জীবনচরিত বলা যায় না, এগুলিতে বুদ্ধ বা অশোকের ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায় না। এগুলি হচ্ছে আসলে জনশ্রুতির সংকলন মাত্র ; অজ্ঞ জনসাধারণের বিস্ময়বিমূঢ় ও ভক্তিমুগ্ধ চিত্তে এঁদের অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বমহিমা যে অলৌকিকতার রঙে রঞ্জিত ও বিকৃত হয়ে প্রতিভাত হয়েছিল তারই পরিচয় পাই ওই জনশ্রুতিগুলিতে। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতকে অবশ্য ঠিক জনশ্রুতির পর্যায়ে ফেলা যায় না, ও-কাব্যে অতি উঁচুস্তরের কবিপ্রতিভা জনশ্রুতিকেই কবিকল্পনার দিব্য আভায় মণ্ডিত করে বুদ্ধচরিতকে অমরলোকে উন্নীত করেছে। অর্থাৎ এ গ্রন্থও জীবনচরিত নয়, মহৎ কাব্য মাত্র। কালিদাসের ভাগ্য বুদ্ধ-অশোকের চেয়েও মন্দ। তাঁর ভাগ্যে ললিতবিস্তর বা অশোকাবদানের ন্যায় আখ্যানও রচিত হয় নি। কিন্তু কালিদাসের সম্বন্ধে জনশ্রুতির অপ্রতুলতা নেই, বস্তুতঃ সমগ্র বৌদ্ধজগৎ যেমন বুদ্ধ-অশোকের কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কালিদাসবিষয়ক জনশ্রুতিতে তেমনি ভারতবর্ষের প্রতি প্রান্ত ছেয়ে আছে বহু শতাব্দী যাবৎ।

জীবনচরিত না থাকুক, জনশ্রুতি আছে। জনশ্রুতির বাহুল্যই প্রমাণ করে তার লক্ষীভূত পুরুষরা অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু জনশ্রুতি কখনও জীবনচরিতের অভাব পূরণ করতে পারে না। জনশ্রুতি জনতার ছোটখাট কতকগুলি অতি সাধারণ রকমের কৌতূহল নিবৃত্ত করে মাত্র, সত্যসন্ধিৎসুর জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করতে পারে না। মহাপুরুষদের ব্যক্তিত্বের তথা জনতার ভক্তি বা শ্রদ্ধার প্রকৃতিভেদে জনশ্রুতিরও প্রকৃতিভেদ ঘটে। বুদ্ধ অশোক ও কালিদাস, এই তিনজনের কীর্তি ও ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্র ও প্রকৃতি ছিল তিন রকমের। তাই এঁদের সম্বন্ধে যে কিংবদন্তীর উদ্‌ভব ঘটেছে তাও স্বভাবতই হয়েছে তিন ধরণের।

কিন্তু কিংবদন্তী অবলম্বনে যদি এঁদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যায় তা হলে কারও প্রতিই সুবিচার করা হবে না। কেননা জনশ্রুতি নির্ভর করে জনতার স্বতঃসংকীর্ণ বোধশক্তি ও রুচির উপরে। সত্য প্রকাশের শক্তি জনশ্রুতির নেই।

তাই তো পুরাব্রতীরা আত্মনিয়োগ করেছেন বুদ্ধ অশোক ও কালিদাসের ইতিহাস উদ্ধারে। বস্তুতঃ বুদ্ধ ও অশোকের ইতিহাস আজ আর অজানা

নয় ; তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রায় পরিপূর্ণ চিত্রই রচিত হয়েছে ইতিহাসব্রতীদের সাধনায়। এই দুইজনই মুখ্যতঃ কর্মযোগী, মানবসমাজই এঁদের কর্মক্ষেত্র ; তাঁদের কর্মকীর্তি বিপুল এবং তাঁদের ইতিহাস রচনার উপাদানও অপ্রচুর নয়। এই কর্মকীর্তি ও ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে তাঁদের ব্যক্তিত্বচিত্র রচনা সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধ নিজে তাঁর চরিতরচনার কোনো প্রত্যক্ষ উপাদান রেখে যান নি। কিন্তু পালি ত্রিপিটকে যে পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায় তার পরিমাণ ও মূল্য দুই-ই খুব বেশি ; তার উপরে নির্ভর করেই বুদ্ধচরিতের অপূর্ব মহিমময় চিত্র অঙ্কন সম্ভব হয়েছে। অশোকচরিতের উপাদান পরিমাণে কম, কিন্তু তার মূল্য অপরিসীম, কেননা সে উপাদান রক্ষিত হয়েছে তাঁর আপন বাণীতেই অক্ষয় শিলালিপিতে। সে উপাদানের সহায়তায় অশোকচরিতের যে বাণীমূর্তি রচনা সম্ভব হয়েছে, তার স্থায়িত্ব ও রূপমহিমার কাছে মর্মরমূর্তিও হার মানতে বাধ্য। কিন্তু কালিদাসের ইতিহাস বা জীবনচরিত রচনায় ইতিবৃত্তকাররা অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন, এই অক্ষমতার হেতু নাকি উপাদানের বিরলতা। ফলে আজও ‘পণ্ডিতেরা বিবাদ করেন লয়ে তারিখ-সাল’। কালিদাসের কর্মকীর্তি নেই, তার কোনো পাথুরে নিদর্শন নেই, এমন কি তাঁর পিতৃপরিচয় পর্যন্তও নেই। তাই তাঁর জীবনচরিত রচনাও সম্ভব নয়। এইখানেই বুদ্ধ ও অশোকের কাছে কালিদাসের হার। অথচ তাঁর জিতও এখানেই। সে কথা পরে বলছি।

৩

বেদ-উপনিষদ্ এবং রামায়ণ-মহাভারতকে বাদ দিলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর কাছে গৌরবান্বিত বুদ্ধ, অশোক ও কালিদাস এই তিনজনের জন্য। আর রবীন্দ্রনাথের কাছে এই তিনজন যে মহৎ অর্ঘ্য লাভ করেছেন, প্রাচীন ভারতের আর কেউ তা পান নি।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবয়সেই বলেছিলেন—

জগতে যত মহৎ আছে,
হইব নত সবার কাছে।

—‘মানসী,’ দেশের উন্নতি (১৮৮৮)

আর জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে এসেও বলেছেন—

তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

—'জন্মদিনে,' ১৮

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই চারিত্রপূজারি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ, অশোক ও কালিদাস, প্রাচীন ভারতের এই তিন মহৎ ব্যক্তিত্বকে অভিবন্দনা জানাতে আগ্রহী হয়েছিলেন। কিন্তু মহত্ত্বের বৈশিষ্ট্যভেদে তিনজনকে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে। বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে কি গভীর ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করেছেন তা কারও অজানা নেই। অশোককে তিনি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন তা সুপরিজ্ঞাত না হলেও তার মূল্য কম নয়। অন্যত্র সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। কালিদাসের ব্যক্তিত্বকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখেছেন ও আমাদের কাছে কিভাবে উপস্থাপিত করেছেন, বর্তমানে তাই আমাদের বিচার্য বিষয়।

ভারতবর্ষ আপন অসামান্যতাবশতঃ কালিদাসের জীবনচরিত সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু সাধারণ মানুষ অসামান্য নয়। তাই কালিদাসের আবির্ভাব-কাল, জন্মস্থান, জীবনযাত্রা ও চারিত্রবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। আধুনিক পণ্ডিতেরা সাল-তারিখ নিয়ে বিবাদ করেও সে কৌতূহল চরিতার্থ করতে সমর্থ হন নি। কিন্তু আধুনিক ভারতের অসামান্য কবি প্রাচীন ভারতের অসামান্য কবিকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন, আর তাও করেছেন অসামান্য উপায়েই। তিনি কালিদাসের জীবনচরিত রচনায় ব্রতী হন নি, ব্রতী হয়েছেন তাঁর ব্যক্তিত্বনিরূপণে। অর্থাৎ কালিদাসের বহির্জীবনের বিবরণ-সংকলন নয়, তাঁর অন্তর্জীবনের স্বরূপনির্ণয়ই ছিল তাঁর অভিপ্রেত।

এবার রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্যের আশ্রয় নেওয়া যাক। তিনি বলেন—

> আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত।··· কালিদাস সম্বন্ধে যে গল্প আছে তাহাও এইরূপ। তিনি মূর্খ অরসিক

ও বিদুষী স্ত্রীর পরিহাসভাজন ছিলেন। অকস্মাৎ দৈবপ্রভাবে তিনি কবিত্বরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। বাল্মীকি নিষ্ঠুর দস্যু ছিলেন এবং কালিদাস অরসিক মূর্খ ছিলেন, এই উভয়ের একই তাৎপর্য। বাল্মীকির রচনায় দয়াপূর্ণ পবিত্রতা এবং কালিদাসের রচনার রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্যের অদ্ভুত অলৌকিকতা প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টামাত্র। এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, তাঁহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। কবির জীবন হইতে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত, কবির কাব্যের সহিত তাহার কোনো গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না।

—'সাহিত্য', কবিজীবনী (১৯০১)

এই শেষ উক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। কালিদাসের জীবনচরিত থাকলেও তাতে তাঁর বাহ্যজীবনের তথ্যাবলীরই সন্ধান পাওয়া যেত, কিন্তু তাঁর সেই মানসসত্তার পরিচয় থাকত না যার শিখরচূড়া থেকে তাঁর কাব্য-মন্দাকিনীর উদ্‌ভব। কবির কাব্য তাঁর মানস স্বরূপেরই প্রতিরূপ; তাঁর দৈহিক জীবনের সঙ্গে কাব্যের কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই, থাকলেও তার মধ্যে চিরন্তনতা নেই। এই অভিমতই প্রতিধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবদ্ধ ভাষাতেও—

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লোটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।

—'উৎসর্গ' (১৯১৪), ২১

যে সাধারণ মানুষটি স্থানকালের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ এবং ক্ষণিক সুখ-দুঃখের আবেগে বিচলিত, সে সাধারণ মানুষটির জীবনযাত্রার বিবরণের মধ্যে, কবির যে সত্তা স্থানকালের অতীত তার পরিচয় মেলে না, এ কথা সত্য। কিন্তু ওই সাধারণ মানুষটির বহির্জীবনের গণ্ডীর মধ্যে তার কবিসত্তা যেমন ধরা দেয় না, তেমনি তার ব্যক্তিসত্তাও তার মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। প্রতিভাবান্ মানুষমাত্রেরই ব্যক্তিত্ব তার দেহযাত্রার সীমাকে প্রতি মুহূর্তেই অতিক্রম করে যায়। কবিত্বও প্রতিভারই প্রকাশভেদ। আবার, কবিত্ব

বা প্রতিভা ব্যক্তিত্ব-আশ্রয়ী, দেহযাত্রা-আশ্রয়ী নয়। পক্ষান্তরে মানুষের ব্যক্তিসত্তা তথা কবিসত্তা নিছক জীবনযাত্রা-নিরপেক্ষ হলেও তার মননযাত্রা-নিরপেক্ষ নয়। সুতরাং কবিকে তথা তার ব্যক্তিত্বকে তার জীবনচরিতে পাওয়া না গেলেও তার মননচরিতে নিশ্চয় পাওয়া যায়।

কালিদাসের জীবনচরিতের উপাদান পাওয়া যায় না বলে দুঃখ নেই। কিন্তু তাঁর মনন প্রকৃতি নির্ণয়ের উপাদান পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই সুখের বিষয় হত, রবীন্দ্রনাথও সুখী হতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেছিলেন, কবিতা বুঝে লাভ আছে, কবিকে বুঝলে আরও লাভ, তখন কবির নিছক বাহ্য-জীবনের পরিচয়ই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না; কবির অন্তর্জীবন ও মননপ্রকৃতির স্বরূপ-উপলব্ধিই ছিল তাঁর অভিপ্রেত। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে পরস্পরবিরোধী মনে করবার হেতু নেই। অর্থাৎ 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে' এ কথা যেমন সত্য, কবিতাকে বুঝতে গেলে কবিকেও বোঝা চাই এ কথাও তেমনি সত্য।

কিন্তু কবিসত্তা বা ব্যক্তিত্বও নিরালম্ব বস্তু নয়, অর্থাৎ দেশ-দেশ ও কাল-গত পরিবেশনিরপেক্ষ নয়। কালিদাসের কবিত্ব তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব তৎকালীন পরিবেশনিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ওই পরিবেশের প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ছাড়া কালিদাসের কবিত্বস্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নয়। কেননা কালিদাসের যুগপ্রভাব তথা তাঁর ব্যক্তিত্ব স্বভাবতই তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখা চাই। কবির যুগ ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় যেমন তাঁর কাব্যের অন্তঃস্বরূপ উপলব্ধির সহায়ক, তেমনি কাব্যের স্বরূপবিশ্লেষণের দ্বারা কবির যুগ ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যনির্ণয়ও অনেকাংশে সম্ভব। শ্রেষ্ঠ কবিদের সম্বন্ধেই এ কথা বিশেষভাবে সত্য। কেননা শ্রেষ্ঠ কবিরাই যুগের যথার্থ প্রতিনিধি।

কালিদাস তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র প্রতিনিধি। তখনকার দিনের কোনো সম্রাট্, রাষ্ট্রনায়ক বা সমাজনেতা ওই প্রতিনিধিত্বের অধিকারী নন। তখনকার যুগচরিত্রের পরিচয় জানা থাকলে কালিদাসের কাব্য বোঝা সহজ হয়। তেমনি ওই কাব্য থেকেই ওই যুগের প্রকৃতিনির্ণয়ও সম্ভব। রবীন্দ্র-নাথ কালিদাস ও তাঁর কাব্যকে এই দুই দিক্ থেকেই বিচার করেছেন।

৪

কালিদাসের ব্যক্তিত্বনির্ণয়ের একমাত্র উপাদান তাঁর কাব্যগুলি। অন্য কোনো বাহ্য উপাদান নেই। কিন্তু যে উপাদানগুলি আমরা পেয়েছি তার মূল্য অপরিমেয়। বুদ্ধচরিত বা অশোকাবদানের ন্যায় কালিদাসচরিত-জাতীয় কোনো আখ্যান আমরা যে পাই নি তা ভালোই হয়েছে। ওরকম আখ্যান কালিদাসের ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্নই করত, প্রকাশ করত না। বুদ্ধচরিত ও অশোকাবদানও বুদ্ধ এবং অশোকের স্বরূপকে বহু শতাব্দী যাবৎ উত্তরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করেই রেখেছিল। আধুনিক কালে বহুযুগসঞ্চিত জনশ্রুতির বা কবিকল্পনার স্তর অপসারণ করে অন্য নির্ভরযোগ্য উপাদানের সাহায্যে বুদ্ধ ও অশোকের চরিত্রকে আবিষ্কার করতে হয়েছে। বুদ্ধচরিতের উপাদান আছে পালি ত্রিপিটকে, এগুলিকে প্রত্যক্ষ সাক্ষী বলে গ্রহণ করা না গেলেও অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য। অশোকচরিতের উপাদান তাঁর শিলালিপিগুলি, সমকালীন, প্রত্যক্ষ ও কার্যতঃ অশোকের স্বমুখনিঃসৃত। তাই এগুলি মূল্য ও নির্ভরযোগ্যতা অপরিসীম, কিন্তু পরিমাণে স্বল্প। এখানেই কালিদাসের জিত। কেননা তাঁর কাব্যগুলি গুণেও কম নয়, পরিমাণেও অল্প নয়। বস্তুতঃ কাব্যেই কবির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

আধুনিক কালের পণ্ডিতেরা কালিদাসের জীবনকাহিনী রচনার বাহ্য উপাদান না পেয়ে হতাশ হয়েছেন। তাঁরা তাঁর কাব্যগুলিকে আশ্রয় করে তাঁর ব্যক্তিত্বনির্ণয়ে প্রয়াসী হন নি। কিন্তু জনশ্রুতি সেই পথেই অগ্রসর হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, তাঁহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে'। আর এজন্যই রবীন্দ্রনাথ ওই জনশ্রুতিগুলিকেই 'কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত' বলে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু অজ্ঞ জনগণের পক্ষে কবির কাব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার বা উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তাই লোকশ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের ব্যক্তিত্ব বিকৃত হয়েই প্রকাশ পায়। কালিদাসের বেলায় যে তা ঘটেছে সে কথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন।—

> কালিদাস একান্তই সৌন্দর্যসম্ভোগের কবি, এ মত লোকের মধ্যে প্রচলিত। সেইজন্য লৌকিক গল্পে-গুজবে কালিদাসের চরিত্র কলঙ্কে মাখানো। এই গল্পগুলি জনসাধারণকর্তৃক কালিদাসের কাব্য

সমালোচনা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, জনসাধারণের প্রতি আর যে-কোনো বিষয়ে আস্থাস্থাপন করা যাক, সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সেই অন্ধের উপরে অন্ধ নির্ভর করা চলে না।

—'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা (১৯০১)

কবির কাব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বনির্ণয় প্রতিভার কাজ, অজ্ঞ জনগণের কাজ নয়। ঐতিহাসিকগণ এ কাজে হাত দেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষেই কালিদাসের কাব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব বা মনঃপ্রকৃতির স্বরূপনির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর একটি উক্তি এই।—

মনে আছে, বহুকাল হল, রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলুম। যে আনন্দ পেলুম সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। সেই কাব্যে আমার মন আপনি বিশেষ স্বত্ব উপলব্ধি করবার বাধা পেল না। বেশ বুঝলুম, এ কাব্য আমি যে-রকম করে পড়লুম, দ্বিতীয় আর কেউ তেমন করে পড়ে নি।

—পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ৩০।৯।১৯২৪

কালিদাসের কাব্য পড়ে তিনি যে আনন্দ পেয়েছিলেন সে হচ্ছে সেই কাব্যের মধ্যে কালিদাসের ব্যক্তিস্বরূপকে, তাঁর যুগকে ও সে যুগের ভারতবর্ষকে আবিষ্কারের আনন্দ। তবে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে শুধু আবিষ্কার নয়, সৃষ্টিও করেছেন; তেমন যে তাঁর পূর্বে বা পরে আর কেউ করেন নি তাতে সন্দেহ নেই।

কালিদাসের কাব্য কখন তিনি আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলেন তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবু অনুমান করবার কতখানি অবকাশ আছে তা বিচার করে দেখার সার্থকতা আছে। সন্ধান করলে হয়তো কোনোদিন তার প্রমাণও পাওয়া যেতে পারে।

৫

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বালক-বয়সেই কালিদাস-সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধিত হয়েছিল। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখে মেঘদূত এবং কালিদাসের কাব্যপ্রেমিক কবি বিহারীলালের মুখে কুমার-সম্ভব আবৃত্তির কথা রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সেও ভুলতে পারেন নি। গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে তিনি কুমারসম্ভব পড়েছিলেন আর রামসর্বস্ব পণ্ডিত

তাঁকে পড়াতেন শকুন্তলা। কুমারসম্ভবের কিছু অংশ তিনি বাংলা ছন্দে অনুবাদও করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে।

কালিদাসের সাহিত্যের সঙ্গে অল্প বয়সের এই পরিচয় যে পরবর্তী কালে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল, তার প্রমাণ রবীন্দ্রসাহিত্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে। ১৮৮৭ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে আছে—

> কুমারসম্ভবের মহাদেবের সহিত অন্নদামঙ্গলের তুলনা কর। কল্পনার দারিদ্র্য যদি দেখিতে চাও, অন্নদামঙ্গলের মদনভস্ম পাঠ করিয়া দেখ।
>
> —'সাহিত্য' (১৯৫৮ সং), পৃ ১৮৯ আলস্য ও সাহিত্য

কালিদাসের কাব্যপাঠের প্রথম সুস্পষ্ট ছায়াপাত দেখতে পাই মানসী কাব্যের তিনটি কবিতায়। 'একাল ও সেকাল' কবিতাটিতে (১৮৮৮। বৈশাখ ২১) আছে—

যক্ষনারী বীণাকোলে ভূমিতে বিলীন
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ
অযত্নশিথিল বেশ ;
সেদিনো এমনিতরো অন্ধকার দিন।

এখানে উত্তরমেঘের 'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং' ইত্যাদি বর্ণনার আভাস সুস্পষ্ট। তার পরের দিন রচিত 'কুহুধ্বনি' কবিতাটিতে (১৮৮৮। বৈশাখ ২২) আছে—

লতাকুঞ্জে তপোবনে
বিজনে দুষ্যন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর।

বোঝা যাচ্ছে ১৮৮৮ সালেই মেঘদূত ও শকুন্তলা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে অনেকখানি অধিকার করেছিল। ১৮৯০ সালে রচিত বিখ্যাত 'মেঘদূত' কবিতাটি তারই পরিণতি। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কালিদাসের কাব্যসৌন্দর্যেই মুগ্ধ ছিলেন। কালিদাসের ব্যক্তিত্ব বা প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্যচিন্তা তখনও তাঁর মনে প্রাধান্য পায় নি। উক্ত কবিতাটি সম্বন্ধে তিনি সে সময়ে প্রমথ চৌধুরীকে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তাতেও রসগ্রাহিতারই

প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ সময় থেকেই যে তাঁর মনে প্রাচীন ভারতের ছবি জাগতে শুরু করেছে তার একটু আভাস আছে ওই পত্রেও।—

> যে সময় কালিদাস লিখেছিল সে সময়ে কাব্যে লিখিত দেশদেশান্তরের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উজ্জয়িনী রাজধানীতে বাস করত, তাদেরও ত বিরহব্যথা ছিল।
>
> —চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৩৮-৪৪

প্রাচীন ভারতের এই যে আভাস, তার পূর্ণতর চিত্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে পরের বৎসরে প্রকাশিত 'মেঘদূত' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে। সে চিত্র যেন কবির কল্পনাচক্ষে স্বপ্নের মোহাঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে সেই বিগত দিনের জন্যে তাঁর হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলেছে।—

> রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে চিরকালের মত আমরা নির্বাসিত হইয়াছি।...মনে হয় ঐ রেবা শিপ্রা নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে, অবন্তী বিদিশার মধ্যে, প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত (১৮৯১)

এই যুগে যে কালিদাসের কাব্য, বিশেষতঃ মেঘদূতের প্রতি কবিচিত্তে বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, তার অন্য প্রমাণও আছে। এই সময়ে এক পত্রে তিনি লেখেন—

> অন্যবার বরাবর আমার বৈষ্ণব কবি এবং সংস্কৃত বই আনি; এবার আনি নি, সেই জন্যে ঐ দুটোরই প্রয়োজন বেশি অনুভব হচ্ছে। যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম, তখন যদি মেঘদূতটা সঙ্গে থাকত ভারী সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না।
>
> —ছিন্নপত্র, পত্র ৭৪ (১৮৯৩ মার্চ)

ছিন্নপত্র গ্রন্থের ৭১-সংখ্যক পত্রেও (১৮৯৩ ফেব্রুআরি ১৪) মেঘদূতের উল্লেখ আছে একটি স্বচ্ছতোয়া শীর্ণা নদীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে। শুধু মেঘদূত নয়,

কালিদাসের অন্য কাব্যের প্রতিও তাঁর আগ্রহের নিদর্শন আছে এই সময়ের রচনায়।—

> সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর-চেহারা রাজারা বসে গেছেন, এমন সময় শঙ্খ এবং তুরীধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ পরে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানে সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে সুন্দর লাগে। তার পরে সুনন্দা এক-এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক-একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম-করাটি কেমন সুন্দর। যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই রাজা, সকলেই তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই অবশ্যরূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না।
>
> —ছিন্নপত্র, পত্র ৬০ (১৮৯২ জুন ২৯)

এখানেও সৌন্দর্যের স্বপ্নমাখা দৃষ্টি, বিশুদ্ধ রসগ্রাহিতার নিদর্শন।

বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা একখানি পত্রে (১৮৯২) কাব্যে কবির ব্যক্তিত্বের ছাপ যে না থেকে পারে না তা বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখলেন—

> কালিদাসের দুষ্যন্ত-শকুন্তলা এবং মহাভারতকারের দুষ্যন্ত-শকুন্তলা এক নয়, তার প্রধান কারণ কালিদাস এবং বেদব্যাস এক লোক নন, উভয়ের অন্তরপ্রকৃতি ঠিক এক ছাঁচের নয়; সেইজন্য তাঁরা আপন আপন অন্তরের ও বাহিরের মানবপ্রকৃতি থেকে যে দুষ্যন্ত-শকুন্তলা গঠিত করেছেন তাদের আকারপ্রকার ভিন্ন রকমের হয়েছে। তাই বলে বলা যায় না যে, কালিদাসের দুষ্যন্ত অবিকল কালিদাসের প্রতিকৃতি; কিন্তু তবু একথা বলতেই হবে তার মধ্যে কালিদাসের অংশ আছে, নইলে সে অন্যরূপ হত।
>
> —সাহিত্য (১৯৫৮), সাহিত্য (১২৯৯ বৈশাখ), পৃ ২০২-০৩

কালিদাসের কাব্যে যে তাঁর আত্মপ্রকৃতির প্রতিফলন ঘটেছে, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তা বিশদভাবেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তাঁর 'তপোবন' প্রবন্ধে (১৯০৯)। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে।

৬

অতঃপর চৈতালির যুগে (১৮৯৬) এসে দেখি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনভারত-বোধ এবং আগ্রহ গভীরতর ও ব্যাপকতর হয়েছে। কবির দৃষ্টির সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে মনীষীর দৃষ্টি। এই দৃষ্টির ফলে এক দিকে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য এবং অপর দিকে কালিদাসের ব্যক্তিত্ব তাঁর চিত্তে ধীরে ধীরে অঙ্কিত হতে থাকল। 'সভ্যতার প্রতি', 'তপোবন', 'প্রাচীন ভারত', এই তিনটি সনেটে অতীত ভারতের প্রতি তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুল আগ্রহ সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন ভারতের যে দিকটি তাঁকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছে তা এই।—

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব-সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,...
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি।

—'চৈতালি', সভ্যতার প্রতি (১৩০২ চৈত্র ১৯)

এই যে তপোবনের প্রতি আগ্রহ, তার একটি পূর্ণচিত্র দেখা দিয়েছে কবির কল্পনামুগ্ধ দৃষ্টিতে। এই চিত্র ফুটে উঠেছে অন্য দুটি কবিতায়।—

মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন—
পূরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
...স্রোতস্বিনী তীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে।...

প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্বকেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।

—'চৈতালি', তপোবন (১৩০২ চৈত্র ১৯)

তপোবনের এই চিত্র তিনি পেয়েছিলেন প্রধানতঃ কালিদাসের শকুন্তলা ও রঘুবংশ কাব্যে। শকুন্তলার সুস্পষ্ট ছাপ আছে এই তিনটি লাইনে—

ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।

চিত্রের বাকি অংশ পাওয়া যায় রঘুবংশে। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতের একটি সামগ্রিক রূপের চিত্রও তিনি পেয়েছিলেন মুখ্যতঃ রঘুবংশ কাব্যেই।—

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট্,
অযোধ্যা, পঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধতললাট।...
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্ব্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

—'চৈতালি', প্রাচীন ভারত (১৩০৩ শ্রাবণ ১)

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মহিমামণ্ডিত এই যে প্রাচীন ভারত, তার আদর্শায়িত ভাবরূপ পরবর্তী কালে দেখা দিয়েছে নৈবেদ্য কাব্যে (১৯০১), আর তার মোহনীয় সৌন্দর্যময় কাব্যরূপ দেখা দিয়েছে 'কল্পনা' (বর্ষামঙ্গল, স্বপ্ন, মদন-ভস্মের পূর্বে, মদনভস্মের পরে, প্রকাশ ইত্যাদি কবিতায়) এবং 'ক্ষণিকা' (সেকাল) কাব্যে (১৯০০)। আর তার কর্মময় বাস্তবরূপ দেখা দেয় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় (১৯০১)। এস্থলে তার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। চৈতালি কাব্যের সময়ে শুধু প্রাচীন ভারতের রূপ ও আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্নমুগ্ধ ও কর্মোন্মুখ করে নি, কালিদাসের ব্যক্তিত্বও তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল। কালিদাসকে তিনি

দেখেছেন দুই রূপে—এক তাঁর সৌন্দর্যভোগাসক্ত কবিরূপ, আর তাঁর সমস্ত তুচ্ছতার উর্ধ্বে অবস্থিত অনাসক্ত ব্যক্তিরূপ। 'চৈতালি' কাব্যে কালিদাসের কবিসত্তাই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে বেশি, তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিচয় আছে একটিমাত্র সনেটে। 'কালিদাসের প্রতি' কবিতায় তিনি বলেছেন—

> আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ—
> কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
> কোথা সেই উজ্জয়িনী।…আজ মনে হয়
> ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
> অলকার অধিবাসী।

'মানসলোক' কবিতাটিতেও এই ভাবটির অনুবৃত্তি চলেছে। কালিদাসকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন—

> আজিও মানসধামে করিছ বসতি ;
> চিরদিন রবে সেথা, ওহে কবিপতি।…
> নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা,
> কোথা হতে দেখা দিল স্বপ্ন ক্ষণপ্রভা।
> সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি,
> রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি।

এই যে কবিস্বরূপের চিত্রখানি, তারই দৃষ্টান্ত বহন করছে অপর তিনটি কবিতা। কবিতা-তিনটি কালিদাসের তিনখানি কাব্য অবলম্বনে রচিত। 'ঋতুসংহার' কবিতায় (১৩০২ চৈত্র ২১) সৌন্দর্যভোগাসক্ত কবির চিত্র ফুটে উঠেছে।—

> হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
> নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
> যৌবনের যৌবরাজ্যে সিংহাসন 'পরে।…
> নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী,
> তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী।

এই মিলনচিত্রের পরেই বিরহের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'মেঘদূত' কবিতাটিতে (১৩০২ চৈত্র ২১)।—

> মিলনের মরীচিকা,
> যৌবনের বিশ্বগ্রাসী কত অহমিকা

মুহূর্তে মিলায়ে গেল···বিশ্বসভামাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।

ঋতুসংহার এবং মেঘদূতের ঐতিহাসিক পৌর্বাপর্যও এই দুটি কবিতায় অভ্রান্ত-রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। অতঃপর 'কুমারসম্ভব গান' (১৩০৩ শ্রাবণ ১৫)।—

যখন শুনালে কবি, দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভব গান···কভু স্মিত হাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল, কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে,—যবে অবশেষে
ব্যাকুল সরমখানি নয়ননিমেষে
নামিল নীরবে,—কবি, চাহি দেবীমুখপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

এই অপূর্ব সুন্দর কল্পনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ এককালেই এই কাব্যখানির সৌন্দর্য বিশ্লেষণ ও এটির অসম্পূর্ণতার কারণ নির্দেশ করলেন এবং কালিদাসের রুচিবোধ ও ব্যক্তিত্বেরও আভাস দিলেন।

কালিদাসের ব্যক্তিত্বসন্ধানের আগ্রহ আর-একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'কাব্য' নামক সনেটটিতে (১৩০৩ শ্রাবণ ১১)। পূর্বে বলা হয়েছে কালিদাস মানস-লোকের চিরকবি, চিরানন্দময় অলকার অধিবাসী, যেখানে নাই দুঃখ, 'নাই দৈন্য'। তার পরেই মনে হল ব্যক্তি কালিদাসের কথা। তাই তাঁকে সম্বোধন করে আধুনিক কবির এই উক্তি—

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মত,
হে অমর কবি ? ছিল নাকি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন ?···
তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্যপানে ; তার কোন ঠাঁই
দুঃখদৈন্য আঘাতের কোনো চিহ্ন নাই।

জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

এখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের পরিবেশ ও তৎকালীন জীবনসংঘাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, কিন্তু তাঁকে তিনি এ সকলের ঊর্ধ্বে অবস্থিত সৌন্দর্য ও আনন্দের কবিরূপেই দেখছেন।

৭

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে কাব্য ও কল্পনার উপজীব্য না করে প্রবন্ধ ও আলোচনার বিষয়রূপেই উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমেই পাই গৌণভাবে 'কাদম্বরীচিত্র' এবং 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধ-দুটিতে (১৯০০)। দুটিরই উদ্দেশ্য কাব্যসৌন্দর্য-বিশ্লেষণ। 'কাদম্বরীচিত্রে' তিনি স্পষ্ট করেই বললেন—"আনন্দদানকে উদ্দেশ্য করিয়া কাব্যরচনা সংস্কৃতসাহিত্যে কালিদাসে প্রথম দেখা গেল"। অতঃপর তিনি একে একে ঋতুসংহার, মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ এই সবগুলি কাব্য যে 'চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত' সে কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন। কেবল কুমারসম্ভব প্রসঙ্গে কালিদাসের যুগপরিবেশের কথা উত্থাপন করলেন।—

> কালিদাসের কুমারসম্ভবে গল্প নাই; যেটুকু আছে···তাহাও অসমাপ্ত। দেবতারা দৈত্যহস্ত হইতে কোনো উপায়ে পরিত্রাণ পাইলেন কি না-পাইলেন সে সম্বন্ধে কবির কিছুমাত্র ঔৎসুক্য দেখিতে পাই না; তাঁহাকে তাড়া দিবার লোকও নাই। অথচ বিক্রমাদিত্যের সময়ে শকহূণরূপী শত্রুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল এবং স্বয়ং বিক্রমাদিত্য তাহার একজন নায়ক ছিলেন। অতএব দেবদৈত্যের যুদ্ধ এবং স্বর্গের পুনরুদ্ধার-প্রসঙ্গ তখনকার শ্রোতাদের নিকট বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইবে এমন আশা করা যায়। কিন্তু কই? রাজসভার শ্রোতারা দেবতাদের বিপৎপাতে উদাসীন।···রাজশ্রোতারা যদি গল্পলোলুপ হইতেন তবে কালিদাসের লেখনী হইতে তখনকার কালের কতকগুলি চিত্র পাওয়া যাইত।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র (১৩০৬ মাঘ)

কালিদাস তাঁর যুগপরিবেশ সম্বন্ধে একান্তই উদাসীন ছিলেন, তাই তাঁর হাত থেকে তখনকার কালের কোনো চিত্র পাওয়া গেল না—এটাই রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপের বিষয়। কালিদাসের কাছ থেকে সেকালের পরিবেশ সম্বন্ধে গভীরতর কোনো চিন্তার প্রত্যাশা তখনও তাঁর মনে জাগে নি। ফলে কালিদাসের ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও কোনো অভিমত তিনি প্রকাশ করেন নি।

'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'নববর্ষা' (১৩০৮ শ্রাবণ) রচনাটিতেও কালিদাসের পরিবেশের উল্লেখ আছে।—

> মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়—বিক্রমাদিত্যের যে উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট স্বপ্নের মতো তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।

এখানেও রসবিচারেরই অবতারণা। তার বেশি আর অগ্রসর হন নি।

এর কয়েক মাস পরে দেখি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে ব্যাপকতর পট-ভূমিকায় চিত্রিত করে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করছেন এবং কালিদাসের কাব্যের গভীরতর বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার প্রমাণ আছে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে (১৩০৮ পৌষ)। ওই প্রবন্ধে তিনি কালিদাসকে দেশ-কালনিরপেক্ষ চিরন্তন কবি বলে অঙ্কিত করেন নি। রামায়ণ-মহাভারতের কবিদের ন্যায় কালিদাসও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তৎকালীন মহত্তম জীবনাদর্শের ধারক ও বাহক; নিছক সৌন্দর্যরসপিপাসু কবিমাত্র নয়, উচ্চতর জীবনতত্ত্ব ও ধর্মবোধের প্রেরণা তাঁর কাব্যকে নিয়ন্ত্রিত ও শান্ত মহিমায় মণ্ডিত করেছে—এই অভিমতই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'কুমার-সম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে।—

> মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের ও ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্য-বিলাসেই শেষ হইয়া যায় না, তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।··· তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে।···

> ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।...ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

অর্থাৎ কালিদাসের জীবনাদর্শ তদানীন্তন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রেরই অনুবর্তী। উভয়েরই লক্ষ ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও সমাজকল্যাণ।

দেখা গেল, এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে সৌন্দর্যসর্বস্ব কবি বলে মনে করেন নি, তাঁর কাব্যপ্রেরণাকেও কল্যাণমুখী বলেই অনুভব করেছেন। এখানেই কালিদাসের ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের চোখে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পরবর্তী 'শকুন্তলা' প্রবন্ধেও (১৩০৯ আশ্বিন) এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হয়েছে বিশদতর বিশ্লেষণের মধ্যে।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপন করে কালিদাসকে শুধু রসের দৃষ্টিতে নয়, সত্যের দৃষ্টিতেও দেখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধটিতে (১৩০৯ শ্রাবণ)।—

> কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য পড়িলে দেখিতে পাই, শিব যখন ভারতবর্ষের মহেশ্বর তখন কালিকা অন্যান্য মাতৃকাগণের পশ্চাতে মহাদেবের অনুচরীবৃত্তি করিয়াছিলেন। ক্রমে কখন তিনি করাল মূর্তি ধারণ করিয়া শিবকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইলেন তাহার ক্রমপরম্পরা নির্দেশ করার স্থান ইহা নহে, ক্ষমতাও আমার নাই। কুমারসম্ভব কাব্যে বিবাহকালে শিব যখন হিমাদ্রিভবনে চলিয়াছিলেন তখন তাঁহার পশ্চাতে মাতৃকাগণ এবং
>
> তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
> কালী কপালাভরণা চকাশে।
>
> তাঁহাদেরও পশ্চাতে কপালভূষণা কালী প্রকাশ পাইতেছিলেন। এই কালীর সহিত মহাদেবের কোন ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় নাই।

মেঘদূতে গোপবেশী বিষ্ণুর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু মেঘের ভ্রমণ-কালে কোন মন্দির উপলক্ষ্য করিয়া বা উপমাচ্ছলে কালিকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্পষ্টই দেখা যায়, তৎকালে ভদ্রসমাজের দেবতা ছিলেন মহেশ্বর।

—'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৩০৯ শ্রাবণ)

এ প্রসঙ্গে 'কালিদাস' নামটার ঐতিহাসিক তাৎপর্যও বিবেচনার যোগ্য। যা হক, কালিদাসের কাব্য অবলম্বনে তৎকালীন ইতিহাস জানবার আগ্রহ এখানে সুস্পষ্ট। এই আগ্রহ পরে কালিদাসের ব্যক্তিত্ব নিরূপণের চেষ্টায় পরিণত হয়েছিল। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বা প্রবন্ধে কালিদাসের উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ দেখা যায় না। অবশ্য 'সৌন্দর্যবোধ' (১৯০৬), 'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৯০৭) প্রভৃতি নানা প্রবন্ধেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি কালিদাসের কথা উত্থাপন করেছেন। কিন্তু সে-সব প্রসঙ্গের উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব নেই, অন্ততঃ বর্তমান আলোচনার পক্ষে।

৮

সুতরাং বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের কালিদাসচর্চার প্রথম পর্যায় এখানেই শেষ হল। মোটামুটি হিসাবে এই পর্যায়ের আরম্ভ ১৮৮৭ সালের কাছাকাছি সময়ে এবং শেষ ১৯০২ সালে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই কালিদাস-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং জীবনস্মৃতিতে তার উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর কালিদাসচর্চার পর্যায় নির্ণয়ে সে সময়ের কথা গণনায় আনা হল না। এই প্রথম পর্যায়েরও দুই ভাগ। এক ভাগ চৈতালিকাব্য-রচনার (১৮৯৬) পূর্ববর্তী, আর একভাগ তার পরবর্তী। রবীন্দ্রনাথ যে এক সময়ে কালিদাসের সব কাব্য এক সঙ্গে আগাগোড়া পড়েছিলেন, তা সম্ভবতঃ এই দ্বিতীয় পর্বের কথা। পূর্বে দেখেছি কালিদাসের কাব্য পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে আনন্দ পেয়েছিলেন, তাঁর নিজের ভাষায় 'সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ'। সে আনন্দ ধরা দিয়েছে তাঁর রচিত কাব্যে—'চৈতালি'তে 'কল্পনা'য় 'ক্ষণিকা'য়। এই কাব্যগুলিতেই দেখতে পাই

রবীন্দ্রনাথ কবি কালিদাসকে তাঁর কাব্যকে ও তাঁর কালের ভারতবর্ষকে নূতন করে সৃষ্টি করেছেন বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে। যে-সব বিশেষ রচনায় তাঁর এই নূতন সৃষ্টির আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে সেগুলির কথা যথাস্থানেই বলা হয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে অনায়াসেই বলা যায়, অর্ধেক বাস্তব সে যে অর্ধেক কল্পনা। বস্তুতঃ কালিদাসের কাব্য পড়ে আমরা তাঁকে, তাঁর কাব্যকে ও তাঁর ভারতবর্ষকে যে রূপে পাই, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় অতিরঞ্জিত হয়ে তাই আমাদের কাছে প্রকাশ পায় নূতন আলোকে, নূতন রূপে ও রঙে। এইখানেই তাঁর সৃষ্টি-আনন্দের সার্থকতা। 'আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা', এই কবিবাক্যটি কালিদাস ও তাঁর দেশকাল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বস্তুতঃ কালিদাসের ব্যক্তিত্ব ও কাব্য অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ যে মানসজগৎ সৃষ্টি করেছেন, আধুনিক কালে আমরা সেই কল্পলোকেরই অধিবাসী।

> প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
> সুখের দুখের কাহিনী ;
> পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই
> অতীতের যত রাগিণী।
> পুরাতন সেই গীতি,
> সে যেন আমার স্মৃতি,
> কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
> গোপনে রয়েছে নীতি।
>
> —উৎসর্গ, ১৩

এই অনুভূতি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের জগৎকে নূতন করে সৃষ্টি করে তাকে এক অপূর্ব কল্পলোকে রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু একা রবীন্দ্রনাথই সেই কল্পলোকের অধিবাসী নন, আমরা সকলেই তার অধিবাসী। কেননা, কবি নিজেই বলেছেন—

> সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান ;···
> বলেছি যে কথা করেছি সে কজা,
> আমার সে নয় সবার সে আজ।

তাই আমরা আজ রবীন্দ্রসৃষ্ট কালিদাসলোকের উত্তরাধিকারী এবং 'এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে'।

৯

এই তো গেল সৃষ্টি-আনন্দের কথা, তার পরে আসে আবিষ্কারের আনন্দ। সে প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বে কালিদাস ও তাঁর কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও কল্পনা কতখানি প্রেরণা পেয়েছিল সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা অসংগত হবে না। কালিদাসের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন তা শুধু কাব্যকল্পনার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, স্পষ্ট করেছিল তাঁর জীবন ও কর্মাদর্শকেও।

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা কালিদাসের দ্বারা কিভাবে উদ্রিক্ত হয়েছিল তার কিছু পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এই প্রেরণা যে পরবর্তী কালেও বিরত হয় নি তার প্রমাণ হিসাবে বিভিন্ন সময়ের রচনা থেকে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে।

উৎসর্গ কাব্যের আটচল্লিশ-সংখ্যক কবিতাটির (১৩০৯)

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ।

কিংবা পূরবী কাব্যের 'তপোভঙ্গ' কবিতাটির (১৩৩০)

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি তব তপোবনে।

অথবা মহুয়া কাব্যের 'উজ্জীবন' কবিতাটির (১৩৩৬)

ভস্ম-অপমান-শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহো জলদর্চি-তনু।

ইত্যাদি কল্পনার পিছনে রয়েছে কুমারসম্ভব কাব্যের পরোক্ষ প্রেরণা। 'শেষ সপ্তক' কাব্যের (১৩৪২) আটত্রিশ-সংখ্যক কবিতায় যক্ষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

আজ তুমি হয়েছ কবি,
ধ্যানোদ্‌ভবা প্রিয়া
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ-করা ॥

'সানাই' কাব্যের 'যক্ষ' কবিতায় (১৯৩৮) আছে—

যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে
পবনের ধৈর্যহীন রথে···
সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দ-চঞ্চলতা,
তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহ-বারতা
চিরদূর স্বর্গপুরে,
ছায়াচ্ছন্ন বাদলের বক্ষোদীর্ণ নিঃশ্বাসের সুরে ॥

কালিদাসের কাব্য-উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাধারা যে কত বিচিত্র পথে প্রবাহিত হয়েছে, তার নিদর্শনস্বরূপ এই কয়টি দৃষ্টান্তই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

শুধু কল্পনা নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকেও কালিদাস কতখানি প্রেরণা জুগিয়েছেন তার নিদর্শনস্বরূপ প্রথমেই উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমাদর্শের কথা। কালিদাস-নির্দিষ্ট যে প্রেমাদর্শ, তা প্রতিষ্ঠিত ধর্মানুগ যথার্থ মনুষ্যত্বের উপরে ; প্রেমেই প্রেমের সার্থকতা নয়, তার চরম পরিণতি কল্যাণে—এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যেও এই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে বহু বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে। 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের (১৮৯২) প্রেমাদর্শে যে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে তা প্রচ্ছন্ন নয়। 'বিদায়-অভিশাপে'ও (১৮৯৩) এই আদর্শই দেখা দিয়েছে নূতন রূপে। বস্তুতঃ 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯) থেকে 'তপতী' পর্যন্ত (১৯২৯) সর্বত্রই এই ধর্মনিষ্ঠ প্রেমই প্রকাশ পেয়েছে নব নব অবস্থায় ও নব নব রূপে।

এই প্রেমাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত শিবের আদর্শ। কালিদাস ছিলেন শিবের উপাসক, রবীন্দ্রনাথও তাই। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে শিব যে বিস্ময়কর বিচিত্র মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে তা কালিদাসের কল্পনারও

অতীত। রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় নাটকে ও প্রবন্ধে ক্ষণে ক্ষণেই শিবের বিচিত্র বিভূতি প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে উদ্‌ভাসিত করে তুলেছে।—

> হে, রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকার গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়।··· নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। এই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ কোটি যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।
>
> —'বিচিত্র প্রবন্ধ', পাগল (১৯০৪)

শিবের এই যে অপূর্ব অভিব্যক্তি ও অপূর্ব বন্দনা, তা কালিদাসের যুগে ভাবনার অতীত ছিল। মহুয়া কাব্যের

> কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি
> ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।
>
> —সাগরিকা (১৯২৭)

এরূপ কল্পনা কালিদাসের পক্ষে অভাবনীয় ছিল না। তাঁর পক্ষে অভাবনীয় ছিল, এরূপ শিবকল্পনা রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রচুর। এখানে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে।—

> ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
> ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা বাছা!
> আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা!
>
> —'বলাকা', ১ (১৯১৪)

> কালীরে রহে বক্ষে ধরে শুভ্র মহাকাল,
> বাঁধে না তাঁরে কালো কলুষজাল।
>
> —'পরিশেষ', মোহানা (১৯২৭)

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
—'তপতী' (১৯২৯)

রবীন্দ্রনাথের শিবকল্পনা বোধ করি চরম পরিণতি লাভ করেছে তাঁর নটরাজ নাট্যকাব্যখানিতে। এই কাব্যের মর্মকথা বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট্ নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।
—'নটরাজ' (১৯২৭), ভূমিকা

এই কাব্যের উদ্‌বোধন-কবিতায় নটরাজকে 'তুমি মোর গুরু' বলে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—

নটরাজ, আমি তব
কবিশিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব

তার পরেই আছে—

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র-ভানু।...
মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।...
জীবনমরণ-নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিতবিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

এস্থলে এ কথা উল্লেখ করা উচিত যে, এই শেষ গানটির মূলভাবের সঙ্গে প্রথম বয়সের রচনা প্রভাতসংগীত কাব্যের (১৮৮৩) 'মহাস্বপ্ন' এবং 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়' কবিতা-দুটির মূলভাবের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। আর, পূর্বোদ্‌ধৃত 'কালীরে রহে বক্ষে...কালো কলুষজাল' এই লাইনটি স্মরণ করিয়ে দেয় কবির কিশোর বয়সের লেখা 'হরহৃদে কালিকা' কবিতাটির কথা।

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার বিস্তৃততর পরিচয় আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। তবে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ই শিবাদর্শের অনুরাগী, উভয়ই তৎকালপ্রচলিত শিবাদর্শকে অনেক ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে সর্বতোভাবেই কালিদাসের অনুবর্তী নন।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণীয় যে, মধ্যযুগে বাংলাদেশের সংস্কৃতি যখন পতনের চরমসীমায় উপনীত তখন শিবাদর্শও বিকৃত হয়ে জনচিত্তকে কলুষিত করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মহৎ শিবাদর্শ লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত ও তৎস্থলে অতি নীচু স্তরের জনসংস্কৃতির জয় ঘোষিত হয়েছে—এজন্য রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষেই আন্তরিক আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আজ তাঁরই কাব্যপ্রেরণার ফলে বাংলার সংস্কৃতিতে শিবাদর্শ শুধু যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়, কালিদাসকল্পিত আদর্শের চেয়েও ঊর্ধ্বতর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

কালিদাসের কাব্যপাঠের অন্যতম অনিবার্য ফল পাঠকচিত্তে সামগ্রিক ভারতবোধ ও ইতিহাসচেতনার জাগরণ। কুমারসম্ভবে পৃথিবীর মানদণ্ড-স্বরূপ পূর্বাপর-তোয়নিধি-বগাঢ় দেবতাত্মা হিমালয়ের বর্ণনা, মেঘদূতে রামগিরি থেকে হিমালয় পর্যন্ত ভারতখণ্ডের বর্ণনা, রঘুবংশে লঙ্কা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত ভারতভূমির নদী-গিরি-অরণ্যের বর্ণনা (ত্রয়োদশ সর্গ) এবং রঘুর দিগ্‌বিজয় (চতুর্থ সর্গ) ও ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভার (ষষ্ঠ সর্গ) বর্ণনা-প্রসঙ্গে সমগ্র ভারতের জনপদ-পরিচয়—এইসব বিভিন্ন উপলক্ষে কালিদাস তৎকালীন ভারতের যে সামগ্রিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তা শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, যে-কোনো মনোযোগী পাঠকের চিত্তকেই ভারতসচেতন করে তোলে। রবীন্দ্রসাহিত্যে যে প্রাচীনভারতবোধ ও ইতিহাসদৃষ্টির অজস্র নিদর্শন পরিকীর্ণ হয়ে আছে, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেরণা-উৎস হচ্ছে কালিদাসের কাব্য :—

> হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
> অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারবার
> শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরেছিল বিচিত্র মূরতি।
> ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,
> দুর্গম দুঃসহ মৌন।
>
> —'উৎসর্গ', ২৮

ইত্যাদি রচনাটির কল্পনাপ্রবাহ উৎসারিত হয়েছে কুমারসম্ভব কাব্যের তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে। রবীন্দ্রনাথের ভারতচেতনা ও কালিদাসের কাব্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের অধিকতর বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। এক একটি দৃষ্টান্তই আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত।

প্রাচীনভারতচেতনা ও ইতিহাসবোধের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনাও অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। একটি আর-একটির অপরিহার্য পরিণাম। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সংস্কৃতিচেতনারও অন্যতম মুখ্য উৎস কালিদাসের কাব্য। এককালে রবীন্দ্রনাথ যে তপোবন ও ব্রাহ্মণ্যমহিমার আদর্শের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার কারণও তাই। কেননা, কালিদাসের সাহিত্যের যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তা মূলতঃ তপোবনের আদর্শ ও ব্রাহ্মণ্যমহিমা নিয়েই গঠিত। তাই দেখতে পাই, চৈতালির সময় থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যে তপোবন-প্রশস্তি নানা উপলক্ষেই উদ্‌ঘোষিত হয়েছে। চৈতালির 'তপোবন' কবিতাটির (১৮৯৬) কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তারও বহু পূর্বে বালক রবীন্দ্রনাথ যখন গৃহশিক্ষকদের কাছে কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তখনই তাঁর কিশোরচিত্তে তপোবনের একটি স্বপ্নময় চিত্র অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'অভিলাষ' কবিতাটিতেই (১৮৭৪)।—

> নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
> পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ-আসন॥
> —অভিলাষ, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১২৮১ অগ্রহায়ণ)

'কল্পনা'র 'ভারতলক্ষ্মী' গানের 'প্রথম সামরব তব তপোবনে' লাইনটি সকলেরই সুবিদিত। উৎসর্গ কাব্যের প্রাচীনভারত-প্রশস্তির কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

> শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
> অতীতের তপোবনেতে,—
> অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
> ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
> —'উৎসর্গ', ১৬

সর্বশেষে কবির নববর্ষের গানটি স্মরণ করি।—

যে-জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে-জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব॥

—গীতবিতান (১ম সং), পৃ ২৪৬

এই তপোবনের আদর্শের মূলে রয়েছে ব্রাহ্মণের তপস্যা।—

ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা॥

—'চৈতালি', প্রাচীন ভারত (১৮৯৬)

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তপোবনকে ব্রাহ্মণ্যমহিমার তথা ভারত-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাভূমিরূপেই উপলব্ধি করেছিলেন। আর, কালিদাস যে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিকেই ভারতসংস্কৃতি বলে মেনে নিয়েছিলেন, তা বিদেশী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিও এড়ায় নি।—

> Kalidasa appears to us as the embodiment in his poems, as in his dramas, of the Brahmanical ideal of the age of the Guptas...We must rather be grateful that we have preserved in such perfection the poetic reflex of the Brahmanical ideal.

—Keith, *History of Sanskrit Literature*, pp. 98,100

কীথ সাহেব তাঁর সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস গ্রন্থেও কালিদাসের unfeigned devotion to the Brahmanical creed of his time-এর কথা উল্লেখ করেছেন (পৃ ১৬০)।

সুতরাং কালিদাসপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথও যে এককালে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতি আন্তরিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু

কালিদাস-অনুরক্তিই তার একমাত্র হেতু এ কথা মনে করা হয়তো সংগত হবে না। তদানীন্তন যুগধর্মের প্রেরণাও এর মূলে সক্রিয় ছিল।

কালিদাস লিখেছেন, 'তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ'। অনুরূপভাবেই তপোবন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শে প্রণোদিত হয়ে রবীন্দ্রনাথও তাকে কর্মসাধনার রূপ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তারই পরিণতি ঘটে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় (১৯০১)। সে বিবরণ পাওয়া যায় 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তকে আর তাঁর জীবনচরিতে।

শুধু আশ্রমজীবনে নয়, আমাদের সমাজজীবনেও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ব্রতী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রচারের প্রধান অবলম্বন হয়েছিল বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) পত্রিকা। তার নিদর্শন রয়েছে 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের 'ব্রাহ্মণ' ও অন্যান্য নানা প্রবন্ধে। কিন্তু এ বিষয়ের অধিকতর অনুসরণ আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তবে এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতি এই আসক্তি রবীন্দ্রনাথের মন থেকে কালক্রমে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তপোবন সম্বন্ধে বোধ করি সে কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না।

১০

এবার কালিদাসের ব্যক্তিত্ব-আবিষ্কারের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বভাবতঃই ঘটে বয়স ও মননক্ষমতার বৃদ্ধির সঙ্গে। সাহিত্যবিচারের প্রমাণে ঐতিহাসিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ঋতুসংহার কাব্য ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক কালিদাসের অল্প বয়সের রচনা, আর শকুন্তলা নাটক ও রঘুবংশ কাব্য তাঁর পরিণত বয়সের লেখা। সুতরাং এই সাহিত্যিক ক্রমপরিণতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ ঘটেছিল এ কথা মনে করা অসংগত নয়। এই ব্যক্তিত্ববিকাশের একটি দিকের (বোধ করি সব চেয়ে গুরুত্বময় দিকের) প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।—

> এ কথা মনে রাখতে হবে, যাঁরা যথার্থ গুণী তাঁরা একটি সহজ কবচ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। ফরমাশ তাঁদের গায়ে এসে পড়ে, কিন্তু মর্মে এসে বিদ্ধ হয় না। এইজন্যেই তাঁরা মারা যান না, ভাবী

কালের জন্য টিঁকে থাকেন। লোভে পড়ে ফরমাশ যারা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেয়, তারা তখনই বাঁচে, পরে মরে। আজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অনেকগুলিকেই কালের ভাঙাকুলো থেকে খুঁটে বের করবার জো নেই। তাঁরা রাজার ফরমাশ পুরোপুরি খেটেছিলেন, এইজন্যে তখন হাতে-হাতে তাঁদের নগদ-পাওনা নিশ্চয়ই আর-সকলের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু কালিদাস ফরমাশ খাটতে অপটু ছিলেন বলে দিঙ্‌নাগের স্থূলহস্তের মার তাঁকে বিস্তর খেতে হয়েছিল। তাঁকেও দায়ে পড়ে মাঝে মাঝে ফরমাশ খাটতে হয়েছে, তার প্রমাণ পাই মালবিকাগ্নিমিত্রে। যে দুই তিনটি কাব্যে কালিদাস রাজাকে মুখে বলেছিলেন, 'যে আদেশ, মহারাজ, যা বলছেন তাই করব' অথচ সম্পূর্ণ আর একটা কিছু করেছেন, সেইগুলির জোরেই সেদিনকার রাজসভার অবসানে তাঁর কীর্তিকলাপের অন্ত্যেষ্টিসৎকার হয়ে যায় নি—চিরদিনের রসিকসভায় তাঁর প্রবেশ অবারিত হয়েছে।

—পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ২৪. ৯. ১৯২৪

এই কথাগুলির ইঙ্গিত এই যে, রাজাদের রুচি ও রসবোধ সাধারণতঃ যে স্তরে থাকে, কালিদাসের রুচি ছিল তার অনেক উপরে এবং তাঁর শেষ জীবনের অন্ততঃ দুই-তিনখানি কাব্যকে তিনি রাজরুচির স্তরে নামিয়ে আনতে সম্মত হন নি বলেই সে কাব্যগুলি কালের দরবারে স্থায়ী আসনের অধিকারী হয়েছে। তার জন্য তাঁকে অবশ্য যথেষ্ট দামও দিতে হয়েছে—নিজের জীবনকালে তাঁকে সম্ভবতঃ জনপ্রিয়তা তথা রাজপ্রসাদ থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত থাকতে হয়েছিল। জনপ্রিয়তা তথা রাজার প্রসন্নতা অর্জনের লোভ সংবরণ করেও এই যে নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা, বলা বাহুল্য এ অতি দুঃসাধ্য কাজ। এই দুঃসাধ্য কাজে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন বলেই তিনি স্বকালে সম্ভবতঃ উপেক্ষিত, এমন কি লাঞ্ছিত, হয়েও উত্তরকালে অমরতা লাভ করেছেন। এতেই বোঝা যায়, তিনি কতখানি দুর্জয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে চৈতালি কাব্যের পূর্বোল্লিখিত 'কাব্য'নামক কবিতাটি পুনঃস্মরণযোগ্য। কিন্তু কালিদাসও যে রাজসন্তোষবিধানের দায় একেবারে এড়িয়ে চলতে পারেন নি তার প্রমাণ রয়েছে মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার প্রভৃতি অপরিণত

বয়সের রচনাগুলিতে। এগুলিতে যে রুচি ও জীবনাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় তা অল্পাধিক পরিমাণে রাজানুকূল্য তথা জনপ্রসন্নতা অর্জনের উপযোগী সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে যে দুই-তিনখানি কাব্য কালিদাসের নামকে ক্ষণকালীনতার কবল থেকে রক্ষা করেছে সেই কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও শকুন্তলার মধ্যে রাজতুষ্টিলাভের প্রয়াসমাত্র নেই, বরং আছে এমনই উচ্চাঙ্গের আদর্শনিষ্ঠা যা তদানীন্তন রাজচরিত্রের একান্তই প্রতিকূল ছিল। কাব্যের সুহৃৎসম্মিত বেশে দেখা দিয়েছিলেন বলেই কালিদাস রাজরোষের বিপদ্ এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। কেননা ও-সব কাব্যে চিত্রিত জীবনাদর্শের মধ্যে তৎকালীন ভোগাসক্ত রাজচরিত্রের তিরস্কারবাণীই ধ্বনিত হয়েছিল অনতিপ্রচ্ছন্নরূপে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। এখন সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

এই বিষয়টি সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হয়েছে 'তপোবন' প্রবন্ধটিতে (১৯০৯)। তাতে আছে—

> ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি; তখন চীন, শক, হূণ, পারসিক, গ্রীক, রোমক, সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে।...সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলে গেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।
>
> কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবনচিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান্ করতে পেরেছে?
>
> —'শিক্ষা', তপোবন (১৩১৬ পৌষ)

এই তপোবননিষ্ঠা কালিদাসের পরিণত চিত্তপ্রবণতারই পরিচায়ক। তাই এই আদর্শের মাপে তাঁর কাব্যের পৌর্বাপর্যনির্ণয়ও সম্ভব। এদিকে লক্ষ রেখেই রবীন্দ্রনাথ 'তপোবন' প্রবন্ধে বলেছেন—

> ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচা বয়সের লেখা, তাতে কোনো সন্দেহ

নেই। এর মধ্যে তরুণতরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নিচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা-কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছয় নি।

এই মন্তব্য মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী এবং মেঘদূত সম্পর্কেও অল্পাধিক পরিমাণে প্রযোজ্য। এগুলি তপোবন-আদর্শের ভূমিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। পক্ষান্তরে শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ, এই তিনটিরই ভিত্তিভূমি তপোবন। কালিদাসের চিত্তে তপোবনের প্রতি এই যে আকর্ষণ তার মূলগত হেতু কি, রবীন্দ্রনাথ তা-ই দেখিয়েছেন উক্ত প্রবন্ধটিতে।—

সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটি একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপদৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে?

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা। প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে, আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে-একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল, রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন।[১] এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ বারম্বার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।[২]

তখন বাহিরের দিক্ থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজন, কাব্য-সংগীত-শিল্পকলার আলোচনায়, ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার এই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুতঃ তাঁর

১। অনুরূপ সমস্যাই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' তথা 'তপতী' নাটকের কেন্দ্রগত সমস্যা।

২। কালিদাসের যুগের এই ঐতিহাসিক পরিবেশে 'কাদম্বরীচিত্র' রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভাবের উদ্রেক করেছিল তার সঙ্গে 'তপোবন' রচনার সময়কার মনোভাব তুলনীয়। তাতে রবীন্দ্রচিত্তের ক্রমপরিণতির আভাস লক্ষিত হবে।

> কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়েছিল। এইরকম একদিকে তখানকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।
>
> কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্যবিকলচিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্য কারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তিকামনা করছিলেন।
>
> কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষে যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল, ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূরকালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন। —'শিক্ষা', তপোবন

কালিদাসের অন্তরস্থিত কবিসত্তার এই চিত্র অনিবার্যভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় বিলাসপুরী অলকার মণিহর্ম্যে বন্দিনী বিরহিণী যক্ষপত্নীর কথা।—

> অসীম সম্পদে নিমগনা
> কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা।

বিক্রমাদিত্যের আমলে উজ্জয়িনীর বিলাসপুরীতে কালিদাসও 'অনন্তসৌন্দর্য-মাঝে একাকী জাগিয়া' নিশিদিন যাপন করছিলেন বিগতদিনের তপোবন-চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে।

কিন্তু কালিদাস কি শুধু সুদূর কালের দিকে তাকিয়ে বেদনা বহন করেই ক্ষান্ত ছিলেন? তিনি কি তৎকালীন জাতীয় জীবনসমস্যার কোনো সমাধানের উপায় নির্দেশ করেন নি? করেছিলেন। সে কথা রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে সুস্পষ্ট হয়েই প্রকাশ পেয়েছে। কালিদাসের অন্তর ও বাহির এবং অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, সে প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য এই।—

> কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন, ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব; সেই শৌর্যেই মানুষ সকলপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ, ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল। প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

এ কথার তাৎপর্য এই যে—সত্য ও শিবের মিলনেই কল্যাণের উদ্ভব, ভোগের মধ্যেও ত্যাগকে জয়ী করা চাই, কর্মের মধ্যেও অনাসক্ত থাকা চাই, ব্যক্তিগত ভাবেই হক আর সমাজগত ভাবেই হক রিপুর হাত থেকে রক্ষা পাবার এই একমাত্র উপায়। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। কিন্তু এই সামঞ্জস্যস্থাপনের পথ সহজ নয়। দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। কবি কালিদাসও এই দুর্গম পথেরই নির্দেশ দিয়েছেন কুমারসম্ভব কাব্যে।

অতঃপর শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্ধৃত করি :—

> সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে ভোগলালসানির্দুর রাজ-প্রাসাদকে ধিক্‌কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করছে, তারও মূল সুরটি ওই।

বহুকাল পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলাকে একত্র তুলনা না করিয়া থাকা যায় না। দুইটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা (১৯০১)

কিন্তু একটু পার্থক্যও আছে। কুমারসম্ভবে দেবসমাজকে আসন্ন পরাভব থেকে রক্ষা করার যে সমস্যা তার সমাধানের পথ নির্দেশ করা হয়েছে অনাসক্ত দেবচরিত্রকে কেন্দ্র করে। পক্ষান্তরে বিক্রমাদিত্যদের আমলে ভারতবর্ষের মানবসমাজ যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল তার থেকে উত্তীর্ণ হবার উপায় নির্দেশ করা হয়েছে অত্যাসক্ত রাজচরিত্রকে কেন্দ্র করে। পৌরাণিক ভারতের অধীশ্বর দুষ্যন্তের চরিত্রকে উপলক্ষমাত্র করে শকুন্তলা নাটকে তৎকালীন ঐতিহাসিক রাজচরিত্রের প্রতি যে ধিক্‌কারবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, দীর্ঘকালের ব্যবধানে আজও তা অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। এই ধিক্‌কারবাণীর যদি কোনো তাৎপর্য থাকে তা হলে স্বীকার করতে হবে তৎকালে বাইরের শত্রুর আক্রমণই ভারতবর্ষের বড় সমস্যা বলে কালিদাসের মনে হয় নি, সিংহাসনারূঢ় সমাজপতি রাজচরিত্রের অধোগতিই বড় সমস্যা

বলে গণ্য হয়েছিল। কালিদাসের মতে প্রাচীনকালে অর্থাৎ তপোবনের যুগে দেশের বড় সমস্যা ছিল অতিবৈরাগ্য, আর তাঁর নিজের কালের সব চেয়ে ভয়ের কারণ হয়েছিল মানুষের অতিসম্ভোগ।

অবশ্য কুমারসম্ভব কাব্যে এই ব্যঞ্জনাও আছে যে দেবচরিত্রের অনাসক্তি-সমস্যার নিরাকরণের যথার্থ উপায় পঞ্চশরের সহায়তাগ্রহণ নয়; পঞ্চশরের কাছে আত্মসমর্পণে কল্যাণের উদ্‌ভব হতে পারে না। এই দিক্ থেকে কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার তাৎপর্য মূলতঃ এক। কুমারসম্ভবে দেবচরিত্রের অনাসক্তিই সমস্যা, তাই সেখানে মন্মথের অবতারণা অত্যাবশ্যক। শকুন্তলার রাজচরিত্রের অন্তরেই মন্মথের ঐকান্তিক প্রভুত্ব। তাই এই নাটকে মদনভস্মের বাহ্য অবতারণা করতে হয় নি। কিন্তু নিগূঢ়ভাবে এই নাটকেও ওই ঘটনা আছে—ঋষিরোষাগ্নি ও অনুতাপানলে ভিতরের দিক্ থেকে পঞ্চশরকে ভস্মসাৎ করা হয়েছে।

তা ছাড়া, উভয় ক্ষেত্রেই নিষ্কৃতিলাভের উপায়ও এক—ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্যবিধান। কিন্তু কুমারসম্ভব ও শকুন্তলায় কবি এই যে মুক্তির পথ নির্দেশ করলেন, তার ফল হল কি? এই সুহৃৎসম্মিত কবিবাণী কি তদানীন্তন রাজচরিত্রকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে পেরেছিল? মনে হয় পারে নি। তারই পরিচয় আভাসিত হয়েছে রঘুবংশ কাব্যে।—

রঘুবংশের তাৎপর্যবিচার-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণীয়—

> কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট্ হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্মঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল, কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

যে অমিতবীর্য দেবসেনাপতির পরাক্রমে স্বর্গরাজ্যে অসুরদের আক্রমণ

প্রতিহত হয়েছিল তাঁর আবির্ভাবও সম্ভব হয়েছিল কন্দর্পের পরাভব ও তপস্যার জয়ঘোষণার মধ্যে।

রঘুবংশের প্রসঙ্গ আবার অনুসরণ করা যাক।—

> সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ ক'রে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকট বর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসম্বৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।
>
> ...তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য...স্নিগ্ধ তেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল।...কবি... কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশজ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।
>
> কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী, আর হয়েছে কী! সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য, আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারি দিকের চোখ ধাঁদিয়ে দিচ্ছে।
>
> —'শিক্ষা', তপোবন (১৯০৯)

কবি কালিদাসের এই যে অন্তরবেদনা, তাঁর তদানীন্তন রাজপ্রভুদের চারিত্রিক অধোগতিই যে তার হেতু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সমগ্র রঘুবংশের ঊনবিংশ সর্গে কাব্যের রসাচ্ছাদনে কবির যে অভিপ্রায়টি নিহিত রয়েছে তার মূলে আছে

> অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
> ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

— এই শাস্ত্রবাক্য। মেঘদূতের ভর্তৃশাপ, শকুন্তলার ঋষিভৎর্সনা ও কুমার-

সম্ভবের দেবরোষ রঘুবংশ কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে রাজপ্রভুদের প্রতি কবি-চিত্তের প্রচ্ছন্ন অভিসম্পাতরূপে।

যে তিনখানি কাব্যে কালিদাস রাজপ্রভুদের মুখে বলেছিলেন, 'যে আদেশ, মহারাজ, যা বলেছেন তাই করব', অথচ করেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কিছু, সে তিনখানি যে শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ তাতে সন্দেহ নেই। এই তিনখানি কাব্যে রাজাভিপ্রায়পূরণের অর্থাৎ রাজপ্রসন্নতা অর্জনের কিছুমাত্র প্রয়াস নেই, বরং আছে রাজচরিত্রের প্রতি কবির অনতিপ্রচ্ছন্ন ভৎর্সনাবাণী। যে কল্যাণনিষ্ঠার প্রেরণায় কবিপ্রাণ রাজপ্রসাদের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছিল সেই কল্যাণনিষ্ঠাই কবির প্রতি আকর্ষণ করেছে চিরন্তনতার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত।

রাজচ্ছন্দানুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কালিদাসের এই যে স্বচ্ছন্দাচার, তার সব চেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে রঘুবংশ কাব্য। এই কাব্যের অবতারণাপ্রসঙ্গে কবি প্রথমেই বলেছেন, যাঁরা আজন্ম পবিত্রতায় ত্যাগে বীর্যে ধর্মনিষ্ঠায় অসামান্যতা অর্জন করেছিলেন সেই রঘুদের গুণাকৃষ্ট হয়েই তিনি তাঁদের বংশ-গাথা কীর্তন করতে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু কার্যতঃ তিনি করলেন কি? তিনি রঘুবংশের জ্ঞানী কর্মী ধর্মনিষ্ঠ গুণবান্ নৃপতিদের গুণকীর্তন করেই ক্ষান্ত হন নি, ক্ষান্ত হয়েছেন ওই বংশেরই নির্গুণ অধর্মপরায়ণ ভোগাসক্ত দুর্বল উত্তরাধিকারীদের পতনকাহিনী বিবৃত করে। এই প্রতিশ্রুতিলঙ্ঘনের হেতু সুস্পষ্ট। সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এ স্থলে কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের একটু তুলনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কুমারসম্ভব কাব্যের কাহিনী-অংশ অর্ধপথেই সমাপ্ত হয়েছে, তাকে প্রত্যাশিত পরিণতি পর্যন্ত টেনে নেওয়া হয় নি। দেবদম্পতির মিলনলীলা বর্ণনায় কবি-চিত্তের স্বাভাবিক কুণ্ঠাই এর হেতু, এই ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ চৈতালির 'কুমারসম্ভব গান' কবিতায়। তাতে কালিদাসের অন্তরের শালীনতাবোধই সূচিত হয়। পক্ষান্তরে রঘুবংশের কীর্তিকাহিনীকে কবি তাঁর প্রতিশ্রুত সীমানার বাইরেও অনেকখানি টেনে নিয়েছেন। এরও হেতু গর্হিতের প্রতি কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক জুগুপ্সা। যা-কিছু গর্হিত, যা-কিছু অশালীন, একান্ত বিনষ্টির মধ্যেই যে তার চরম পরিণতি, এই সত্য স্থাপনের আগ্রহেই কালিদাস রঘুবংশের কাহিনীকে পতনের শেষ সীমা পর্যন্ত টেনে নিতে প্রণোদিত হয়েছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যের শেষ সর্গে এসে দেখি, সূর্যপ্রভব বংশের আসমুদ্রক্ষিতীশানাং উজ্জ্বল অভ্যুদয়মহিমা অবশেষে অগ্নিবর্ণ বিনাশের মধ্যেই অস্তমিত হল।

এর থেকে কি মনে হয় না যে, হিতৈষী কবি কালিদাস রাজপ্রভুদের আত্মহননের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হন নি বলেই তিনি রঘুবংশের এই চরম অশুভ পরিণামের কথা তাঁদের শোনাতে বাধ্য হয়েছিলেন? বস্তুতঃ কালিদাসের কালের ইতিহাসেও দেখি সমুদ্রগুপ্তপ্রমুখ সম্রাট্‌গণের গৌরবসূর্য হূণ-আক্রমণের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অগৌরবের অন্ধকারের মধ্যে তিরোহিত হল। এটাও কি তৎকালীন ঐকান্তিক ভোগবিলাস তথা রাজ-চরিত্রের অধোগতিরই অনিবার্য পরিণাম নয়?

যা হক, রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও রঘুবংশ অবলম্বনে তৎকালীন ভারতবর্ষের তথা কবি কালিদাসের অন্তঃস্বরূপের যে অপূর্ব চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন, কোনো ঐতিহাসিকের লেখনী থেকে সে রকম চিত্রের প্রত্যাশাও করা যায় না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষেই অন্য কবির কাব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিরূপ তথা তদানীন্তন সমাজের সত্যরূপ আবিষ্কার করা সম্ভব।

১১

দেখা গেল, কালিদাস যে ঐতিহাসিক কালপরিবেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে পরিবেশে তাঁর চিত্ত তৃপ্ত ছিল না। তাঁর চিত্ত পিপাসিত ছিল, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের মতে, সুদূর বিগতকালের তপোবন-পরিবেশের জন্য। তপোবনের কাল থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর বিরহী চিত্ত স্বকালের গণ্ডীর মধ্যে যেন নির্বাসনবেদনায় বিধুর হয়ে উঠেছিল। এই নির্বাসিতচিত্তের আর্তবাণীই যেন ধ্বনিত হয়েছে রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যে।

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মত
কি কথা আমায় শুনাও সতত,
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী।
সে সুদূর, আমি প্রবাসী॥

এ যেন তপোবনকালের উদ্দেশে স্বকালপ্রবাসী কালিদাসের অন্তরের বেদনা-সংগীত। 'তপোবন' প্রবন্ধ রচনার বহুকাল পরেও রবীন্দ্রনাথ কালিদাস-চিত্তের এই নির্বাসনদুঃখের প্রসঙ্গে বলেন—

> It was not the physical home-sickness from which the poet suffered, it was something more fundamental, the home-sickness of the soul. We feel from almost all his works the oppressive atmosphere of the kings' palaces of those days, dense with things of luxury, and also with the callousness of self-indulgence, albeit an atmosphere of refined culture based on an extravagant civilization.
>
> The poet in the royal court lived in banishment—banishment from the immediate presence of the eternal. He knew it was not merely his own banishment, but that of the whole age to which he was born, the age that had gathered its wealth and missed its well-being, built its store-house of things and lost its background of the great universe. What was the form in which his desire for perfection appeared in his drama and poems? It was the form of the *tapovana*...How the tortured mind of Kalidasa in the prosperous city of Ujjayini, and the glorious period of Vikramaditya, closely pressed by all obstructing things and all-devouring self, let his thoughts hover round the vision of a *tapovana* for his inspiration of life!
>
> —*The Religion of Man* (1931), ch. XII, pp. 166-98

কালিদাস-যুগের ইহসর্বস্ব ঐশ্বর্যময় সভ্যতাসংস্কৃতির এবং কালিদাসচিত্তের বেদনামাখা আকূতির এই যে চিত্র উপরের পংক্তি-কয়টির মধ্যে অঙ্কিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তারই প্রতিভাস দেখতে পেয়েছিলেন স্বযুগের সংস্কৃতিপরিবেশ ও স্বচিত্তের গভীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। তাই তিনি উক্ত *The Religion of Man* গ্রন্থে (পৃ ১৬৮) কালিদাসপ্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই নিজের অন্তরের অনুরূপ নির্বাসনদুঃখের কথা জানালেন।—

It was not a deliberate copy but a natural coincidence that a poet of modern India also had the similar vision when he felt within him the misery of a spiritual banishment.

আরও পরবর্তী কালে জীবনের শেষ দশকে উপনীত হয়েও রবীন্দ্রনাথ এ কথারই পুনরাবৃত্তি করেন তাঁর একটি বাংলা প্রবন্ধে। কেননা তখনও তাঁর হৃদয় থেকে ওই নির্বাসনবেদনার নিরসন ঘটে নি। তিনি বলেন—

তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ী ভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান্ আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে। পরবর্তী কালে কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসনদুঃখের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রঘুবংশে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল শান্ত সুন্দর যুগের থেকে ভোগৈশ্বর্যজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।

কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁছেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিক কালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল—কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।

—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, 'আশ্রমের শিক্ষা' (১৯৩৬)

অতীত ভারতের সঙ্গে বর্তমান ভারতের আত্মিক মিলন ঘটাবার জন্যে কবিচিত্তের এই যে প্রেরণা, তাই প্রত্যক্ষ রূপ পেয়েছে শান্তিনিকেতনের আশ্রমবিদ্যালয়ে। সর্বশেষ বক্তব্য এই যে—

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে,

অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।

কিংবা

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব॥

এই প্রার্থনাগীতি উৎসারিত হয়েছিল কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই কণ্ঠ থেকে, এই আকাঙ্ক্ষা পরিচালিত করেছিল উভয়েরই অন্তর্জীবনকে। তপোময় জীবনাদর্শ থেকে দূরবর্তী হবার ফলে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সারাজীবন ভোগ করে গেছেন নির্বাসনদুঃখ। দৃশ্যতঃ তাঁদের কল্পিত তপোবনকাল থেকে স্বকালে নির্বাসন, বস্তুতঃ নিত্যকাল ও সর্বদেশের উদার প্রশস্ততা থেকে স্ব-কাল ও স্ব-দেশের খণ্ডতার মধ্যে নির্বাসন॥

যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথ

প্রথম পর্যায়

আজ রবীন্দ্রনাথ মহাকালের আশ্রয়ে, তাই আজ মুক্ত দৃষ্টিতে তাঁর স্বরূপ দর্শনের সময় উপস্থিত হয়েছে। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন; বরং তাঁকে মহাকবি বলাই সংগত। পারিভাষিক অর্থ প্রযোজ্য না হলেও সাধারণ অর্থে তিনি যে মহাকবি ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু কাব্য-রচয়িতা কবি বলে অভিহিত করলে তাঁর যথার্থ পরিচয় মিলবে না। ভারতীয় ভাষায় কবি শব্দের অর্থান্তর হচ্ছে মনীষী—'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। তিনি হচ্ছেন এই মনীষী কবিবর্গের উজ্জ্বলতম রত্ন।

তরবোঽপি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

'গাছপালাও বেঁচে থাকে, পশুপাখিও বেঁচে থাকে; কিন্তু সত্যি বাঁচা সে-ই বাঁচে যার মন মননের দ্বারা জীবন্ত।' বস্তুতঃ মানুষের যথার্থ জীবন হচ্ছে মনস্বিতারই জীবন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন,—মানুষ শুধু প্রাণবান্ জীব নয়, মানুষ মনোবান্, এ-কথাটি মনে রাখা চাই। 'শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি'কে তিনি 'সরমের ডালি' বলে যে তীব্র ধিক্কার দিয়েছেন, তা সহজে বিস্মৃত হবার নয়। মনস্বিতাকেই তিনি জীবনের মাপকাঠি, জীবনের মূলনীতি বলে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন এবং এই মনস্বিতার সাহায্যেই তাঁর জীবনের পরিমাপ করতে হবে। এই হিসাবে বিচার করলে মনে হয় তাঁর ওই আশি বছরের জীবন একটি জীবন মাত্র নয়, সে একটা যুগ। একটা সমগ্র যুগ ধরে একটা জাতির জীবনে মননের ক্ষেত্রে যে ঐশ্বর্য সঞ্চিত হতে পারে, তিনি এক জীবনেই তা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। "আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি"। কাল-পরিমাণের হিসাবে তিনি ওই একটি ক্ষুদ্র জীবনেই পাঁচশো বছর প্রাণধারণের চেয়েও বেশি বেঁচে গিয়েছেন, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। জীবন-পরিমাণের হিসাবে বলতে হয় তিনি একাই একটি সমগ্র জাতির জীবন বেঁচে গিয়েছেন। "আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ"—তাঁর একথা মিথ্যা হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই শরৎচন্দ্র আমাকে একদিন বলেছিলেন, —বর্তমান কালের কোনো সাহিত্যিককেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা চলে না ; ভারতবর্ষের সুবিপুল ইতিহাসের মধ্যে মহাকবি জন্মেছেন মাত্র চার জন ; প্রথম তিনজন হচ্ছেন ব্যাস, বাল্মীকি ও কালিদাস এবং চতুর্থ হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, এটা বাঙালির এবং বাংলাদেশের কম গৌরবের কথা নয়। বর্তমান সময়ে অনেকেই বলেছেন, ভারতবর্ষের ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস এবং ইউরোপের হোমার-ভার্জিল-দান্তে-সেক্স্পীয়র-গ্যয়টে ও ভিক্তর হিউগো, এই বিশ্ব-মহাকবিগণের সমপর্যায়েই রবীন্দ্রনাথের স্থান। রবীন্দ্রনাথ রহস্যচ্ছলে কামনা করেছিলেন—

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন নব রত্নের মালে।

কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তাঁর 'জীবনদেবতা' তখন প্রসন্ন হাস্যে বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়—'জগৎকবি-সভা'র নবরত্নের মালাতেই তাঁকে দশম রত্ন রূপে সৃষ্টি করেছেন। আজ তাঁর তিরোধানের পর বিধাতার এ রহস্য আমাদের কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর, একথাও মনে হয়, এই দশম-রত্ন-রূপ ভাস্বরমণিটির উজ্জ্বল দীপ্তিতে অন্য নয়টি রত্নের আভাও যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে। অত্যুক্তি নয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী বিশ্ব-মহাকবিগণের মধ্যে কেউ তাঁর মতো সর্বতোমুখী প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল ছিলেন না, এ কথা বললে সত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করা হবে না। অবশ্য একথা সর্বজন-বিদিত যে, ভিক্তর হিউগো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ; কিন্তু সে প্রতিভাও রবিদীপ্তির সমান ভাস্বরতা অর্জন করতে পারেনি। পৃথিবীর আর কোনো মনীষী-কবি কাব্য, নাট্য, নৃত্য, সংগীত, চিত্র, কথা ও প্রবন্ধের সপ্তাশ্ববাহিত বিজয়রথ চালনা করে প্রদীপ্ত সূর্যের মতো বিশ্বজীবনগগনের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সগৌরবে অভিযান করেছেন বলে তো জানি নে। বস্তুতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে একই প্রতিভার ক্ষেত্রে অভিনয়, নৃত্য, সংগীত ও চিত্ররচনার নৈপুণ্য, কবির অন্তর্দৃষ্টি, দার্শনিক চিন্তার গভীরতা, রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মের ঐকান্তিকতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি এমন অনন্য-সাধারণ অনুরাগ, সমাজ ও পল্লীর এমন একাগ্র সেবা, আর কখনও কি এমন ভাবে সমন্বিত হয়েছে ? মানবত্বের এমন সর্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ বিকাশ মানুষের

ইতিহাসে এই প্রথম। প্রতিভার প্রত্যেক বিভাগেই রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চ স্থান অবশ্যই অধিকার করতে পারেন নি, কিন্তু সর্ববিভাগের এই অপূর্ব সমন্বয়-সাধনে তিনি যে জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

২

কোনো কোনো বিশেষ বিভাগেও যে তিনি সর্বপুরোবর্তী, তাও অবশ্য স্বীকার্য। এমন পরাধীনতার গাঢ় তমিস্রার মধ্যে এমন মধ্যাহ্নগরিমার আবির্ভাব সত্যই অপ্রত্যাশিত ও অচিন্তনীয়। প্রত্যেক প্রতিভাশালী মহাকবিরই আবির্ভাবের অনুকূল অবস্থা ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন সমগ্র জাতির দৈন্য, দুঃখ ও পরাধীনতার গ্লানির প্রচণ্ড প্রতিকূলতাকে সবলে ছিন্ন করে আমাদের দুর্ভাগ্যের দুর্দিনকে হেলায় প্রতিহত করে ভারতের আকাশে প্রদীপ্ত জ্যোতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।—

জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি' চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল,
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি' বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে,
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,
প্রণমি তোমারে।

যে বিপুল প্রতিকূলতাকে সবলে দীর্ণ করে রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করেছেন, সে প্রতিকূলতা শুধু রাষ্ট্রে নয়, আমাদের সমাজে ধর্মে সংস্কৃতিতে ভাষায় সাহিত্যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। যে-জাতির মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সে-জাতি ছিল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরাধীন, চিন্তার ক্ষেত্রে পঙ্গু এবং সমাজের ক্ষেত্রে দুর্বল ও আত্মঘাতী; যে-ভাষাকে নিয়ে তিনি তাঁর বিপুল সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন সে ভাষা ছিল অর্ধবিকশিত ও ব্যঞ্জনাশক্তিহীন এবং যে জাতীয় চিত্তক্ষেত্রে তিনি নির্ভয়ে বিচরণ করে গিয়েছেন সে চিত্ত ছিল দুর্বল ও ভীরু। তথাপি স্বীয় তিরোধানের সময়ে তিনি আমাদের জাতিকে রাষ্ট্র, সমাজ ও চিন্তার ক্ষেত্রে সবল, সাহসী ও আত্মশক্তিবিশ্বাসী করে গিয়েছেন, অর্ধস্ফুট বাংলাভাষার কাকলিধ্বনিকে ব্যঞ্জনাশক্তিতে

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির সমকক্ষ করে তুলেছেন, বাংলা কাব্যের বিকল ও পঙ্গু ছন্দকে তিনি ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করে গিয়েছেন এবং সংগীত রচনার প্রাচুর্যে ও সুরের বৈচিত্র্যে তিনি জগতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

বাঙালি আজি গানের রাজা বাঙালি নহে খর্ব,
জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব।

একথা তিনি সাধারণভাবে কাব্যরচনার ঐশ্বর্যকে লক্ষ্য করেই বলেছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ গান অর্থাৎ সংগীত রচনায় যে রবীন্দ্রনাথ সত্যই পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন, একথা আজ সর্ববাদিস্বীকৃত। সেক্স্পীয়র বা গ্যয়টে নিজ নিজ ভাষা, বাক্-রীতি ও ছন্দ প্রভৃতিকে সুগঠিত অবস্থাতেই পেয়েছিলেন। যদি তাঁদের ভাষা, ছন্দ ও বাক্-রীতিকে নূতন করে গড়ে নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে হত, তাহলে তাঁদের প্রতিভা কতখানি বিকাশ লাভ করত বলা শক্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তাই করতে হয়েছে। মধুসূদনের ভাষায় বলতে পারি—

ভাষাপথ খননি' স্ব-বলে
ভারতরসের স্রোত আনিয়াছ তুমি।

রবীন্দ্রনাথ বহু ক্ষেত্রেই পথিকৃৎ, অথচ সেই পথে তিনিই সর্বাগ্রগামী। এটা বস্তুতই আশ্চর্যের বিষয় যে, রবীন্দ্রপ্রতিভাকে সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রাথমিক ভূমিকা-স্বরূপ তার উপাদানগুলিকেও গড়ে নিতে হয়েছিল। তিনি যে শুধু অপূর্ব রসস্রষ্টা তা নয়, তিনি বাংলা ভাষারও স্রষ্টা। তাই দেখি তিনি ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব এবং ছন্দের বিশ্লেষণেও তাঁর অসাধারণ প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন। কালিদাস বা হিউগোকে এভাবে ব্যাকরণ, ছন্দ ও ভাষাতত্ত্বের পথ তৈরি করে করে রসসৃষ্টিতে অগ্রসর হতে হয়নি। শুধু তাই নয়, যে বাঙালি জাতির জন্যে তিনি তাঁর অজস্র রসের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন সে জাতির চিত্তক্ষেত্রকেও নিরন্তর কর্ষণ করে যথার্থ কাব্যরস গ্রহণের উপযোগী করে তুলতে হয়েছিল তাঁকে। তাই দেখি তিনি অক্লান্তভাবে কাব্যরস-বিশ্লেষণে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় ব্যাপৃত রয়েছেন। এভাবে কোন্ কবিকে স্বীয় জাতির চিত্তবৃত্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে তাঁর কাব্যফসল ফলাবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তুলতে হয়েছিল? শিক্ষা সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্মের

ক্ষেত্রেও তিনি আমাদের জাতীয় চিত্তকে উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারা গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। বস্তুতঃ তিনি যে শুধু আমাদের জন্য একটি বিপুল সাহিত্য মাত্রই সৃষ্টি করে গেছেন তা নয়; তিনি একাধারে জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় চিত্তেরও স্রষ্টা। সমস্ত দিক্ বিবেচনা করলে সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁর মতো বিশ্বতোমুখী মহাপ্রতিভার তুলনা পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু একটা বিষয়ে একটু অত্যুক্তির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। বাঙালির জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় চিত্ত, বাংলা ভাষার গঠনভঙ্গি ও ছন্দের বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথ একা গড়েন নি। রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের আমল থেকে বহু ক্ষেত্রে বহু অনন্যসাধারণ মনীষী বাঙালি-জাতিকে ও তার সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ তাঁরাই ছিলেন বাংলার আধুনিক নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের অগ্রদূত। কিন্তু ওই রেনেসাঁসের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। চম্বল-যমুনা, সরযূ-গণ্ডকী, গোমতী-কৌশিকী, ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা প্রভৃতির বহু জলধারার যোগে সমৃদ্ধ হয়ে যেমন গঙ্গার প্রবাহ পদ্মার বিশাল আয়তন ধারণ করে মহাসমুদ্রে সংগত হয়েছে, তেমনি রামমোহন-ঈশ্বরচন্দ্র, দেবেন্দ্র-কেশব, মধুসূদন-বঙ্কিম, হেম-নবীন, বিবেকানন্দ-কৃষ্ণানন্দ, সুরেন্দ্র-বিপিন, চিত্তরঞ্জন-আশুতোষ প্রভৃতির জীবন-ধারায় পুষ্ট হয়ে বাঙালির জীবনপ্রবাহ রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-মহামানবের সাগরতীরে এসে উপনীত হয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে যে দুঃখদৈন্যের ঘনান্ধকার পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তাকে নিরস্ত করার জন্য আমাদের জীবনাকাশে বহু চন্দ্রোদয় ঘটেছিল। অক্ষয়চন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র, প্যারীচাঁদ-বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র-শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বহু 'চন্দ্র' আমাদের জাতীয় চিত্তকে উজ্জ্বল ও মধুর করে তুলেছিল, কিন্তু তখনও রজনীর অবসান ঘটেনি। সে রজনীর অবসান ঘটেছে প্রখরতেজা 'রবি'র উদয়ে।

৩

আর একটি বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজগতের মহামনীষিগণের মধ্যে সর্বাগ্র-গণ্য। সেটি হচ্ছে তাঁর ঋতম্ভরতা বা সত্য ও কল্যাণ-নিষ্ঠতা। তিনি যে কেবল সুন্দরের উপাসক ছিলেন তা নয়; সত্য ও কল্যাণের একনিষ্ঠ সাধক হিসাবে তাঁর স্থান যে কোথায়, আজ এই বিশ্বব্যাপী অন্যায়-অবিচার, মিথ্যা

ও হিংসার দ্বন্দ্বকোলাহলের মধ্যে তা নির্ণয় করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। তিনি তাঁর জীবনদেবতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি' উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে, যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।

তাঁর এই প্রার্থনা সফল হয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিধাতার বিচারাসনে নিজস্থান অধিকার করে দেশে এবং বিদেশে পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে যখনই 'স্ফীতকায় অপমান', 'স্বার্থোদ্ধত অবিচার', বা 'গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে'র আভাস পেয়েছেন তখনই তার বিরুদ্ধে তিনি 'রুদ্রবীণা'কে ঝংকৃত করে তুলেছেন, তখনই তাঁর রসনায় সত্যবাক্য খরখড়্গসম ঝলসে উঠেছে। দেশ এবং বিদেশের যেখানে যা-কিছু অনৃত ও অকল্যাণের সন্ধান পেয়েছেন, শিবের তৃতীয় নেত্রাগ্নির ন্যায় এই ঋতম্ভর মনীষীর উদ্দীপ্ত তেজ তখনই তাকে দগ্ধ করেছে। পশ্চিমের 'পঙ্কশয্যাশায়ী' 'ভদ্রবেশী বর্বরতা' কিংবা তাঁর নিজ 'দুর্ভাগা দেশে'র অভিশপ্ত 'জাতির অহঙ্কার'-কে তিনি তাঁর 'ন্যায়ের দণ্ডে' সমানভাবে দণ্ডিত করেছেন। তিনি বলেছেন—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

'মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ অভয়মন্ত্রে'র পূজারী মহাকবি লোকভয়কে কিভাবে জয় করেছিলেন তা আমাদের অজ্ঞাত নেই। আর, একথাও সত্য যে, আমাদের এই 'দুর্ভাগ্য দেশে' 'আপনার মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার'কে 'ভয়ে লোভে অস্বীকার' না করা সত্ত্বেও 'রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে' তিনিই ছিলেন একমাত্র নির্ভীক মুক্ত পুরুষ। মৃত্যুভয় সম্বন্ধে "ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—মৃত্যুর নিপুণশিল্প বিকীর্ণ আঁধারে," তাঁর এই অপূর্ব বর্ণনা অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। আর, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্বার্থ ও

হিংসার যে উদ্দাম তাণ্ডব চলেছে তার পূর্বাভাস পেয়ে মৃত্যুর প্রায় প্রাক্‌কালেও তিনি তাঁর শুধু মনস্বিতা নয় তেজস্বিতারও অক্ষয় পরিচয় রেখে গিয়েছেন।—

দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি'
কৃপণের সতর্ক সম্বল ; সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি' রুদ্ধ ওষ্ঠ অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এদিকে দানব-পক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংস-ক্ষুধিত শকুনি
আকাশেরে করিল অশুচি।

মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্‌কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

বর্তমান পৃথিবীতে মনীষীর অভাব নেই, কিন্তু কোন্ মনীষী আমাদের এই রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত ও শৃঙ্খলিত যুগের কুৎসিত বীভৎসাকে এমন করে অনন্তকালের জন্যে ধিক্‌কার হেনে লজ্জিত ইতিহাসের জন্যে সঞ্চিত করে গেছেন? বর্তমান পৃথিবীতে

লজ্জা সরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি' প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়,

কিন্তু আর তো কোনো মনীষীর কণ্ঠ থেকে বজ্রবাণী নির্ঘোষিত হয়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হচ্ছে না। অথচ কিছুকাল পূর্বেও রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণ ও মুমূর্ষু কণ্ঠ থেকে সমগ্র বিশ্বকে লক্ষ করে যে রুদ্রবাণী উৎসারিত হয়েছে, তা চিরকাল ধরে বর্তমান 'সভ্যতা'র গ্লানিকে ধিক্কৃত করতে থাকবে। শুধু যে নির্বিশেষ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধেই তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে তা নয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষেও তাঁর রুদ্র তেজ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের উপলক্ষে তাঁর ক্ষুব্ধরোষের অগ্নিজ্বালা এখনও নির্বাপিত হয়নি; বিহার ভূমিকম্পের মূঢ় ব্যাখ্যা উপলক্ষে সত্যের সতর্ক প্রহরীরূপে তিনি স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীকেও তাঁর সত্য-নিষ্ঠার অঙ্কুশপ্রহার থেকে নিষ্কৃতি দেন নি; জাপানের জগদ্‌বিখ্যাত কবি য়োনে নোগুচিকে চীন-আক্রমণ-সমর্থন উপলক্ষে তিনি যখন উদ্যত ন্যায়দণ্ড নিয়ে নির্ভীকভাবে আক্রমণ করেছিলেন, তাঁর তখনকার সেই অপূর্ব যোদ্ধমূর্তি সমগ্র জগৎকে চমকিত করে তুলেছিল; আর সর্বশেষে মিস্ র‍্যাথ্‌বোন নাম্নী ইংরেজ-মহিলাকে ভারতবর্ষের প্রতি উদ্ধত অপমানসূচক ভাষা প্রয়োগের জন্যে তিনি যেভাবে তীব্র তিরস্কারের ভাষায় অমর করে রেখেছেন তা একদিকে যেমন হাস্যোদ্দীপক, অপরদিকে তেমনি তেজোদৃপ্ত বৃদ্ধ পুরুষ সিংহের সর্বশেষ রুদ্র-রূপের আলোতে চিরসমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর 'নর্মবাঁশি'খানি বাজিয়ে সৌন্দর্য ও শান্তির ললিতবাণী শুনিয়ে আমাদের মুগ্ধ করে রাখেন নি, প্রয়োজনমতো তাঁর 'রুদ্রবীণা'-খানিকেও কঠিনরূপে ঝংকৃত করে তিনি আমাদের তন্দ্রাতুর চিত্তকে সচকিত করে তুলেছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে 'দয়াহীন সভ্যতানাগিনী'র বিশ্ববিনাশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে যে তূর্যনিনাদে তিনি আমাদের আহ্বান জানিয়ে গেছেন, তার সার্থকতা হয়তো অচিরেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছ ঘরে ঘরে।

তাই বলছিলাম রবীন্দ্রনাথের মহামনীষা ঋতম্ভরতায়, অন্যায় অনৃত ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামপরায়ণতায় পৃথিবীতে অনন্যসাধারণ।

৪

ঋতম্ভরতার ন্যায় তাঁর মনীষার বিশ্বজনীনতা বা বিশ্বমুখীনতাও অভূতপূর্ব। 'জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি' 'দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে ক্ষয়ে'র বিরুদ্ধে তাঁর অসহিষ্ণুতা ছিল অসীম। অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের পূজারী তিনি, তাই তাঁর কাছে দেশকালের ব্যবধানও ঘুচে গিয়েছিল। তিনি স্বদেশকে ভালবাসতেন কারও চেয়ে কম নয়, কিন্তু সে দেশকে তিনি কখনও বিশ্বসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। তাইতো তাঁর স্বদেশ-পূজার মন্ত্রে রয়েছে—

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা—
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।

ভগবান্‌কেও তিনি বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র করে দেখেন নি। তাই অকুণ্ঠ কণ্ঠেই তিনি বলেছেন—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে নয় বিজনে
নয়কো আমার আপন মনে
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

তাইতো দেখি সমগ্র বিশ্বকেই তিনি একান্ত করে নিয়েছেন।—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।

ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া ॥
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে ঘরের বাসনা মিটাতে।
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায় চিরজনমের ভিটাতে ॥

অখণ্ড জগৎকেই তিনি তাঁর বাসগৃহ এবং বিশ্ববাসীকেই তিনি পরমাত্মীয় বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাই তো তিনি বেরিয়েছিলেন বিশ্ববিজয়ে এবং দ্বাদশ আদিত্যেরই মতো তিনি দ্বাদশবার ভূ-পরিক্রমণ করে জগৎকে স্বীয় জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত করেছিলেন, আর নিজের হৃদয়ের শক্তিতে যুঝে যেখানে যে দেশ আছে তাকেই তিনি বিজয় করে আপনার করে নিয়েছিলেন। পৃথিবীর আর কোনো মনীষীকেই তো এভাবে নিরন্তর ভূপ্রদক্ষিণ করে দিগ্‌বিজয়ী বীরের মতো বিশ্ববিজয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখি নে। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বপ্রীতি ও বিশ্ববিজয়ের কাহিনী এতোই স্বয়ংপ্রকাশ যে এবিষয়ে আলোচনা করাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, তাঁর বিশ্বপ্রীতি মানে বিশ্বমানবপ্রীতি এবং মৈত্রী ও কল্যাণের দ্বারা বিশ্ব-মানবের হৃদয় জয় করাই ছিল তাঁর জীবনের চরম আদর্শ। এমন কি, ভগবান্‌কেও তিনি মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। 'নরদেবতা'ই হচ্ছে তাঁর উপাস্য, 'মানুষের নারায়ণ'কেই তিনি জানিয়ে গেছেন তাঁর জীবনের শেষ নমস্কার, মহামানব-দেবতার ধর্মই তাঁর চরম ধর্ম। তাই তো তিনি Religion of God-এর পরিবর্তে Religion of Man-এর বার্তাই ঘোষণা করে গিয়েছেন বিশ্বজগতের কাছে। মানুষ ছাড়া ঈশ্বর নেই কোথাও। সংসারবিরাগী ভক্ত ঈশ্বরসন্ধানের অভিপ্রায়ে পত্নীপুত্র ত্যাগ করে গৃহ থেকে যখন নির্গত হলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!"

অন্যত্র বলেছেন—

অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই খুঁজিস্ সঙ্গোপনে!
নয়ন মেলে দেখ্, দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নেই ঘরে।

তবে তিনি আছেন কোথায় ?—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারোমাস।

তবে তাঁকে পাবার উপায় কি ? উপায় জীবনের কর্ম—সাধনা

রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

কিন্তু কর্ম যে বন্ধন, কর্মে মুক্তি হবে কি করে ? তার উত্তর এই—

মুক্তি ? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি ? মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।

তাই তো তিনি অন্যত্র অকুণ্ঠিত ভাবেই ঘোষণা করেছেন—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।···

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

আরও বলেছেন—

দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

বস্তুতঃ কল্যাণময় প্রেমই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ধর্ম। "যে প্রেম সম্মুখ-পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে", সে প্রেমকে তিনি 'বিলাস' এবং মানুষের মুক্তিপথের অন্তরায় বলেই গণ্য করতেন। কিন্তু যে প্রেম ঋতম্ভর, যে প্রেম কল্যাণময় সেই প্রেমকেই তিনি ধর্মের আসনে স্থাপন করেছিলেন। আর, যেহেতু মানুষই ছিল তাঁর ওই বিশ্বব্যাপী প্রেমের পাত্র, তাই মানুষকেই তিনি দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং মানব তাঁর নিকট মহামানব বা নরদেবতারূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। মানুষের মহিমাকে পৃথিবীতে আর কে এমন সমুজ্জ্বল করে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন, তা তো জানি নে। এ-বিষয়েও আমাদের রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বলেই

গ্রহণ করব, যদিও আমাদেরই দেশের অন্যতম মনীষী স্বামী বিবেকানন্দকে এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ও অগ্রণী বলে স্বীকার করি।

৫

আরও একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনন্যসাধারণ বলে মনে করি। আর কোনো মনীষী-কবিকে আশ্রয় করে কোনো দেশ বা জাতির সমগ্র বাণী উচ্ছ্বসিত ও তার আন্তর রূপ প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে বলে জানিনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে বিরাট্ ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ এবং কালের বাণী ও রূপ যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত কালের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পের, এক কথায় অখণ্ড ভারতবর্ষের আত্মারই মূর্ত প্রতীক। শুধু যে ভারতবর্ষের বাহ্য প্রকৃতি, তার আকাশ-বাতাস, ফল-ফুল, মেঘ-রৌদ্র, প্রভাত-সন্ধ্যা, তার রূপ ও গন্ধ, তার বিচিত্র ঋতুর অজস্র বৈচিত্র্যই রবীন্দ্ররচনায় কম্পিত, ঝংকৃত, ঝলকিত হয়ে অনন্তকালকে স্পন্দিত করে তুলেছে তা নয়, ভারতবর্ষের চিত্তরূপটিও তাঁর গদ্য-পদ্য রচনায় ও সংগীতে চিরকালের জন্যে প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে। ঋগ্‌বেদের উদাত্ত সুক্তধ্বনি ও উদার সামসংগীতের প্রতিরণন যেন বহুশতাব্দী-কালের ব্যবধানকেও অতিক্রম করে রবীন্দ্রসংগীতের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে সমুপস্থিত হয়েছে; উপনিষদের নিগূঢ় ব্রহ্মবাণী যেন নূতন করে রবীন্দ্রনাথের ঋষিকণ্ঠকে আশ্রয় করে আমাদের কাছে পুনর্ঘোষিত হল; গৌতমবুদ্ধ ও রাজর্ষি অশোকের মৈত্রী করুণা ও প্রেমের বার্তা রবীন্দ্রসাহিত্যের যোগেই আমাদের কাছে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে; কালিদাসের যুগের কাব্যসাহিত্য যেন আধুনিককালে রবীন্দ্ররচনার মধ্যে পুনর্জন্মলাভ করেছে; শিলাদিত্যের যুগের নালন্দামন্দিরের বিশ্বশিক্ষামিলনের আদর্শ বিংশ শতাব্দীতেও রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বিশ্বভারতীকে অবলম্বন করে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে; এবং মধ্যযুগের কবীর-নানক-মীরা প্রমুখ ভারতীয় সাধকগণের ভক্তিসাধনার তত্ত্ব যেন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে রঙে, রূপে ও গন্ধে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের সমস্ত যুগের সমস্ত সাধনার তত্ত্ব, রস ও রূপ একাধারে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও সুসংহত হয়ে পুনর্বিকাশ লাভ করেছে। মুমূর্ষু ভারত তাঁর মধ্যেই যেন নূতন করে জীবন

লাভ করেছে এবং তিনি তাঁর বিপুল মনীষাময় প্রাণসত্তার দ্বারা নির্বাণোন্মুখ ভারতীয় সংস্কৃতিকে নূতন জীবনে উজ্জীবিত করে তুলেছেন। আর একথাও মনে হয় যে, ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাবময় আত্মা যেন তাঁর ওই সৌম্য সহাস্য প্রশান্ত দেবকল্প মূর্তির আশ্রয়ে রূপ পরিগ্রহ করে বিশ্বের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

৬

ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকার উপর স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রয়াস করলে তাঁকে একদিকে বুদ্ধ এবং অশোক, আর অপরদিকে শিবাজির সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভারতবর্ষের যথার্থ সাধনাকে বিশ্বজগতের কাছে জয়ী করে তুলেছেন প্রাচীনকালের বুদ্ধ এবং অশোক, আর আধুনিক-কালে রবীন্দ্রনাথ। তা ছাড়া আর তো কাউকে দেখিনে যিনি বিশ্বজগতের কলকোলাহলের ঊর্ধ্বে ভারতীয় সাধনার মৈত্রী ও প্রেমের বাণীকে সগৌরবে তুলে ধরতে পেরেছেন। দিগ্‌বিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের অস্ত্র-ঝনৎকারের যথাযোগ্য ভারতীয় প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন রাজর্ষি অশোক, দিগ্‌বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের দ্বারা, রাজ্যাধিকারের বদলে মর্মাধিকারের দ্বারা। তৎকালীন জগতের যে-যে স্থলে আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনী পশুবলের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছিল, প্রিয়দর্শী অশোকের শান্তিবাহিনী ঠিক সে-সব স্থলেই গৌতমবুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মচক্র চালিত করে নিনাদিত করে তুলেছিল বিশ্বমৈত্রীর জয়ঘোষণা। আর, আধুনিক কালে একাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একাই বুদ্ধের বাণী ও অশোকের প্রচার, এই উভয় দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেছেন। তফাত এই যে, বুদ্ধ বা অশোক স্বয়ং বিশ্বজগতে বহির্গত হন নি মৈত্রীর পতাকা বহন করে; রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু তাই করতে হয়েছে। তখনকার দিনের বলদৃপ্ত গ্রীকবাহিনীর বিজয়প্রতাপ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল, তাই অশোকের শান্তির বাণীও ওই ভূখণ্ডের সীমা অতিক্রম করেনি। কিন্তু আধুনিক কালের দুর্দান্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার দুঃসহ প্রতাপ সমগ্র পৃথিবীকেই গ্রাস করে বসেছে, তাই রবীন্দ্রনাথকেও ভারতের বাণী বহন করে পুনঃপুনঃ সমস্ত পৃথিবীকেই আবেষ্টন করতে হয়েছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, উদ্ধত ও দাম্ভিক পাশ্চাত্য জগতের নিষ্ঠুর পশুশক্তির বিরুদ্ধে

দাঁড়িয়ে তিনি যখন সত্য ন্যায় ও কল্যাণের বাণী নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন তখন কেউ তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস করেনি, সর্বত্রই তা মৌন সম্মতি সহকারে নতশিরে স্বীকৃত হয়েছে। কারণ—

যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।···
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বিশ্বের নৈতিক ন্যায়বিচারকের আসনে তিনি সগৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তাঁর করধৃত ন্যায়ের দণ্ড বহু রাষ্ট্রপতির অন্তরে গোপন ভীতির সঞ্চার করত। শুধু বিচারকের নয়, তিনি নৈতিক জগতের গুরুর আসনকেও অলংকৃত করেছিলেন; এ কথা প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষতঃ দেশে-বিদেশে অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্বভারতীতে যে তাঁর 'গুরুদেব' আখ্যা স্বীকৃত হয়েছে তা অযথার্থ নয়। আমাদের এই 'কবিগুরু' শুধু কবিদেরই গুরু নন; যুগপৎ তিনি কবি এবং গুরু বলেই তাঁর এই আখ্যা সার্থক হয়েছে। তাঁকে বিশ্বগুরু বললেও অত্যুক্তি হবে কিনা বিচার্য বিষয়।

৭

মধ্যযুগের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা শিবাজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনাটা বড়োই অসমীচীন বলে বোধ হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে দেখলে এই তুলনার সার্থকতা বোঝা যাবে। অধুনাপূর্ব কালে ভারতবর্ষ পুনঃপুনঃ বৈদেশিকগণের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রশক্তি পুনঃপুনঃ বৈরিহস্তে বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণ কখনও ভারতবর্ষের মর্মমূলে প্রবিষ্ট হয় নি; ভারতের আত্মা, তার সাধনা ও সংস্কৃতি কখনও একান্তভাবে বিপন্ন হয় নি। তাই বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াও স্বভাবতঃই রাষ্ট্রশক্তির ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল।

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

এ কথার ঐতিহাসিক সত্যতা পুনঃপুনঃ প্রমাণিত হয়েছে। তবে ধর্ম কথাটি এ স্থলে সংকীর্ণ অর্থের পরিবর্তে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা প্রয়োজন। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রধর্ম ও বীরধর্মের গ্লানি ঘটেছিল। তাই তৎকালীন ভারতের চিৎসত্তা রাষ্ট্রশক্তির রূপ ধরেই অভ্যুত্থিত হয়েছিল এবং ওই রাষ্ট্রশক্তি পরিপূর্ণরূপে মূর্তিপরিগ্রহ করেছিল মহাবীর শিবাজির মধ্যে। তাঁকে আশ্রয় করেই ভারতের আত্মা রাষ্ট্রশক্তি-বিকাশের মধ্যে নিজের সার্থকতার সন্ধান করেছিল। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্ত্যশক্তির আক্রমণ একেবারে ভারতের মর্মমূলেই প্রবিষ্ট হয়েছে এবং তা আমাদের রাষ্ট্রশক্তিকে পর্যুদস্ত করেই ক্ষান্ত হয় নি; আমাদের সমাজ ধর্ম শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতি প্রভৃতি সব কিছুকেই, এক কথায় ভারতের চিৎশক্তিকেই, বিপন্ন করে তুলেছে। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে তার প্রতিক্রিয়াও ঘটেছে অবিকল অনুরূপ। জাতীয় জীবনের প্রতি বিভাগেই ওই প্রতিক্রিয়া উদ্যত হয়ে উঠেছে গত দেড় শো বছর ব্যেপে, রামমোহন থেকে আশুতোষ পর্যন্ত মনীষিবৃন্দই তার প্রমাণ। কিন্তু এই জাতীয় অভ্যুত্থান পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। ভারতীয় চিৎসত্তার সর্বাঙ্গীণ পরাভব ঘটার আশঙ্কা হয়েছিল আধুনিক কালে, তাই তার সর্বাঙ্গীণ অভ্যুত্থান এবং বিকাশও ঘটেছে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে। তাই তাঁকে একজন ব্যক্তিমাত্র বলে গণ্য না করে চিরন্তন কালের ভারতীয় চিন্ময় আত্মার পূর্ণ অভিব্যক্তিরূপে দেখলেই তাঁকে যথার্থভাবে দেখা হয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে শুধু ভারতসাম্রাজ্য নয়, ভারতের চিত্তক্ষেত্রেও বৈদেশিক আক্রমণকারী তার প্রভুত্বের ধ্বজা প্রায় অবলীলাক্রমেই প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ মনীষীদের প্রবল পরাক্রমে শত্রুহস্ত থেকে ভারতের সেই বিনষ্টপ্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ঘটেছে। শত্রুকবলিত পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধারকারী মহাবীরের কীর্তিমহিমা থেকে এঁদের কীর্তিগৌরব কিছুমাত্র কম নয়। ইদানীন্তন কালে ভারতের ওই পুনরুদ্ধৃত চিৎসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ওই চিৎসাম্রাজ্যের অধিপতি ও পুনরুদ্ধারকর্তারূপে যে কীর্তিমহিমার অধিকারী হয়েছেন, তা বহু দিগ্‌বিজয়ী বীরেরও লোভের বস্তু।

৮

এক-ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।

এ-কথা মারাঠাবীর শিবাজি কখনও ভেবেছিলেন কিনা জানি নে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে এই আদর্শকেই জীবনের সাধনা করে তুলেছিলেন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং ভারতের 'জনগণমন-অধিনায়ক' রবীন্দ্রনাথ যে সে সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাও সন্দেহাতীত। 'জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক' কবিসম্রাট্ তাঁর ওই বিস্তীর্ণ চিৎসাম্রাজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন বিশ্বভারতীতে। বস্তুতঃ বিশ্বভারতী হচ্ছে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী। ভারতের ওই পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হলে দেখা যায়—

পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মরাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ
বিন্ধ্যহিমাচল-যমুনাগঙ্গা-উচ্ছলজলধিতরঙ্গ···
হিন্দুবৌদ্ধশিখ জৈনপারসিক মুসলমানখৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসনপাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।

বস্তুতঃ বিশ্বভারতীতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্তের নরনারী একই উদ্দেশ্যে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমবেত হয়েছে। গুজরাটি-বাঙালি, পাঞ্জাবি-দ্রাবিড়ি প্রভৃতি প্রতিপ্রান্তবাসী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান-প্রমুখ বহু ধর্মাবলম্বী এমনভাবে একত্র মিলিত হয়েছে, একই আদর্শে ও একই ভাবধারায় এমনই অনুপ্রাণিত হয়েছে যে, মনে হয় ওখানেই সমগ্র ভারতবর্ষ কেন্দ্রীভূত হয়ে সুসংহত হয়েছে। বস্তুতঃ বিশ্বভারতীই হচ্ছে সজীব ভারতবর্ষের মর্মকেন্দ্র। শুধু তাই নয়, অখণ্ড ভারত এবং সমগ্র বিশ্ব হাত মিলিয়েছে ওই বিশ্বভারতীতে। চীন-জাপান ইউরোপ-আমেরিকার মিলনভূমি রচিত হয়েছে বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণতলে। ওই পবিত্র প্রাঙ্গণতলে দাঁড়ালে মনে হয়, সত্যই 'ভারততীর্থে' অর্থাৎ মহামানবের মিলনতীর্থেই উপনীত হলাম। স্বতঃই হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়—

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ;

আর, অন্তরের মধ্যে জেগে ওঠে প্রাচীন নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের গৌরবময় ছবি। সেখানে একদিন চীন, তিব্বত প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বিদ্যার্থীরা সমবেত হত ভারতের বাণী, ভারতের বিদ্যা অধিগত করবার উদ্দেশ্যে। আজও সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে বিশ্বভারতীতে। দেখা যায় চীন জাপান প্রভৃতি দেশের বিদ্যার্থীরা সেই প্রাচীনকালেরই মতো বিদ্যালাভার্থে সমবেত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই আশ্রমতপোবনে। আর, মনে হয় আমাদের এই মুকুটহীন কবিসম্রাটের বিশ্বভারতীর সংস্কৃতিমহিমা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভা বা শিলাদিত্যের নালন্দাবিদ্যালয়ের তুলনায় কিছুমাত্র হীন নয়।

সম্রাট্‌-কবি শা-জাহানের চোখে এক অনন্ত সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখা দিয়েছিল; তাঁর স্বপ্ন ছিল, তিনি তাঁর অন্তরের বিরহবেদনাকে চিরন্তন করে রাখবেন। তাঁর সে স্বপ্ন রূপ ধরে প্রকাশ পেল তাজমহলের 'সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে'। রবীন্দ্রনাথের অন্তরেও এক স্বপ্ন দেখা দিয়েছিল—'এক-ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি' কবিসম্রাটের এ স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে বিশ্বভারতীতে। এই দুই কীর্তিই অতুলনীয়। কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য এই, তাজমহল সমাধিমন্দির মাত্র—

সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে স্থির
ধরার ধূলায় থাকি'
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী হচ্ছে জীবনমন্দির, আর সযত্ন পরিপোষণের দ্বারা সে জীবনকে সবল ও বর্ধিষ্ণু করে তুলছে। আশা করি, জীবনের নব নব প্রকাশের সঙ্গে বিশ্বভারতীরও নব নব বিকাশ ঘটবে এবং সত্যই একদিন তা বিশ্বমানবের মহামিলনতীর্থে পরিণত হবে, আর 'বিশ্বভারতী' নামের সার্থকতাও তখন যথার্থতঃ সর্বত্র স্বীকৃত হবে।

পৃথিবীতে অনেক মহাকবি ও মহামনীষী জন্মেছেন। কিন্তু বিশ্বভারতী-রচনার স্বপ্নের ন্যায় এমন মহৎ ও অপূর্ব স্বপ্ন আর কারও চিত্তে উদিত হয়নি, সে স্বপ্নকে রূপদান তো দূরের কথা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জগতের ইতিহাসেই তুলনারহিত।

৯

একজন পাশ্চাত্ত্য মনস্বী মন্তব্য করেছেন,—রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট্ প্রতিভার জন্ম দিয়েছে, শুধু এই জন্যেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়া উচিত। এই উক্তির গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। কেননা, এই উক্তির অন্তরে এই পরোক্ষ অনুভূতি নিহিত রয়েছে যে,—বৈদেশিকের হাতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও চিত্ত উভয়েরই পরাভব ঘটেছিল এবং চিদ্‌বিজয়ের দৃঢ় ভিত্তির উপরেই দিগ্‌বিজয়ের সৌধ স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাধনার দ্বারা ওই বিজিত চিৎরাজ্যের পুনরুদ্ধার ঘটেছে, সুতরাং রাষ্ট্রীয় পরাভবের অবসানও দূরবর্তী হতে পারে না। আমরা যদি ওই পুনরুদ্‌ধৃত চিৎরাজ্যকে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্ব-রাজ্য বলে স্বীকার করতে পারি, যদি নির্ভীক সৈনিকের মতো সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ওই স্বরাজ্যের রক্ষা ও বিস্তারে আত্মনিয়োগ করতে পারি, যদি এই চিৎসাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে আমরা ত্যাগ ও সাধনার রাজস্ব দান করতে প্রস্তুত থাকি, যদি সমবেত কণ্ঠে বলতে পারি—

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমর-মূরতি—
সমুন্নত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে, লুকাবে না তার দিব্য জ্যোতি
কভু কোনো কালে।
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি, হে রাজন,
তুমি মহারাজ,
তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ।

তাহলে আমাদের স্বরাজ্যের অধিকার চিত্তের ক্ষেত্র থেকে অনিবার্য রূপেই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে, তাহলে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সফল হবে। এ-কথা বিশ্বাস করব—

তোমার তপস্যাতেজ—করি' অন্তর্ধান
আজ অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন বাণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,
নূতন প্রভাত।

সেই আসন্ন 'নূতন পরাণ' ও 'নূতন প্রভাতের' আগমনীসংগীতও কবিকণ্ঠে নিঃসংশয়ে ধ্বনিত হয়েছে—

দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ,
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

তাই তো তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে আমাদের আহ্বান করেছেন—

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থনীরে,
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এই অভিষেক, এই মঙ্গলঘট ভরা কবে হবে? উত্তর দেবার দায়িত্ব ভারততীর্থের ঋষি আমাদেরই উপর অর্পণ করে গিয়েছেন। আমরা যেন সেই ঋষির আশাকে, তাঁর স্বপ্নকে ব্যর্থ হতে না দিই। তাঁরই বাণী আমাদের হৃদয়ে শক্তি জোগাক—

নিশিদিন ভরসা রাখিস,
ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস,
সে পণ তোমার রবেই রবে॥

যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় পর্যায়

মহাপুরুষেরাই এক একটা যুগের সৃষ্টি করেন, না এক একটা মহাযুগই তার উপযুক্ত মহাপুরুষকে সৃষ্টি করে—এই বহুশ্রুত সমস্যার নূতন সমাধানে অগ্রসর না হয়ে আমরা প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে, ওই সমস্যার দুই দিকেই কিছু সত্য আছে। গাছের উৎপত্তিও বীজে এবং তার পরিণতিও বীজে; মহাপুরুষেরা এক একটা বড়ো বড়ো যুগের সৃষ্টিও বটেন এবং তার স্রষ্টাও বটেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অতি বড়ো যুগ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই যুগ কিভাবে রবীন্দ্রনাথের মানসসত্তাকে গড়ে তুলেছে এবং তাঁর জীবন ও মননের মধ্যে স্বীয় অভিব্যক্তি লাভ করেছে, আমাদের জাতীয় আত্মোপলব্ধির পক্ষে এ বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

প্রথমেই বোঝা দরকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে বর্তমান যুগের সার্থকতা কোথায়, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি কোন্ পরিণতির দিকে আমাদের নিয়ে চলেছে। তার পর দেখতে হবে, ওই যুগাভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কতখানি অভিব্যক্ত হয়েছে এবং ওই লক্ষ্যাভিমুখে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কতখানি প্রেরণা দিয়েছেন। আমরা এস্থলে এই বৃহৎ প্রশ্নের উত্তর কোন্ দিক্ থেকে মিলতে পারে, সে বিষয়ে একটু ইঙ্গিতমাত্র করেই নিরস্ত হব।

অতীত কালের মর্ম উদ্‌ঘাটন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যে বর্তমান কাল আমাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার সহস্রবিধ জালে জড়িত ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার স্বরূপ উপলব্ধি করা স্বভাবতঃই দুঃসাধ্য। তাছাড়া, যে-যুগতরণীতে আরোহণ করে আমরা মহাকালের অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছি, দিক্‌চক্রবালের ওপারে কোন্ মহাতীর্থে তার যাত্রাবসান—সে কথা শুধু তরণীর নাবিকরাই বলতে পারেন, সাধারণ যাত্রীর পক্ষে তা অজ্ঞাত। বর্তমানের মর্ম উপলব্ধিরূপ কঠিন সমস্যার সমাধান আমার মত

অল্পজ্ঞের সাধ্যাতীত। তথাপি, 'মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ', কালিদাসের এই উক্তিটিকে ভরসা করে ও পূর্বসূরীদের অনুসৃত পথ অবলম্বন করে কয়েকটি কথা বলা বোধ হয় অনুচিত হবে না।

১

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখলে তার মধ্যে ছুটি বিশেষ প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে বিশাল ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিধির অভ্যন্তরে অজস্র বিভেদের মধ্যে মনোগত ঐক্য এবং সংহতি স্থাপনের অবিশ্রান্ত প্রয়াস ; অপরদিকে যুগে যুগে বাইরের জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্তরের সংযোগ স্থাপনের সাধনা। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এই ছুটি প্রবণতাকে পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করা হলেও এ ছুটি মূলতঃ একই শক্তির দ্বৈত-অভিব্যক্তি মাত্র। ভিতরের শক্তি এক, ক্ষেত্রভেদে তার প্রকাশ হয়েছে পৃথক্‌। যে মূলশক্তি এই ছুই রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে, সে হচ্ছে মৈত্রীসাধনার শক্তি। ভারতবর্ষের যে প্রতিভা তাকে ওই সাধনার পথে পরিচালিত করেছে, সে হচ্ছে তার পরকে আপন করার প্রতিভা, পরের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রতিভা নয়। এই জন্যই রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে ভারতবর্ষের আসল অভিপ্রায় ও চরম সার্থকতার সন্ধান পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের সূচনার পূর্বেই অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পূর্বেই যে ভারতীয় চিত্তে ভারতবর্ষের ঐক্যোপলব্ধি হয়েছিল এবং চিত্তগত ঐক্যপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল, একথা মনে করার পক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আর চিন্তনীয় বিষয় এই যে, সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক একাধিপত্য স্থাপিত হবার পূর্বেই ওই মনোগত ঐক্য দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় ঐক্যের এই যে রাষ্ট্রনিরপেক্ষতা, এটাই আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো কথা। এই ঐক্যকে আধুনিক পরিভাষায় cultural unity বা সংস্কৃতিগত ঐক্য বলে অভিহিত করতে পারি। যা হক, মৌর্যযুগের পরে ভারতবর্ষের ইতিহাস নানারকম রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে বিপর্যস্ত হলেও তার ওই সংস্কৃতিগত ঐক্যের সাধনা কখনও বিরত হয়নি, বরং তা উত্তরোত্তর কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এখানে তার ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী উপস্থিত করতে চাইনে।

আর, বিশ্বজগতের সঙ্গে মৈত্রীসাধনার যে দ্বিতীয় প্রবণতার কথা পূর্বে বলেছি সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের এই বিশ্বমৈত্রীসাধনার চারটি বিশেষ যুগ ও পর্যায় লক্ষ করা যায়। অস্পষ্ট প্রাচীন যুগের অবসানে দেখতে পাই—একদিকে ভারতবর্ষ এবং অপরদিকে যবন দেশ (অর্থাৎ গ্রীস), এই দুই দেশের মধ্যে চিন্তা ও ভাবের আদানপ্রদান চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। এই দুই দেশের মধ্যে অস্ত্রসংঘর্ষ যে ঘটেনি তা নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা যাবে, ওই অস্ত্রসংঘর্ষ ছিল সাময়িক এবং তা কোনো দেশকেই গভীর-ভাবে প্রভাবিত করেনি; কিন্তু ওই দুই সভ্যতার মধ্যে যে চিত্তসংস্পর্শ ঘটেছিল, তা ছিল নিবিড় ও গভীর এবং তার প্রভাবে উভয় দেশের সভ্যতাই সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল। এই গেল বহির্জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের মৈত্রী-বন্ধনের প্রথম পর্ব; এই পর্বে যাঁর নাম সবচেয়ে স্মরণীয় তিনি হচ্ছেন রাজর্ষি অশোক। দ্বিতীয় পর্বে ভারতবর্ষের দৃষ্টি ফিরেছে পূর্বের দিকে; মহা-চীনবর্ষের সঙ্গে মহা-ভারতবর্ষের অন্তরের মিলনই হচ্ছে এই যুগের বড়ো কথা। একদিকে কাশ্যপমাতঙ্গ, কুমারজীব, গুণবর্ধন এবং অন্যদিকে ফা হিয়ান, হিউএন্থসাঙ, ইৎসিঙ, এঁরাই ছিলেন এই মৈত্রীসাধনার প্রধান পতাকাবাহী। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য এই যে, চীনবর্ষ ও ভারতবর্ষের এই চিত্তসংস্পর্শ ছিল সম্পূর্ণ-রূপে অস্ত্রসংঘাতহীন। তৃতীয় পর্বে ইসলামিক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শ ঘটে। এই পর্বে অস্ত্রসংঘর্ষের স্ফুলিঙ্গে ভারতীয় মধ্যযুগের অন্ধকার আকাশ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওই আলো ছিল উল্কার মতো ক্ষণস্থায়ী। এই উল্কাবর্ষণ দীর্ঘকালব্যাপী হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আলোকে কিছুতেই স্থির আলো বলে বর্ণনা করা যায় না। আমাদের মধ্যযুগের ইতিহাস ওই চমকপ্রদ স্ফুলিঙ্গবর্ষণ ও উল্কাপাতের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। কিন্তু সে যুগের অন্ধকার আকাশে কি স্থিরপ্রভ নক্ষত্রমালাও ছিল না? যদি না থাকত, তবে মধ্যযুগের ভারতবর্ষই মিথ্যাময় বলে প্রতিপন্ন হত। বস্তুতঃ, সেই অন্ধকার রাত্রিতেও রামানন্দ কবীর দাদূ নানক তুকারাম চৈতন্য-প্রমুখ সপ্তর্ষিমণ্ডল উজ্জ্বল প্রভায় কোনো একটি ধ্রুবতারকার চারদিকে আবর্তিত হচ্ছিল এবং ভারতবর্ষকে একান্ত দিক্‌ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করছিল। সেই অমারাত্রির অবসানে নব প্রভাতের আবির্ভাবের সঙ্গেই ভারতীয় ইতিহাসের চতুর্থ পর্বের সূচনা হল। এই পর্বে পশ্চিমের দিক্‌-

প্রান্ত থেকে যে প্রখর আলো ভারতবর্ষের আকাশে বিচ্ছুরিত হয়েছিল, তাতে প্রথমটাতে আমাদের সকলের চোখ ঝলসে গিয়েছিল। কিন্তু তবু একথা সত্য যে, ওই প্রখর আলোর আবির্ভাবেই আমাদের অমারজনীর অবসান ঘোষিত হল এবং ওই আলো লেগেই আমাদের দীর্ঘ নিদ্রাভিভূতি কেটে গিয়ে নব জাগরণের সূচনা হল। আর এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কথা।

আমাদের আধুনিক ইতিহাসকেও দুই পর্বে বিভক্ত করতে হয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যে পর্ব, সে পর্ব হচ্ছে মুখ্যতঃ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে অভিভবের পর্ব। অল্প কয়েকজন মনীষী হয়তো ওই প্রভাব থেকে নিজেদের অল্পবিস্তর মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন; কিন্তু সাধারণ 'শিক্ষিত'-সমাজ যে পশ্চিমের মহিমাগৌরবে মুগ্ধ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারপর দ্বিতীয় পর্বে দেখা গেল মোহাবসান ও আত্মানুসন্ধানের সূচনা। এই সূচনা কালেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনকালটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের এই আত্মানুসন্ধানের যুগ। এখনও যে সে যুগের অবসান হয়েছে, একথা বলতে পারিনে। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে 'আত্মানং বিদ্ধি' এবং এই বাণীই আধুনিক ভারতবর্ষকে সবচেয়ে বেশি উদ্‌বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের পক্ষে আত্মোপলব্ধিও সহজসাধ্য নয়। ভারতবর্ষের অর্থাৎ ভারতীয় চিত্তের যথার্থ স্বরূপ বলে কিছু আছে কি? যদি থাকে তবে সেটি কি? এই মহা-প্রশ্নেরই সংশয়াতীত উত্তর বর্তমান ভারত চায়। আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষ দেশে ও কালে বহুধা বিভক্ত; প্রদেশে প্রদেশে তার বিভিন্ন প্রকাশ এবং ইতিহাসের পর্বে পর্বে তার নিরন্তর রূপপরিবর্তনটাই চোখে পড়ে। এই বহু-দিক্‌ব্যাপ্ত বিচিত্র মহাবর্ষের কোনো ঐক্য সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না এবং তার বহুযুগব্যাপ্ত রহস্যময় ইতিহাসের অবিরত পটপরিবর্তনের মধ্যে একটি ঐক্যধারা অনুভব করাও সহজ নয়। তাই আধুনিক কালের এই নবজাগরণ ও আত্মোপলব্ধির ব্যাকুলতার মধ্যে ভারতবর্ষের আত্মস্বরূপ বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়েছে এবং একএক জনের দৃষ্টিতে তার ইতিহাসের কোনো একটা বিশেষ যুগই চিরন্তন ও 'সত্যযুগ' বলে মনে হয়েছে। যাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষকে ও তার সমগ্র ইতিহাসকে অখণ্ডরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। এই অল্পসংখ্যক

ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের নাম। কথাটাকে আরও বিশদ করে বলা প্রয়োজন।

২

আধুনিক ভারতের নবজাগরণ ও আত্মানুসন্ধানের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, একএক সম্প্রদায় প্রাচীন ইতিহাসের একএকটি যুগের কোনো বিশেষ-রূপকেই সমগ্র ভারতের ভাবী আদর্শরূপে গ্রহণ ও প্রচার করছে। এই জন্যই দেখতে পাই, প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রূপকে আধুনিক কালে এক সঙ্গেই ভারতবর্ষের চিরন্তন ও অভীষ্ট রূপ বলে দাবী করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের পূর্ব-বৈদিক যুগকেই যথার্থ সত্যযুগ বলে স্বীকার করেছে বর্তমান-কালের 'আর্যসমাজ'। পূর্ববৈদিক যুগকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল স্বামী দয়ানন্দের জীবনসাধনা। উত্তর-বৈদিক যুগের অর্থাৎ উপনিষদ্‌যুগের আদর্শ রয়েছে ব্রাহ্মসমাজের মূলে। রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন উপনিষদের বাণীর দ্বারা। বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে মহাবোধি সমাজে; তার মূলে রয়েছে দেবমিত্র ধর্মপালের অক্লান্ত সাধনা। শঙ্করপ্রচারিত বেদান্ত ধর্ম নবকলেবর ধারণ করেছে রামকৃষ্ণ মিশনকে আশ্রয় করে; এই আন্দোলনের প্রেরণাদাতা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বৈষ্ণব ধর্মেরও পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে; কিন্তু এই ধর্মের বহু শাখা আছে। রামানুজাচার্য রামানন্দ নিম্বার্ক শ্রীচৈতন্য-প্রমুখ ধর্মপ্রবর্তকগণ বৈষ্ণব ধর্মকে বহু বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেছেন। আধুনিক কালে এই বহুশাখায়িত বৈষ্ণব ধর্মও তার বিচিত্র রূপ নিয়ে নবজীবন প্রাপ্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে গীতোক্ত ভাগবত ধর্ম সম্প্রদায়নিরপেক্ষভাবে নূতন রূপে ও নূতন শক্তিতে সমস্ত ভারতবর্ষের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছে। শৈব, শাক্ত প্রভৃতি পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম এবং জৈন ধর্মেও নূতন প্রাণ সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে বটে; কিন্তু এসব ধর্ম সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করতে সমর্থ হয় নি। শুধু যে সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই পুনরুদ্‌বোধন ঘটেছে তা নয়। সকল রকম ঐতিহাসিক চেতনাই এ যুগে উজ্জ্বল (কখনও কখনও উগ্র) হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধ খুবই প্রখর হয়েছে। টডের রাজস্থান প্রকাশিত

হবার পর থেকে রাজপুতের বীরত্বমিশ্রিত আত্মত্যাগের কাহিনী একদিকে প্রাদেশিক এবং অপর দিকে সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করেছে। শিখের শৌর্যকীর্তি এবং মারাঠার সাম্রাজ্যমহিমা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে বঙ্গদেশ আত্মসচেতন হয়ে উঠতে আরম্ভ করে এবং কার্জনের আঘাতে সে চেতনা দুর্নিবার রূপ ধারণ করে। একমাত্র 'রাজসিংহ' বাদে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের কথা-অংশটুকু বাংলাদেশেরই কোনও না কোনও ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয় লক্ষ করার যোগ্য। 'বঙ্গদর্শন' নামটির মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গসচেতনতা সুস্পষ্ট। যা হক, এযুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারতীয় চিত্তে ঐতিহাসিক চেতনার সঞ্চার ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্‌বোধন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের, বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্যের, চর্চা নূতন করে শুরু হয় এবং উইলিয়ম জোন্‌স্‌, কোলব্রুক, ম্যাকস্‌মুলর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ মনীষীদের গবেষণায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ রেনেসাঁস হয়। এ সকলের পাশে পাশে চলেছে সমাজসংস্কার। সতীদাহ-নিবারণ, বিধবাবিবাহের প্রচলন, অসবর্ণবিবাহের অনুমোদন প্রভৃতি তার প্রমাণ। শিক্ষাসংস্কারের আন্দোলন এবং প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠার কথাও এই প্রসঙ্গে কম উল্লেখযোগ্য নয়। প্রাচীন চিত্র ও নৃত্যকলা এবং মার্গসংগীতের নব অভ্যুদয়ের উল্লেখ মাত্র না করলে অন্যায় হবে। যা হক, আধুনিক ভারতে নবপ্রাণ-সঞ্চারের এই হচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এই সমস্ত পরস্পর অনুকূল বা প্রতিকূল শক্তিসমূহের প্রতি লক্ষ রেখে, অর্থাৎ আধুনিক ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ পরিপ্রেক্ষিকার উপরে স্থাপন করে, আলোচনা করলেই রবীন্দ্রনাথকে যথার্থরূপে বোঝা যাবে। তা হলে দেখা যাবে আধুনিক ভারতের প্রায় সমস্ত শক্তিই তাঁর অতি স্বচ্ছ চিত্তে শুধু যে প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়, তাকে গভীরভাবে মন্থন করে তাঁর জীবনকে সহস্রমুখী করে গড়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে তিনিও প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছেন।

৩

ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, সে বিষয়ে দু-একটি কথা বলেই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। এ বিষয়টাও দুদিক্ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, তিনি নানা প্রবন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভারতীয় ইতিহাসের বহু বিচিত্র দিক্ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার থেকে জানা যায়, তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সেটা জানার প্রয়োজন আছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় চিত্তের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করেই তিনি নিরস্ত হননি। তাঁর রচিত সাহিত্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, এমন বোধ করি আর কারও সাহিত্যে কখনও হয়নি। এই দ্বিতীয় বিষয়টির প্রতি যদি একটু লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যায় ভারত-ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক যুগই তাঁর রচনায় নূতন রূপ পেয়েছে। প্রথমেই বৈদিক যুগ। গায়ত্রীমন্ত্র তাঁর কিরূপ প্রিয় ছিল, সেকথা আমরা জানি। তাছাড়া, "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" প্রভৃতি কতকগুলি মন্ত্রের বঙ্গানুবাদও তিনি করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাতে সুরসংযোগও করেছেন। তারপরে উপনিষদের যুগ। 'চিত্রা' কাব্যে 'ব্রাহ্মণ' কবিতার সত্যকাম জাবালের কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষে উপনিষদের যুগের গুরুগৃহের ও তৎকালীন আদর্শের যে চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা অবিস্মরণীয়। তা ছাড়া, 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন' প্রভৃতি গ্রন্থে উপনিষদের যে ব্যাখ্যা তিনি আমাদের দিয়েছেন এবং 'নৈবেদ্য' কাব্যে উপনিষদের বাণীকে যেভাবে প্রতিরণিত করে তুলেছেন, তাতে একটা বহুকালবিস্মৃত যুগ যেন আমাদের কাছে নূতন করে উদ্ঘাটিত হয়েছে। তারপরেই আসে বৌদ্ধযুগের কথা। 'কথা' কাব্যের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'অভিসার' প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতায়, 'নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকা' নাটকে বৌদ্ধযুগের প্রাণবস্তুটি যেন আমাদের কছে পুনঃস্পন্দিত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি' প্রভৃতি গানে, 'জাভা-যাত্রীর পত্রে' এবং সিয়াম ও বালী দ্বীপ দর্শন উপলক্ষে যে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন, সেগুলিতেও বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ লক্ষ করা যায়। বস্তুতঃ শুধু সাহিত্যে নয়, বৃহত্তর ভারত ও চীনজাপান ভ্রমণ এবং

চীনভবন-প্রতিষ্ঠা ও চীনভারত-সংস্কৃতিসমিতির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগকে পুনরুদ্‌বুদ্ধ করতে কার্যতঃও সহায়তা করেছেন। প্রাচীনকালে কাশ্যপমাতঙ্গ, কুমারজীব ও গুণবর্ধন ভারতবর্ষের যে আদর্শকে বহন করে গিয়েছিলেন চীনবর্ষে, আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শেরই পতাকাবাহী বলে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবেন। বৌদ্ধযুগের পরে গুপ্তসম্রাট্‌গণ ও কালিদাসের যুগের চিত্রই বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। কুমারসম্ভবের অনুবাদ, ক্ষণিকার 'সেকাল', কল্পনার 'স্বপ্ন' প্রভৃতি কবিতায় মেঘদূত, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনায় তিনি যে কি অদ্ভুত উপায়ে বিস্মৃতপ্রায় একটি যুগকে নূতন প্রাণে উজ্জীবিত করে তুলেছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। এই উপলক্ষে 'তপোবন' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ-মহাভারতও তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি। 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'ভাষা ও ছন্দ' প্রভৃতি রচনার মধ্যে রামায়ণের যুগকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করি। 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ', 'নরকবাস', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি রচনার মধ্যে মহাভারতীয় যুগের প্রাণস্পন্দন যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের রাজপুত, শিখ ও মারাঠার ত্যাগ, বীর্য ও গৌরবের ইতিহাস যেন 'কথা' গ্রন্থের স্বল্প পরিসরের মধ্যে সংহত হয়ে আতসকাচে-ধৃত সূর্যকিরণের মতো প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে 'শিবাজি' নামক সুবিখ্যাত কবিতাটি এবং শিখ ও মারাঠা ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিত দুটি প্রবন্ধও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ অনাদি অতীতকে আহ্বান করে বলেছেন—'কথা কও, কথা কও'। তাঁর সাধনায় মৃত অতীতের কণ্ঠও আজ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর সাহিত্যের মধ্যেই আজ আমরা ভারতবর্ষের বহু অতীত যুগের মিলিত কণ্ঠের ঐকতান শুনতে পাচ্ছি। এটা আমাদের পক্ষে কম আনন্দ ও গৌরবের কথা নয়। কালিদাসের সাহিত্যে আমরা তৎকালীন ভারতবর্ষের অখণ্ড ভৌগোলিক রূপকে প্রতিভাত দেখতে পাই উজ্জ্বল বর্ণে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রূপ দেখা যায় অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ক্ষীণ রেখায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপের বিশিষ্টতা থাকলেও

তার বিশাল সমগ্রতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু ও-সাহিত্যে ভারতীয় ইতিহাস শুধু বিশিষ্টরূপে নয়, অনেকখানি পূর্ণতর রূপেও প্রতিফলিত হয়েছে। শেকস্পীয়রের কতকগুলি নাটকে ইংলণ্ডের ইতিহাস ধরা দিয়েছে জীবন্তরূপে ; তার মধ্যে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের আবেগ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড-গতিতে ও নাটকীয় ভঙ্গীতে। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে নাটকীয় প্রচণ্ডতা কখনও উদগ্র হয়ে ওঠেনি। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যেও ভারতবর্ষের ইতিহাস তার উগ্রতা পরিহার করে ত্যাগ বীর্য ও ধ্যানের স্তব্ধ মহিমময় মূর্তিতেই ধরা দিয়েছে। এই বিশিষ্টতাটুকু না বুঝলে রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি প্রধান কথাই অলক্ষিত থেকে যাবে।

ভারতীয় পুনরুজ্জীবন ও রবীন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষের মানস-সত্তার একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। সে রূপ ভারতীয় সভ্যতাকে পৃথিবীর অন্য সব দেশের সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। ইতিহাসের যুগে যুগে পৃথিবীর নানা বিচিত্র সভ্যতার ধারা ভারতবর্ষে এসে মিলিত হয়েছে; ভারতবর্ষ অনায়াসে তাকে নিজের ধারার সঙ্গে মিলিয়ে আপন করে নিয়েছে, কিন্তু অপরের সঙ্গে একাকার হয়ে আপন বিশিষ্ট রূপটিকে হারিয়ে ফেলেনি। ইতিহাসের প্রতিপর্বে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে নানা জাতির মননস্রোত এসে মিশেছে ভারতীয় চিন্তধারার সঙ্গে। তাতে নানা সমস্যার আবর্ত সৃষ্টি হয়ে কখনও ইতিহাসকে আবিল করে তুলেছে, কখনও দুই কূল ছাপিয়ে গিয়ে ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট রূপটি বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে এবং তাতে যুগে যুগে তার গতির মোড় ফিরে গিয়েছে। এই সমস্যা, বিপ্লব ও গতিপথপরিবর্তনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ নিজের মূলপ্রকৃতিকে রক্ষা করে এগিয়ে চলেছে, এটাই তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পাঁচ হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ শৈশব থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে, তার দেহ বহু সংগ্রামের ক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত, তার ললাট বহু সমস্যার দুশ্চিন্তায় কুঞ্চিত। কিন্তু অবিরাম বিবর্তনের মধ্যেও তার মুখাবয়বের অভিন্নতা সুস্পষ্ট, আধুনিক প্রৌঢ়ত্বের মধ্যেও সুপ্রাচীন শৈশবের চেহারাকে সহজেই চেনা যায়। অতীত ও বর্তমানের এই যে ঐক্য, ভারতীয় চিন্তধারার এই যে অনবচ্ছিন্ন গতি, এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম মূলকথা। এ তত্ত্বটি উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—"মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই"। ঐতিহাসিকের বিচারেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থে লিখেছেন—

> Modern Hinduism, however much it may differ from the creed and social usages of the ancient Rishis, undoubtedly has its roots in the institutions and literature of the Vedic Indo-Aryans.

আধুনিক হিন্দুসংস্কৃতি প্রাচীন যুগ থেকে যত পৃথক্‌ই হক না কেন তার

মূল নিহিত রয়েছে বৈদিক যুগের সাহিত্য ও সমাজব্যবস্থার মধ্যেই। স্মিথ-সাহেব এই উক্তিটিকে অন্যত্র আরও বিশদ করে বলেছেন—

> China excepted, no region of the world can boast of an ancient civilization so continuous and unbroken as that of India....In India the ideas of the Vedic period still are a vital force, and even the ritual of the Rishis is not wholly disused.

ভারতীয় সংস্কৃতির এই অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার কথা আজ আমরা যেমন স্পষ্ট ও সচেতনভাবে অনুভব করি, মধ্যযুগের ভারতবাসী তা করত না। মধ্যযুগের ভারতবাসী নিজের অতীত সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন ছিল না, সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানও ছিল অস্পষ্ট এবং বিকৃত। নিজের অতীত সম্বন্ধে এই যে আত্ম-বিস্মৃতি বা বিকৃত কল্পনা, এটা হচ্ছে সব দেশেরই মধ্যযুগীয়তার লক্ষণ। আর ওই আত্মবিস্মৃতির অবসানে নিজের অতীত ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধান এবং তার থেকে প্রেরণা লাভ করে বর্তমানের কর্মোদ্যম ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার সঞ্চার, এটাই হচ্ছে আধুনিক যুগের মৌলিক লক্ষণ। ইতিহাসে একেই বলে রেনেসাঁস বা আত্মবোধের পুনরুজ্জীবন। ভারত-ইতিহাসের বর্তমান যুগ হচ্ছে এই পুনরুজ্জীবনের যুগ, ভারতবর্ষের নাড়ীতে আজ নবজীবনের স্পন্দন সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য, জাতীয় জীবনে এই নবচেতনাসঞ্চার বহু বিচিত্র শক্তি ও বহু মনীষী ব্যক্তির জীবনসাধনার ফল। ভারতবর্ষের এই পুনরুদ্‌বোধনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় তা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

১

ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বে য়ুরোপীয় রেনেসাঁস সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। কেননা ভারতীয় নবজাগরণ য়ুরোপীয় জাগরণের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বস্তুতঃ ব্যাপকভাবে দেখলে বোঝা যাবে ভারতীয় জাগরণ বিশ্বজাগরণেরই একটি বিশেষ বিকাশ মাত্র এবং আধুনিক বিশ্বজাগরণের উৎপত্তিভূমি হচ্ছে য়ুরোপ। সুতরাং বর্তমান ভারতের ইতিহাসকে য়ুরোপীয় ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়।

য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের মূলকথা হচ্ছে চিত্তের মুক্তিসাধন বা স্বাধীন বুদ্ধির

উদ্‌বোধন। এই চিত্তমুক্তির বাণী প্রথম উদ্‌ঘোষিত হয় ইতালিতে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে। সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র য়ুরোপে। কালক্রমে তা নানা আকার ধারণ করতে থাকে। ইতালিতে এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার পুনরুদ্‌বোধন। বিস্মিত শ্রদ্ধা, মুক্ত বুদ্ধি ও অনাবিল দৃষ্টি নিয়ে প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরালোচনার ফলে মানুষের জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে তৎকালীন ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন কোন্ কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করল সে প্রসঙ্গ একটু পরেই উত্থাপন করা যাবে। এস্থলে শুধু এটুকু বলা প্রয়োজন যে, ইতালিতে চতুর্দশ শতকে যে ঐতিহাসিক চেতনা ও প্রাচীন সম্বন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসার উদ্ভব হল, কালক্রমে তার ধারা গভীরতর ও বিস্তৃততর হয়ে চলেছে, আজও তার অবসান হয়নি। মানুষের ইতিহাস আলোচনার সমস্ত ক্ষেত্রে তাতে যুগান্তর উপস্থিত হয়েছে, কোনো দেশের ইতিহাসই এই অনুসন্ধিৎসার আলোকপাত থেকে বঞ্চিত হয়নি। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রূপও তারই ফলে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আরও একটু আলোচনা করার প্রয়োজন হবে।

এখানে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের ধারাটিকেই আর-একটু অনুসরণ করা প্রয়োজন। ইতালীয় চিত্তোদ্‌বোধন প্রধানতঃ ইতিহাস (বা পুরাতত্ত্ব), সাহিত্য ও চিত্রশিল্পকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু নব-জাগরণের আন্দোলন যখন ইতালির সীমা অতিক্রম করে জার্মানিতে সম্প্রসারিত হল তখন তার আকৃতিতে পরিবর্তন দেখা দিল। ইতালিতে যে আন্দোলনের প্রধান আশ্রয় ছিল সংস্কৃতি, জার্মানিতে তার অবলম্বন হল ধর্ম। সেখানে মানুষের বিচারবুদ্ধিপরায়ণ সত্যানুসন্ধিৎসা ধর্মের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব সৃষ্টি করল য়ুরোপের ইতিহাসে তাই রিফরমেশন বা ধর্মসংস্কারের আন্দোলন নামে পরিচিত। ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে রিফরমেশন আসলে রেনেসাঁসেরই রূপভেদ মাত্র। এই যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ সংস্কৃতি থেকে ধর্মে, জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে কর্মের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হল, আরও পরবর্তী কালে তারই ফলে য়ুরোপে দেখা দিল রাষ্ট্রবিপ্লব। ইতালীয় আন্দোলনে পেত্রার্কা ও বোক্‌কাৎচো এবং জার্মানির আন্দোলনের রয়খ্‌লীন ও এরাস্‌মাসের যে স্থান, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাসে ভলটেয়ার ও রুশোর

সেই স্থান। এই দুইজন ফরাসী মনীষী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে তদানীন্তন অন্যায়-অবিচারকে যেমন নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন তারই অনিবার্য ফল ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব। ইতালীয় সংস্কৃতি-আন্দোলন এবং জার্মানীর ধর্মান্দোলন যেমন ক্রমে সমগ্র য়ুরোপে বিস্তার লাভ করেছিল, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের আন্দোলনও পরবর্তী কালে তেমনি য়ুরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ফরাসী বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল মানুষের রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। আরও পরবর্তী কালে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ন্যায়-প্রতিষ্ঠার দাবী য়ুরোপের ইতিহাসে আর-এক বিপ্লবের স্থচনা করল। এই বিপ্লবের অগ্রদূত হলেন কার্ল মার্কস ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেল্‌স্‌। এঁদের বিচারবিশ্লেষণের ফলে মানুষের মনোজগতে যে নূতন আদর্শের প্রেরণা দেখা দিল তারই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লব।

তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে জার্মানির ধর্মনৈতিক বিপ্লব, ফরাসির রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব ও রুশিয়ার অর্থনৈতিক বিপ্লব আসলে ইতালীয় সংস্কৃতি-বিপ্লবেরই যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। একথাও মনে রাখা দরকার যে, পরবর্তী আন্দোলনের ফলে পূর্ববর্তী আন্দোলনের নীতি অস্বীকৃত বা নিষ্ক্রিয় হয় না। আধুনিক রুশবিপ্লবের প্রভাবে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের বা জার্মান ধর্মবিপ্লবের নীতি অস্বীকৃত হয়নি এবং ইতালীয় সংস্কৃতি-আন্দোলনের শক্তিও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। এই বিপ্লবচতুষ্টয়ের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া আজও সমভাবে সক্রিয় আছে এবং য়ুরোপের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বজগতের ইতিহাসকেই যুগপৎ মথিত ও ক্ষুব্ধ করে তুলছে।

ইতালীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রকাশ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ভৌগোলিক অনুসন্ধিৎসা। তারই ফলে খ্রীস্‌টোফার কলম্বাস-কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৯২) ও ভাস্‌কো ডা গামার ভারতবর্ষে আবির্ভাব (১৪৯৮)। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে পোর্তুগীজদের ভারতে আগমন একটি বৃহৎ ঘটনা। কিন্তু তা হলেও তৎকালীন ঐতিহাসিক কারণপরম্পরার ফলে পোর্তুগীজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাব দেখা দিল না। অবশ্য তৎকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসেও ধর্ম এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক-রকম নবজীবন-সঞ্চারের স্থচনা হয়েছিল। রামানন্দ, কবীর, নানক,

চৈতন্য প্রমুখ সাধকরা ছিলেন তার অগ্রদূত। কিন্তু যথোচিত অনুকূল অবস্থার অভাবে ওই সূচনা য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের মতো সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ না পেয়ে দীর্ঘকাল নির্বাণোন্মুখ হয়েই ছিল। অবশেষে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় মনীষার স্ফুলিঙ্গস্পর্শে ভারতীয় প্রতিভা প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। এইভাবে যে উজ্জীবন-যুগের সূচনা হল তার উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।

পূর্বে বলেছি ইতালীয় রেনেসাঁসের মূলে ছিল অতীত সম্বন্ধে জ্ঞানোজ্জ্বল শ্রদ্ধা ও যুক্তিনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা। তার থেকেই আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে। লরেনসিয়াস্ ভাল্লা (১৪০৭-৫৭)-প্রমুখ মনীষীরা যে ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত করলেন তার ফলে শুধু যে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিহাসই যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা নয়, তারই ফলে পরবর্তী কালে মিশর-সুমেরিয়া, আসিরিয়া-খালদিয়া, চীন-ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত বা পুনর্গঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষের পক্ষে এ কথা বিশেষভাবে খাটে। যাঁদের উৎসাহ ও উদ্যমে ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্ধারের প্রথম সূচনা দেখা দেয় তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন তিনজন—স্যার চার্লস উইলকিন্স, স্যার উইলিয়াম জোন্স্ ও এইচ্. টি. কোলব্রুক। ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর উৎসাহে স্যার চার্লস্ উইলকিন্স ১৭৮৫ সালে ভগবদ্‌গীতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই ঘটনা থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের যে সূচনা হল, ভারতীয় পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে তার ফল অপরিসীম বললেও অত্যুক্তি হয় না। উইলকিন্সের পরে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় অগ্রসর হলেন বহুভাষাবিৎ মনীষী স্যার উইলিয়াম জোন্স্। তাঁর দৃষ্টিতেই সর্বপ্রথমে বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হল। উক্ত ভাষার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেই তিনি সবিস্ময়ে ঘোষণা করলেন—

> More perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either.

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের এই যে আবিষ্কার—কি বিস্ময়করতা, কি ফলাফলের গুরুত্ব, কোনো দিকেই তা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের

চেয়ে কম নয়। এই গুরুত্বের বিষয় স্মরণ করেই বিখ্যাত সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত ম্যাকডোনেল বলেছেন—

> Since the Renaissance there has been no event of such world-wide significance in the history of culture as the discovery of Sanskrit literature in the latter part of the eighteenth century.

উইলিয়ম জোন্স্ ভারতবর্ষের তথা এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকে য়ুরোপীয় মনীষীদের অক্লান্ত উদ্যমে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের ইতিহাস ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হতে থাকে। এর মূলে রয়েছে য়ুরোপীয় রেনেসাঁস-পর্বের জ্ঞানলিপ্সার প্রেরণা। কিন্তু ভারতবাসীর চোখের সামনে যখন তার অতীত কীর্তিকলাপের ইতিহাস প্রকাশিত হতে লাগল, তখন তার পক্ষে অবিচলিত বা নিষ্ক্রিয় থাকা আর সম্ভব হল না। নূতন ঐতিহাসিক চেতনায় ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গে নবপ্রাণ সঞ্চারের চাঞ্চল্য জেগে উঠল।

২

য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে ভারতীয় রেনেসাঁসের একটু সংক্ষিপ্ত তুলনা করা যাক। য়ুরোপে নবজীবনের লক্ষণ প্রথম দেখা দেয় ইতালিতে। ভারতবর্ষে তা ঘটেছে বাংলায়। ইতালীয় চিত্তোদ্‌বোধনের অন্যতম প্রধান কারণ গ্রীক সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ। বাংলাদেশে সে প্রেরণা জুগিয়েছে য়ুরোপীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শ। আরও একটি বিষয়ে ইতালীয় ও ভারতীয় রেনেসাঁসের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। মধ্যযুগের য়ুরোপে লাটিন সাহিত্যই একাধিপত্য করত, গ্রীকসাহিত্য তখন বিস্মৃতপ্রায়। গ্রীক সংস্কৃতিরও দুই পর্ব—একটি হচ্ছে প্রাচীন-গ্রীক বা হেলেনিক পর্ব, আর-একটি নব্য-গ্রীক বা হেলেনিস্টিক পর্ব। প্রত্ন ও নব্য গ্রীক সংস্কৃতির আবিষ্কারই ইতালীয় নবজাগরণের মূলপ্রেরণা জুগিয়েছিল। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে তেমনি পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যই একাধিপত্য করছিল। তৎপূর্ববর্তী বৈদিক এবং বেদোত্তর বৌদ্ধসংস্কৃতির কথা ভারতবর্ষ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আধুনিক কালে এই দুই বিস্মৃতপ্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের ফলেই ভারতীয়

নবচেতনার স্থচনা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল গ্রীসের এটিকা প্রদেশ, আর হেলেনিস্‌টিক সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল মিশর। তেমনি ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল সরস্বতী ও দৃষদ্‌বতী নদীর মধ্যবর্তী ব্রহ্মাবর্ত। আর বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎসভূমি ছিল কাশী-কোশল-মগধ প্রদেশ।

য়ুরোপীয় রেনেসাঁস ও ভারতীয় রেনেসাঁসের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট; একটিমাত্র বিশেষ পার্থক্যের বিষয় এখানে বলা প্রয়োজন। পূর্বেই বলেছি য়ুরোপের নবচেতনা পর্যায়ক্রমে জ্ঞান, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিকে অবলম্বন করে বিপ্লবের স্থষ্টি করেছে, এবং এই চতুর্বিধ বিপ্লব ঘটতে সে দেশে পাঁচশো বছরের বেশি সময় লেগেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই চতুর্বিধ বিপ্লব দেখা দিয়েছে প্রায় একই সঙ্গে এবং কিঞ্চিদধিক একশো বছরের মধ্যে। সে দেশ থেকে এসব ভাবধারা প্রায় একই সময়ে এদেশে আমদানী হয়েছে। তাই এদেশে সে পর্যায়ক্রম অনুস্থত হতে পারেনি। তবু যে পর্যায়ক্রম কতকটা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় সে হচ্ছে ধর্ম, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি। ধর্মবিপ্লবই যে ভারতবর্ষে সকলের আগে দেখা দিল সেটা কিছু বিচিত্র নয়। কারণ এদেশের পক্ষে ধর্মই সর্বাপেক্ষা মুখ্য বিষয় সে তো জানা কথা। যা হক, এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় চিন্তাধারায় এক পর্যায়ের আন্দোলন সমাপ্ত হবার পূর্বেই অন্য আন্দোলন দেখা দিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কোনও পর্যায়ের আন্দোলনই শেষ হয়নি, উক্ত চতুর্বিধ আন্দোলনই ভারতবর্ষের চিত্তকে যুগপৎ বিক্ষুব্ধ করছে।

এই প্রাথমিক কথাগুলি স্মরণ রাখলে ভারতীয় উজ্জীবনের ইতিহাস অনুসরণ করা সহজ হবে।

এবার ইতালি ও বাংলার নবোদ্‌বোধন আন্দোলনের সাদৃশ্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। পূর্বেই বলেছি উভয় ক্ষেত্রেই বহু ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরা ও বহু মনীষীর জীবন-সাধনা রয়েছে এই নবোদ্‌বোধনের মূলে। কারণপরম্পরার কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এখন মনীষীদের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সকলের দূরে থাক, শুধু প্রধানদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নয়। অতএব মাত্র দুই-একজন সম্বন্ধে শুধু দু-একটি কথা বলেই নিরস্ত হব।

যে দুজন মনীষীর কার্যকলাপ ইতালির তৎকালীন ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা

উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁদের নাম হচ্ছে ফ্রানসেস্কো পেত্রার্কা (১৩০৪-৭৪) এবং লিওনারদো দা ভিন্চি (১৪৫২-১৫১৯)। একজনের মননশক্তির ফলে ঘটে ইতালীয় জ্ঞানান্দোলনের প্রথম উদ্বোধন এবং আর-একজনের হাতে ঘটে তার চরম পরিণতি, একথা অনায়াসেই বলা যায়। বাংলাদেশেও রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মনস্বীর অক্লান্ত সাধনার ফলে ভারতবর্ষীয় নবপ্রাণনা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে ইতালির ইতিহাসে ভিন্চির যে স্থান, বাংলার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথেরও সেই স্থান। ভিন্চি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

> Leonardo da Vinci was, in his manysidedness and versatility a true child of the Italian Renaissance; he was at once a painter, sculptor, architect, poet, musician and scientist.

প্রতিভার বহুমুখিতার দিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথকে অবশ্যই ভিন্চির সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু তাঁকে ভারতীয় রেনেসাঁসের true child বলাই যথেষ্ট নয়। কেননা তিনি এক হিসাবে ভারতীয় নবযুগের true child হলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে তিনিই ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও বটেন। জার্মানির মনস্বী কবি গ্যয়টে কালিদাসের শকুন্তলাকে যুগপৎ তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল (young year's blossoms and the fruits of its decline) বলে বর্ণনা করেছেন। এই উক্তি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপেই প্রযোজ্য, কেননা তিনি হচ্ছেন একাধারে ভারতীয় নবোৎপ্রাণনার স্বষ্ঠুতম সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে ভিন্চির সঙ্গে তুলনা না করে পেত্রার্কার সঙ্গে তুলনা করাই সমীচীন। পেত্রার্কা সম্বন্ধে ইতিহাসে বলা হয়—

> To understand Petrarch is to understand the Renaissance.

এই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রপ্রতিভা তথা ভারতীয় উৎপ্রাণনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে পেত্রার্কার সঙ্গে তাঁর তুলনা করা আবশ্যক। এস্থলে দু-একটি মাত্র প্রধান বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

৩

ইতালীয় রেনেসাঁসের সর্বপ্রধান লক্ষণ হল মানুষের দৃষ্টিকে অপার্থিব বা নিছক ভাগবত বিষয়ের পরিবর্তে পার্থিব ও মানবিক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করা। মধ্যযুগে মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পরলোক, ধর্মসাধনা ও মুক্তির প্রতি; জাগতিক ও মানবিক ব্যাপারের প্রতি ঔদাসীন্য ছিল তৎকালীন জীবনাদর্শের বিশিষ্ট অঙ্গ, বিষয়বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। ইতালীয় রেনেসাঁসের সময় থেকে মানুষের দৃষ্টি মোড় ফিরে গিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে উঠল। জাগতিক ও মানবিক ব্যাপারের প্রতি এই যে নবজাগ্রত আগ্রহ, ইতিহাসে তা humanism নামে আখ্যাত হয়েছে এবং ইতালির নবযুগ-প্রবর্তক পেত্রার্কাকে বলা হয়েছে First of the Humanists। বলা বাহুল্য, মানবিক ব্যাপারের প্রতি আগ্রহ, রবীন্দ্র-চিন্তাধারারও একটি বিশিষ্টতম লক্ষণ। সেই যে 'কড়ি ও কোমলে'র যুগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

তার মধ্যেই জাগতিক ও মানবিক বিষয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। পরবর্তী জীবনে এই আগ্রহ ক্রমেই গভীরতর এবং প্রবলতর হয়েছে। একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন 'স্বর্গ হইতে বিদায়'-এর কবি, তিনি হচ্ছেন 'বসুন্ধরা'র কবি। 'মায়াবাদ' এবং 'বৈরাগ্যসাধন'-এর আদর্শ তাঁর চিত্তকে কখনও স্পর্শ করেনি।

জন্মেছি যে মর্ত্যকোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে ॥

যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা ॥

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া ॥

—এই সব উক্তিতে humanism প্রকাশমান। তার চরম পরিণতি ঘটেছে 'Religion of Man' এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে।

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, ইতালীয় humanism ছিল মূলতঃ ধর্ম-

নিরপেক্ষ; কিন্তু ভারতীয় humanism কখনও ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করেনি, বরং ধর্মকে নবরূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছে। Religion of Man নামটির মধ্যেই দুই বিপরীতমুখী ভাবধারার সমন্বয় ঘটেছে। এর এক কারণ ভারতবর্ষের স্বাভাবিক ধর্মপ্রাণতা। আর-এক কারণ এই যে, ভারতবর্ষে রেনেসাঁস ও রিফরমেশন দেখা দিয়েছে প্রায় সমকালেই; সুতরাং এই দুই ধারা যে কোনো সংগমস্থলে পরস্পর মিলিত হবে সেটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বস্তুতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রিক আন্দোলনও আজ পর্যন্ত ধর্মের আদর্শ থেকে স্বতন্ত্র থাকতে পারেনি।

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, ভারতীয় উজ্জীবনযুগের অন্যান্য নেতাদের মধ্যেও এই বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট। 'অনুশীলন'-নীতির উপাসক বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে জাগতিক সত্তা ও আধ্যাত্মিক নীতির সমন্বয়কেই মানুষের আদর্শ বলে প্রচার করেছেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মুখেও এই সমন্বয়ের বাণীই উদ্‌ঘোষিত হয়েছে—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

ভারতবর্ষীয় মানবিকতা ধর্মহীন নয় এবং ভারতবর্ষীয় ধর্মও মানবিকতা-বর্জিত নয়, এই বৈশিষ্ট্যটুকুর কথা স্মরণ না রাখলে ভারতবর্ষকেই বোঝা যাবে না। প্রাচীন কালের বুদ্ধ ও অশোক-প্রচারিত মৈত্রীর বাণী এবং পরবর্তী কালের 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' ইত্যাদি বাণীতে ওই সমন্বয়ের আদর্শেরই পরিচয় পাই।

৪

পূর্বে বলেছি প্রাচীনের প্রতি জ্ঞানোজ্জ্বল শ্রদ্ধা এবং যুক্তিনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা য়ুরোপীয় উদ্‌বোধনযুগের একটি প্রধান লক্ষণ। কি প্রাচীন ইতিহাস, কি প্রাচীন সাহিত্য, কি প্রাচীন শিল্পনিদর্শন, সমস্তই তৎকালীন মানুষের হৃদয়ে সশ্রদ্ধ বিস্ময় উদ্রিক্ত করত। ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিক

চেতনা সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু বলেছি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কি দেখা যাক।—

> হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
> কথা কও, কথা কও —

শুধু এ কথা বলেই তিনি নিরস্ত হননি। কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে অতীত ভারতকে রবীন্দ্রনাথ যেমন জীবন্ত করে তুলেছেন তার তুলনা নেই। অন্যত্র এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি, এস্থলে পুনরুক্তি করব না। স্বদেশের যথার্থ ইতিহাস উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত উদ্‌ধৃত করেই এই প্রসঙ্গ শেষ করব।—

> যে-সকল দেশ ভাগ্যবান্ তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়—বাল্যকালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়-সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উলটা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।···বহুবর্ষকালব্যাপী ঐতিহাসিক সূত্র বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের হৃদয় আশ্রয় পায় না। নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে কোথা হইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব?···যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে সম্মুখে মূর্তিমান করিয়া তুলিবেন, অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আহ্বান করিতেছি।···হে ঐতিহাসিক, আমাদের দিবার সংগতি কোন্ প্রাচীন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা দেখাইয়া দাও, তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন কর।
>
> —'ভারতবর্ষ', ভারতবর্ষের ইতিহাস (রচনাবলী ৪, পৃ ৩৯৭)

প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি পেত্রার্কা যে অনুরাগ পোষণ করতেন সে সম্বন্ধে ইতিহাসে বলা হয়েছে—

> His enthusiasm for the ancient writer was a sort of worship.

গ্রীক মহাকবি হোমারের প্রতি তাঁর মনোভাব সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবও ছিল a sort of worship। রামায়ণের মর্মব্যাখ্যা উপলক্ষে তিনি বলেছেন—

বাল্মীকির রামচরিত-কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না; তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন।··· রামায়ণ এবং মহাভারতকেও আমি এইভাবে দেখি। ইহার সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃদ্‌পিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।

—'প্রাচীন সাহিত্য', রামায়ণ

অতঃপর রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বলেছেন—

পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা। ···যথার্থ সমালোচনা পূজা—সমালোচক পূজারি পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে প্রকাশ করেন মাত্র।

—'প্রাচীন সাহিত্য', রামায়ণ

পেত্রার্কার মনোভাবের সহিত এই আদর্শের কি আশ্চর্য মিল! বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলার সমালোচনাও করেছেন এই পূজার আবেগ এবং ভক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের মনোভাব নিয়েই; ভারতীয় জীবনাদর্শের সাহায্যেই তিনি ওই দুই কাব্যকে উপলব্ধি করেছেন এবং ওই দুই কাব্যের দ্বারা ভারতবর্ষের জীবনাদর্শকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। সেইজন্যেই শত শত বৎসরের পঠনপাঠনের পরেও কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা আমাদের চোখে নূতন আলোতে নূতন রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

প্রাচীনকালের শিল্পনিদর্শনের প্রতি নবজাগ্রত অনুরাগ য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের আর-একটি প্রধান লক্ষণ। এ বিষয়ে পেত্রার্কা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

Petrarch had for the material monuments of classical antiquity a feeling akin to that which he had for its literary memorials.

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাচীন ভাস্কর্য বা স্থাপত্য নিদর্শন সম্বন্ধে বেশি কথা নেই। কিন্তু যা আছে তা প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি যেমন, তেমনি ভক্তিমাখা বিস্ময়

ও পূজার আবেগে পরিপূর্ণ। তাঁর লেখা থেকে একটি অংশ উদ্‌ধৃত করলেই এ কথার সত্যতা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে।—

> উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম তখন মনে হইল একটা যেন কী নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে; সে কথা বহু শতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া মূক বলিয়া হৃদয়ে আরও যেন বেশি করিয়া আঘাত করে। ঋক্‌রচয়িতা ঋষি ছন্দে মন্ত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা কোনো একটি প্রাচীন যুগের মহাকাব্যের কয়েকখণ্ড ছিন্নপত্র।…
>
> ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিস্ময়ের আঘাত লাগে। আশৈশব ইংরেজি শিক্ষায় আমরা স্বর্গমর্ত্যকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম পাছে দেবআদর্শে মানবভাবের কোনো আঁচ লাগে, পাছে দেব-মানবের মধ্যে যে পরমপবিত্র সুদূর ব্যবধান—ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশমাত্র লঙ্ঘন করে। এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে তাও নয়।…
>
> ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া পারে না। মানুষ এই প্রস্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা বহুদূরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে কথা এই—দেবতা দূরে নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। এই সংসারই তাঁর চিরন্তন মন্দির।
>
> ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতেই তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।…
>
> বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, ইহাই নব হিন্দুধর্মের

মর্মকথা হইয়া উঠিল।…ভুবনেশ্বরের মন্দিরও … দেবালয় হইতে মানবত্ব মুছিয়া ফেলে নাই।…তাহা সংসারকে লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে।

—'বিচিত্র প্রবন্ধ', মন্দির

ভুবনেশ্বরের মন্দিরকে উপলক্ষ করে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এই উক্তির মধ্যে! সবিস্ময় মুগ্ধতায় তা পেত্রার্কার মনোভাবের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আরও কত বেশি নিবিড়, তাঁর দৃষ্টি আরও কত বেশি গভীর! এই উক্তিটির মধ্যে যে humanism বা মানবত্বের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে তার মহত্ত্ব অতুলনীয়। ইতালীয় মানবত্বের আদর্শের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ঐক্য নেই। রবীন্দ্রনাথের মানবত্ব ধর্মভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত, এখানেই তার বিশিষ্টতা।

৫

পেত্রার্কার সঙ্গে আর-একটিমাত্র সাদৃশ্যের কথা বলব। ইতালীয় সাহিত্যেও পেত্রার্কার দান কম নয়; তিনি বহুবিধ কাব্যকলার উদ্‌ভাবক, তাঁর সনেটের কথা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কত অজস্র সম্পদ্ লাভ করেছে, সেকথা এস্থলে উল্লেখ করাও নিষ্প্রয়োজন।

পেত্রার্কা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন—

The first and greatest representative of the humanistic phase of the Italian Renaissance.

রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় উৎপ্রাণনযুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলতেই হবে; কিন্তু তাঁকে তার প্রথম প্রবর্তক বলা যায় না। কেননা রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত পূর্বগামীরা ভারতবর্ষের নবযুগকে আবাহন করে এনেছিলেন। তার মধ্যে যুগপ্রবর্তক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান কোথায় তা এখনও যথোচিতভাবে নির্ণীত হয়নি। তা হওয়া প্রয়োজন এবং এ-হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করাও প্রয়োজন। নতুবা ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের মর্মকথা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধায় এবং প্রাচীনকে

নবপ্রাণে উজ্জীবিত করার সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রও অনেক হিসাবে পেত্রার্কার সঙ্গে তুলনীয়। একটি দৃষ্টান্ত দেই। রোমের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ পেত্রার্কার হৃদয়কে যে প্রবল ভাবের আবেগে আন্দোলিত করে তুলত, তার সঙ্গে ভুবনেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পূজাপরায়ণ ব্যাকুলতার তুলনা করেছি। আর, এই প্রসঙ্গে 'সীতারাম' উপন্যাসে উদয়গিরি ও ললিতগিরির প্রাচীন শিল্পকলার ধ্বংসাবশেষকে উপলক্ষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় থেকে লাভাস্রাবী আগ্নেয়গিরির ন্যায় যে ক্ষুব্ধ বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তা অবশ্যই স্মরণীয়।

পেত্রার্কা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যও কম নয়। পেত্রার্কা ও বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন নিজ নিজ যুগপ্রবর্তনার humanistic phase-এর অর্থাৎ মানবিক দিকের প্রতিনিধি। এই দিকের প্রকাশ সাহিত্যে। জাতীয় উজ্জীবনের আর-একটি দিক্ প্রকাশিত হয় শিল্পকলায়, প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই তার নিদর্শন আছে। ইতালীয় উৎপ্রাণনযুগে এই দ্বিতীয় দিক্‌টি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল লিওনারদো দা ভিন্‌চি, রাফেল, মাইকেল এন্‌জেলো এবং টিশিয়ান—এই চারজন মহাশিল্পীর হাতে। জাতীয় জীবনোদ্‌বোধনের এই ক্ষেত্রে পেত্রার্কা ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের দান কম নয়। ইতালির ইতিহাসে ভিন্‌চি, রাফেল প্রভৃতির যে স্থান, ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল-প্রমুখ শিল্পীদের সেই স্থান। ভারতবর্ষীয় নব শিল্পচেতনার মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা উপেক্ষণীয় নয়। ১৯০৫ সালেই তিনি অতি স্পষ্টভাবে ভারতীয় শিল্পোদ্‌বোধনের মন্ত্র উচ্চারণ করেন। জাপানি চিত্ররসজ্ঞ মনীষী কাউন্ট ওকাকুরাকে রবীন্দ্রনাথই এদেশে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে নব শিল্পপ্রেরণা স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি নিজেও চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন। তা ছাড়া, আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলা, সংগীত এবং নাট্যাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের দান কতখানি, সে-বিষয়ে এস্থলে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা গেল ভারতীয় নবচেতনার দুই দিকেই—মানবিকতা এবং শিল্পচেতনা, এই উভয়দিকেই রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। তাঁর মধ্যে

একাধারে পেত্রার্কা ও ভিন্‌চি এই উভয়ের প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং 'পেত্রার্কাকে বুঝলেই ইতালীয় নবজাগরণ বোঝা হল' এই উক্তি ইতালীয় ইতিহাসে যতখানি সত্য, তার চেয়ে 'রবীন্দ্রনাথকে বুঝলেই নবোদ্‌বুদ্ধ ভারতবর্ষকে বোঝা হল' এই উক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসের পক্ষে অনেক বেশি সত্য।

ধনঞ্জয় বৈরাগী

কুড়ি বছর বয়সের সময় রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বন করে 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' নামক উপন্যাসখানি রচনা করেন। এখানিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ও নবম প্রকাশিত গ্রন্থ (১৮৮৩)। এর ছাব্বিশ বৎসর পরে তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানি প্রকাশিত হয় (১৯০৯)। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> "বৌ-ঠাকুরানীর হাট নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্টীকৃত হইল। মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।"

এইযে নূতনত্ব, তার অনেক কারণ। প্রথমতঃ এই দীর্ঘকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভা অনেকখানি পরিণতি লাভ করেছে। তা ছাড়া এই সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসেও এক বিপ্লব ঘটে গিয়েছে, তার প্রত্যক্ষ উপলক্ষ্য ১৯০৫ সালে লাট কার্জনের বাংলাবিভাগ। এই বঙ্গবিপ্লবের অন্যতম ভাবনায়ক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই বিপ্লবযুগে তিনি গদ্যে পদ্যে গানে অজস্রভাবেই তাঁর ভাবাদর্শকে দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও তাঁর রাজনৈতিক বিপ্লবাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। মুখ্যতঃ এইজন্যই বৌ-ঠাকুরানীর হাট ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে এতখানি পার্থক্য ঘটেছে। প্রত্যক্ষতঃ প্রতাপাদিত্যের কাহিনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত হলে ও ইতিহাসরস' সৃষ্টি করা এই দুখানি বইএর কোনোটিরই লক্ষ্য নয়। বৌ ঠাকুরানীর হাটের উদ্দেশ্য ইতিহাসের পাতলা আবরণের অন্তরালে সাম জিক রোমান্স-রস সৃষ্টি করা। আর প্রায়শ্চিত্তের লক্ষ্য রাজনৈতিক বিপ্লবাদর্শ স্থাপন করা, ইতিহাস তার উপলক্ষ্য মাত্র। দৃশ্যতঃ লেখকের দৃষ্টি ইতিহাসের দিকে নিবদ্ধ হলেও তার প্রেরণাস্থল অতীত নয়, বর্তমান ; এবং তার লক্ষ্য ভাবী কাল। এই হিসাবে বৌ-ঠাকুরানীর হাট বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার সমগোত্রীয়, আর প্রায়শ্চিত্ত আনন্দমঠের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত।

কিন্তু আনন্দমঠের সঙ্গেও প্রায়শ্চিত্তের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। আনন্দমঠের প্রেরণাশক্তি নিহিত রয়েছে ১৮৫৭ সালের সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের

মধ্যে। আর, প্রায়শ্চিত্তকে প্রেরণা জুগিয়েছে ১৯০৫ সালের বঙ্গবিপ্লব। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস থেকে বঙ্কিমচন্দ্র এই শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশপ্রেমের উদ্‌বোধন না ঘটলে এবং তাদের মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান না হলে পরাধীনতার বন্ধনমোচন সম্ভব নয়। আনন্দমঠের এই শিক্ষা কার্যতঃ রূপ গ্রহণ করল বঙ্গবিপ্লবের সশস্ত্র প্রতিরোধপ্রয়াসের মধ্যে। এই বিপ্লবের ব্যর্থতা থেকে রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষা পেলেন যে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে আত্মশক্তির উদ্‌বোধন না হলে এবং তাদের মধ্যে আত্মিক বলের নিরস্ত্র অভ্যুত্থান না ঘটলে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছেদন সম্ভব নয়। ভবানন্দ-জীবানন্দ এবং ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রগত পার্থক্যের কথা স্মরণ করলেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শের পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে।

২

বৌ-ঠাকুরানীর হাটে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাটকেই তার প্রথম আবির্ভাব। দ্রুপদ রাজার যজ্ঞের অগ্নিশিখা থেকে যেমন পাঞ্চালীর উদ্ভব, ১৯০৫-০৮ সালের বঙ্গবিপ্লবের বহ্নিশিখা থেকেই তেমনি ধনঞ্জয় বৈরাগীর চারিত্রশক্তির অভ্যুদয়। কিন্তু ধনঞ্জয়ের চারিত্ররূপ প্রায়শ্চিত্ত নাটকে প্রকাশিত হলেও তার ভাবরূপ রবীন্দ্রনাথের মনে দেখা দিয়েছিল বহু পূর্বেই। অতি সংক্ষেপে তার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

দরিদ্রের প্রতি ধনীর অবহেলা ও ঔদাসীন্য অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে ব্যথিত করেছিল। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের (১৮৮৬) 'কাঙালিনী' কবিতাটিতেই তার প্রমাণ রয়েছে।—

আনন্দময়ীর আগমনে
　　আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
　　দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
ওর প্রাণ আঁধার যখন
　　করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি।
দুয়ারেতে সজল নয়ন,—
　　এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি।

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি,
জননীরা আয় তোরা সব ;
মাতৃহারা মা যদি না পায়,
তবে আজ কিসের উৎসব ?

পরবর্তী কালে এই করুণা ও বেদনা রূপান্তরিত হয়েছে ক্ষোভে ও সন্তাপে। এই ক্ষোভ তীব্র বিদ্রূপের আকারে প্রকাশ পেয়েছে 'চিত্রা' কাব্যের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় (১৮৯৫)।—

এ জগতে হায় সেই বেশি চায়
আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত
কাঙালের ধন চুরি।

শুধু ক্ষোভ এবং সন্তাপ নয়, এই অন্যায় এবং অবিচারের প্রতিকার ও প্রতিরোধের প্রবৃত্তি এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের মনে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। চিত্রা কাব্যেরই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে (১৮৯৪) দেখি লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত দরিদ্র কাঙালদেরই সংঘবদ্ধ আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করবার বাণী বলিষ্ঠ কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে।—

স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া ; বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার ; সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী,…নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে-অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে—

মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;···
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।···
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

কবি রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাসের ছবিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে। ১৮৯৪ সালে যে আদর্শ তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল ভাবরূপে, ১৯০৯ সালে তাই বিকশিত হয়ে উঠল জননায়ক ধনঞ্জয়ের চরিত্রমহিমার রূপ ধরে। সে চরিত্রের কথা যথাস্থানে পুনরুত্থাপন করা যাবে।

এই যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে দাঁড়াবার কথা, প্রতিরোধের কথা, 'নৈবেদ্য' কাব্যেও (১৯০১) তার প্রকাশ ঘটেছে বার বার।—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।—৪৮
রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র ? তুমি যার বিরাজ অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়, স্বাধীন সে বন্দিশালে।

মৃত্যুভয়
কি লাগিয়া, হে অমৃত ? দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান,
এত প্রাণদৈন্য প্রভু, ভাণ্ডারেতে তব ?—৫৩
অপমানে নতশির ভয়ে ভীত জন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন।—৫৮

বীর্য দেহ ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীনজ্ঞান,—বলের চরণে
না লুটিতে। —৯৯
তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে, তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।···
অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।—৭০

নৈবেদ্যের এই বলিষ্ঠ নীতিগুলিই মূর্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে ধনঞ্জয়-চরিত্রে। এই চরিত্রে যে নীতি ও যে শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সে নীতি ও শক্তি ভারতবর্ষেরই চিরন্তন সম্পদ্। ইংরেজি-শিক্ষার মোহে আমরা ভারত-বর্ষের এই চিরন্তন স্বরূপকে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু তার অজেয় প্রাণ-শক্তি আজও আমাদের অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণের মর্মে ও মজ্জায় সংহত হয়ে বিরাজ করছে। একথা রবীন্দ্রনাথের তৎকালরচিত 'নববর্ষ' প্রবন্ধটিতে (১৯০১) অতি বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।—

নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এখনও সঞ্চিত হইয়া আছে। দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোক-ব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্মরক্ষায় দৃঢ়তা দান করিয়াছে। শান্তির মর্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থিরশক্তিই

আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীন-হীনবেশী ভূষণহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারত-বর্ষের উপরে আপন বরাভয়হস্ত প্রসারিত করিবে। আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজি-স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাস-মাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ-সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী, তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর, আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন…যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্‌বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব ওই অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজূট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে,…তখন ওই সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গিহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ তাহা উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না…তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।

—নববর্ষ (১৯০১), 'ভারতবর্ষ'

এখানে দীনহীনবেশী ভূষণহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ যে শক্তির পরিচয় পাই, যা চিরন্তন ভারতবর্ষের আসল স্বরূপ, যা 'সময়কালে' ঝড়ের দুর্যোগের মধ্যে দীপ্তচক্ষু সন্ন্যাসীর বেশে ইংরেজি শিক্ষা ও শাসনের মোহজাল ছিন্নভিন্ন করে দশদিক উড়িয়ে দেবে, সেই শক্তি ও সেই সন্ন্যাসীই পরবর্তী কালে রবীন্দ্র-সাহিত্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীরূপে আবির্ভূত হয়েছে। উদ্‌ধৃত অংশটিতে যে

'সময়কাল' 'ঝড় এবং দুর্যোগের' কথা দেখা যায়, তার মধ্যেই অনতিদূরবর্তী বঙ্গবিপ্লবের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, দীনদরিদ্র ভারতবর্ষের অন্তরে যে শক্তি ও যে সম্পদ্ সঞ্চিত আছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে কামনা করেছেন।—

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয় ॥
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,
তোমারি মন্ত্র অগ্নিবচন,
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয় ॥
দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব ॥
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে-জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে-মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব ॥

—গীতবিতান ৩য় খণ্ড : জাতীয় সংগীত-১৩

ভারতবর্ষের এই যে দৈন্যভূষণ মহাতাপস-রূপ ধনঞ্জয় বৈরাগী তারই জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তার মুখ দিয়েই কবি আমাদের মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ অগ্নিবচন মহামন্ত্র শুনিয়েছেন।—

ওরে আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকলভাঙা এমন রাঙা
মূর্তি দেখি নাই ॥

যা হক, 'নববর্ষ'-প্রবন্ধে দীপ্তচক্ষু সন্ন্যাসীর যে রুদ্রমূর্তির বর্ণনা পাই ঝড়ের দুর্যোগের মধ্যে, সে মূর্তিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুলচিত্তে আহ্বান করেছেন কবিতার ছন্দেও।—

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপস-মূরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়নতারা
ঝলিছে অনলপারা,
সিক্ত তোমার জটাজূট হতে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া।
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার
আনিয়াছ সাথে করিয়া,
তাপস-মূরতি ধরিয়া ॥
নমি হে ভীষণ মৌন, রিক্ত,
এস মোর ভাঙা আলয়ে।
ললাটে তিলকরেখা,
যেন সে বহ্নিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড
বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়ো না, অতিথি,
সব ধন মোর না লয়ে।
এস এস ভাঙা আলয়ে ॥

—উৎসর্গ, ৪২

'নববর্ষ'-প্রবন্ধে বর্ণিত যে দীপ্তচক্ষু এবং লৌহবলয়-ও লৌহদণ্ড-ধারী সন্ন্যাসীর

পুনরাবির্ভাব ঘটেছে এই কবিতায়, সেই সন্ন্যাসীই পরবর্তী কালে আবার দেখা দিল ধনঞ্জয় বৈরাগী রূপে। তার হাতে লোহার দণ্ড ও বলয় নেই বটে, কিন্তু তার শান্ত মূর্তির অন্তরালে ওই লৌহের দৃঢ়তা রয়েছে তার সংকল্পশক্তির মধ্যে। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে—'সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, এক মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ধনঞ্জয়ের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং সজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্মরক্ষায় দৃঢ়তা দান করিয়াছে'। এস্থলে সেই বিশ্লেষণে আর অগ্রসর হব না।

৩

দেশের জনশক্তিকে জাগিয়ে সংঘবদ্ধ করবার এই যে আদর্শ এতদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের মনে ভাবরূপেই ক্রমবিকাশ লাভ করছিল, ১৯০৫ সালের বঙ্গবিপ্লবের সময়ে তাকে কার্যে রূপ দেবার সুযোগ এল। তিনি তখন এমন কতকগুলি গান রচনা করলেন যা নগরে গ্রামে সর্বত্র জনসাধারণের দ্বারা সহজেই গীত হতে পারে। সে-সব গানের সুর লৌকিক, উদ্দেশ্য লোক-জাগরণ এবং আশ্রয় আত্মশক্তি। সে গানগুলি যে গ্রন্থে প্রকাশিত হল তার নাম 'বাউল' (১৯০৫), তার অনেকগুলির সুরও বাউল। বাউলরাই দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিক ধর্মনায়ক, সহজ ভাবে সহজ সুরে তারা জনগণের চিত্তের স্বাভাবিক ধর্মভাবকে জাগরূক রাখে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই স্বাভাবিক লোকনেতারা যদি ধর্মশক্তির সহায়তায় জনজাগরণ ঘটাতে পারে, তাহলে তাকে ঠেকিয়ে রাখা কোনো রাজশক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। 'বাউল' গ্রন্থের গানগুলিতে এই আদর্শই পরিস্ফুট।—

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এতই শক্তিমান্,
তুমি কি এতই শক্তিমান্।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে
এতই অভিমান,
তোমাদের এমনি অভিমান।
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে,
এত বল নাইরে তোমার, সবে না সে টান,
তোমাদের সবে না সে টান।

শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরও,
হওনা যতই বড়, আছেন ভগবান্।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান,
তোদের ডুববে তরীখান॥

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।...
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই
তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে,
মোরা গড়ব ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রেগে মারবে ঘা রে
ততই যে ঢেউ উঠবে।
ওরে ততই যে ঢেউ উঠবে।
তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু,
জেগে আছেন জগৎ-প্রভু,
ওরা ধর্ম যতই দলবে, ততই
ধুলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে॥

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও ধনঞ্জয়ের গান ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই ভাব ও এই আদর্শই প্রকাশ পেয়েছে। মনে রাখতে হবে ধনঞ্জয়ও বাউল, সেও ধর্মনায়ক।

এই বঙ্গবিপ্লব-আন্দোলনের সময়েই রবীন্দ্রনাথ যে 'স্বদেশী-সমাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন, তার মূলেও ছিল আত্মশক্তিনিষ্ঠা এবং আত্মশাসন-প্রতিষ্ঠার সংকল্প। এখানে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার স্থান নেই। তবু এটুকু বলা প্রয়োজন যে, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে দিয়ে মাধবপুরের জনগণের মধ্যে যে রাজনিরপেক্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিপ্রতিষ্ঠার আদর্শ

দেখানো হয়েছে তার ব্যাবহারিক রূপের আভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সমাজ পরিকল্পনার মধ্যে।

৪

বঙ্গবিপ্লবের সুযোগে 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী' বলে রবীন্দ্রনাথ দেশকে যে পথে যে লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করতে চেয়েছিলেন, বিপ্লবের বান দেশের তরীকে সে পথে সে লক্ষ্যের দিকে চলতে দিল না। জনজাগরণ ও আত্মশক্তিপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আনন্দমঠের আদর্শ দেশের মুষ্টিমেয় অংশকে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও শক্তিপরীক্ষার পথে চালনা করল। তার পালে হাওয়া জোগাল তৎকালীন ঐতিহাসিক আলোচনা ও কতকগুলি ঐতিহাসিক নাটকের জনপ্রিয় অভিনয়। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা' 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি', দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার-পতন', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পদ্মিনী' 'নন্দকুমার' ও 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত নাটকগুলি তৎকালে দেশপ্রেমের উত্তেজনায় ও অস্ত্রঝনৎকারের আস্ফালনে যে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, তাতে তৎকালীন যুবসমাজে বাহুবলের উপরে আস্থাই বহুগুণে পরিবর্ধিত হয়েছিল, আনন্দমঠের আদর্শে 'দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে'র কল্পনাই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, দুর্বলের সংহতিশক্তির উপরে বিশ্বাসস্থাপনে সহায়তা করেনি : 'শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরও' কিম্বা 'একত্র দাঁড়াও দেখি সবে, যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে' একথা মানতে শেখায় নি। আত্মবিশ্বাসহীন নিছক বাহুবলের উপরে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল না, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মনোরম কল্পনা তাঁর চিত্তে প্রেরণাসঞ্চার করতে পারেনি। তিনি জানতেন, উৎপীড়িত দুর্বলের ভীতি এবং আত্মবিশ্বাসহীনতাই অত্যাচারীর আসল শক্তি, তার আসল অস্ত্র। ওই ভীতি দূর করে আত্মবিশ্বাস জাগাতে পারলেই প্রবল অত্যাচারীরও হাতের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়, একথা তিনি সারা জীবনই বিশ্বাস করে গেছেন। এই জন্যই তিনি বঙ্গবিপ্লবের সকল উত্তেজনা ও আন্দোলন থেকে দূরে সরে এসে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানি লিখলেন। এই নাটকে যে দেশপ্রেমের আদর্শ দেখানো হয়েছে, তা তৎকালীন সমস্ত জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক থেকেই পৃথক্। তার উপরে তৎকালস্বীকৃত আদর্শ 'বীর' প্রতাপাদিত্যকে

এই নাটকে দেখানো হয়েছে নিষ্ঠুর অত্যাচারীরূপে। ফলে নাটকখানি দেশের কাছে একান্ত ঔদাসীন্য ও অবহেলাই লাভ করল। নাটকখানি কোথাও অভিনীত তো হলই না, পাঠকসমাজও এটিকে উপেক্ষাই করল। রবীন্দ্রনাথের বৌ-ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসখানিও এক সময়ে নাট্যীকৃত হয়ে 'রাজা বসন্ত রায়' নামে পুনঃপুনঃ অভিনীত হয়েছে। কিন্তু 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র সে সৌভাগ্য কখনও হয়েছে বলে জানি না। এটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলে মনে করি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও আদর্শ এই নাটকেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে এবং পরববর্তী কালে এই আদর্শই সমগ্র ভারতবর্ষে জনজাগরণ ঘটিয়ে পরাধীনতার বন্ধনমোচনে সহায়তা করেছে।

'প্রায়শ্চিত্তের' প্রতাপাদিত্য কোনো বিশেষ দেশ বা কালের রাজা নয়; প্রতাপাদিত্য সর্বদেশ এবং সর্বকালের নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজপ্রতাপেরই প্রতীক; আর সে প্রতাপকে যে ভগবানের বলে আত্মার বলে প্রেমের বলে বলীয়ান্ হয়ে অস্বীকার করে প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়, তারই নাম ধনঞ্জয় বৈরাগী। ধনঞ্জয়ও প্রতাপের মতোই সর্বকালীন ও সর্বদেশিক। ধনঞ্জয় শুধু যে ধনের লোভ ও ধনের প্রতাপকে জয় করেছে তা নয়, সে মৃত্যুঞ্জয়ও বটে, দুঃখের ভয় ও মৃত্যুর ভয়কেও সে জয় করেছে আত্মার শক্তিতে। সে সমস্ত বিপদ্ ও সর্বনাশের আগুনকেও ভাই বলে বরণ করে নেয় হাসিমুখে। সে বৈরাগী, সমস্ত লোভ ও সম্পদের প্রতি অনাসক্ত। তাকে বশীভূত করতে পারে এমন প্রতাপ আজও পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি।

ধনঞ্জয়ের এই আদর্শই মানবপূজারী রবীন্দ্র-হৃদয়কে দেশব্যাপী উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার মধ্যে অবিচলিত রেখেছিল। তাই তিনি ওই আদর্শকেই বার বার আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। বঙ্গবিপ্লবের পরে ১৯০৯ সালে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে যে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে পাই, মহাত্মাপ্রবর্তিত সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ-বিপ্লবের পরে ১৯২২ সালে সেই ধনঞ্জয়কেই আবার পাই 'মুক্তধারা' নাটকে; সাত বৎসর পরে তাকে আবার পাই প্রায়শ্চিত্তের নবরূপ 'পরিত্রাণ' নাটকে, মহাত্মাপ্রবর্তিত দ্বিতীয় প্রতিরোধ-আন্দোলনের ঠিক প্রাক্কালে (১৯২৯)। রবীন্দ্রনাথ বার বার করে ধনঞ্জয়কে দেশের সামনে তুলে ধরেছেন, কারণ তার চরিত্রের মধ্যেই তাঁর রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনার আদর্শ মূর্তি পরিগ্রহ করে প্রকাশ পেয়েছে।

৫

আনন্দমঠ প্রকাশের (১৮৮২) পর পঁচিশ বছর যেতে না যেতেই তার আদর্শ দেশের চিত্তকে উদ্‌বেলিত করে তোলে এবং ভবানন্দ-জীবানন্দের কল্পিত আদর্শ দেশের ইতিহাসে জীবন্ত মূর্তিতে আবির্ভূত হয় বাঘা যতীন এবং সূর্য সেনের মধ্যে। আর, প্রায়শ্চিত্ত প্রকাশের (১৯০৯) পরে বারো বছর না যেতেই ধনঞ্জয় বৈরাগীর কল্পিত আদর্শও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে মূর্তিপরিগ্রহ করে আত্মশক্তি ও জনজাগরণের মন্ত্রে সমস্ত দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করে তাকে যেন যাদুশক্তিতে ঠেলে নিয়ে চলল মুক্তিস্বর্গের তোরণদ্বারের অভিমুখে। আমরা যে দেখেছি, তাঁর মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি তাঁর মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্মরক্ষায় দৃঢ়তা দান করেছে। আমরা আরও দেখেছি, এই যে 'দীনহীনবেশী ভূষণহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ শক্তি···তাহা বলিষ্ঠভীষণ, তাহা দারুণসহিষ্ণু উপবাসব্রতধারী, তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি জ্বলিতেছে'।

ভারতবর্ষের যা যথার্থ স্বরূপ, তা মূর্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে, আর ধনঞ্জয়ের মধ্যে যা ছিল ভাবাদর্শরূপে, তাই সজীব ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের মধ্যে। মহাত্মা গান্ধীকে দেখে ধনঞ্জয়কে অস্বীকার করবার আর উপায় নেই।

বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ

পঁচিশে বৈশাখ বাঙালির জাতীয় পুণ্য দিবসে পরিণত হয়েছে। বাঙালির জাতীয় জীবনে ঐ দিনটির একটি বিশেষ তাৎপর্য ও মর্যাদা আছে। একজন শ্রেষ্ঠ কবির জন্মদিন বলেই যে ওই দিনটি বিশেষ গৌরব অর্জন করেছে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ একজন বড় কবি বা মনীষীমাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাঙালির মনোজীবনেরই স্রষ্টা। বাঙালির জাতীয় জাগরণের প্রথম উদ্‌বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর পূর্বে কেউ সমগ্র বাংলা দেশকে আহ্বান করে বলেন নি, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম নিজের সত্তাকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছে। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাংলা তাঁর সাধনার ফলেই তার জাতীয় জীবনের অখণ্ডতাকে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ঘটেছিল বাংলার উদ্‌বোধন, আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাংলার অভ্যুদয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে বাঙালি শুনেছে তার জীবনযজ্ঞের ঋক্‌মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনেছে তার সামগান। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বঙ্গমন্ত্রের ঋষি, সে মন্ত্রের সংহত রূপ 'বন্দে মাতরম্‌'; আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা, সে মন্ত্রের পূর্ণ-রূপ হচ্ছে রাখিসংগীত— বাংলার মাটি বাংলার জল। এই রাখিমন্ত্র হচ্ছে 'বন্দে মাতরম্‌' মন্ত্রেরই কবিভাষ্য। এই রাখিমন্ত্রের যোগেই তিনি বাঙালির দেহে পরিয়েছিলেন রণক্ষেত্রের রক্ষাকবচ, তার হাতে বেঁধেছিলেন অচ্ছেদ্য মিলনসূত্র, আর তার জীবনাকাশে এনেছিলেন 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়'।

বাঙালির পণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান্‌।
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান্‌॥

—এই বঙ্গমন্ত্র আজ আমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত না হলেও আমাদের অন্তরের তন্ত্রীতে নিয়তই অনুরণিত হচ্ছে। আজ আমাদের কানে এই সাম-গীতির সুর ধ্বনিত না হলেও আমাদের প্রাণে চলেছে তার অবিরাম

অনুপ্রাণনা। এক সময়ে এই মন্ত্র বাঙালির কানের ভিতর দিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তার মর্মে। আর আজও আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হচ্ছে এই মন্ত্রের ছন্দেই। এই কথা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করে বলেই বাঙালি তার কবির মধ্যেই পেয়েছে তার স্রষ্টাকে এবং কবির জন্মদিবসকেই নিজের জন্ম-দিবস বলে অনুভব করে। এইজন্যই বাংলার নগরে গ্রামে যেখানেই আত্মোপলব্ধির কিছুমাত্র স্ফুরণ ঘটেছে সেখানেই এই কবিপুণ্যাহের উৎসব-অনুষ্ঠান আপনা থেকেই দেখা দিচ্ছে। কবির এই জন্মপুণ্যাহ বাঙালি জাতিরই জন্মপুণ্যাহ। বাংলা দেশের এই জাতীয় দিবসের পুণ্যানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বাঙালির জাতীয় জীবনস্পন্দনের সঙ্গে নিজের ব্যক্তি-জীবনের হৃৎস্পন্দনের ঐক্য স্থাপনের আগ্রহে আজ সকলেই উদ্‌গ্রীব।

এই আগ্রহে আমার হৃদয়ও চঞ্চল। আমার অন্তরের প্রেরণাও রয়েছে এর পিছনে। তখন আমার বয়স আট বৎসর। পূর্ববঙ্গের কোনো একটি ছোট শহরে থাকি ; নিজের ক্ষুদ্র পরিবারের বাইরে বৃহৎ দেশ সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। অবশ্য পাঠশালায় ছাত্রজীবনের কিছু কিছু স্বাদ পেয়েছি। এমন অবস্থায় পূজার ছুটি উপলক্ষে গিয়েছি মাতুলালয়ে, একটি অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র গ্রামে। হঠাৎ একদিন দেখলাম বাড়িতে বহু লোকজনের যাতায়াত, আলাপ-আলোচনায় প্রবল উৎসাহ। সে উত্তেজনার স্মৃতি এখনও মনে রয়েছে। শুনলাম বিকালে কি-একটা অনুষ্ঠান হবে, বহু লোকসমাগম হবে, সে অনুষ্ঠানে আমারও ডাক পড়বে। আমার হাতে একখণ্ড মুদ্রিত কাগজ দেওয়া হল ; তাতে ছিল একটি কবিতা, সেটি মুখস্থ করে বিকালে জনসমক্ষে আবৃত্তি করতে হবে। আরও একটা অভিজ্ঞতার স্মৃতি আজও মনে গাঁথা হয়ে আছে। জীবনে এই প্রথম দেখলাম বাড়িতে রান্না হল না ; সকলেই খই চিঁড়ে মুড়ি দুধ দই কলা খেয়ে দিন কাটালাম। আর, সকলের হাতেই হলদে সুতো বেঁধে দেওয়া হল ; আমার হাতেও। বিকালে আমার কল্পনার অতীত সংখ্যায় সমবেত জনের সমক্ষে বালককণ্ঠে আবৃত্তি করে গেলাম—বাংলার মাটি, বাংলার জল ইত্যাদি কবিতাটি। দেখলাম সকলের হাতেই কবিতাটি মুদ্রিত আছে একখণ্ড সুদৃশ্য কাগজে। তারপরে অনেকে উঠে অনেক কথা বললেন। তবে একজন বিশেষ বক্তা ফুলের মালা গলায় বহুক্ষণ ধরে প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে অনেক কথা বললেন। তাঁর কোনো কোনো কথা আজও
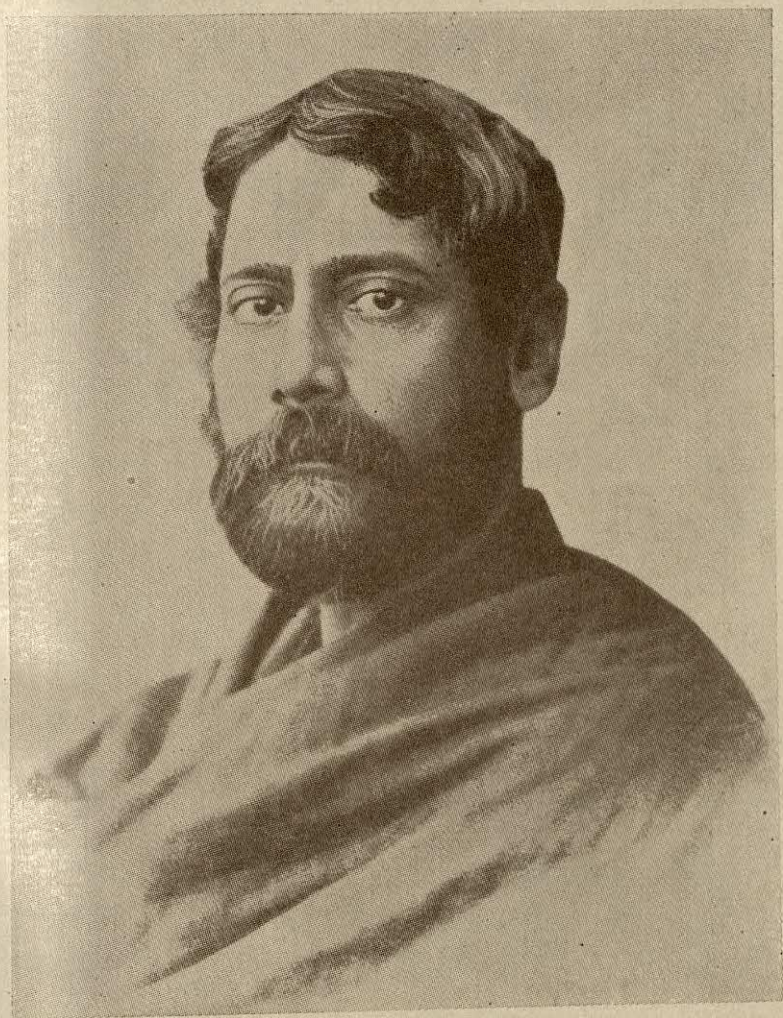
বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ
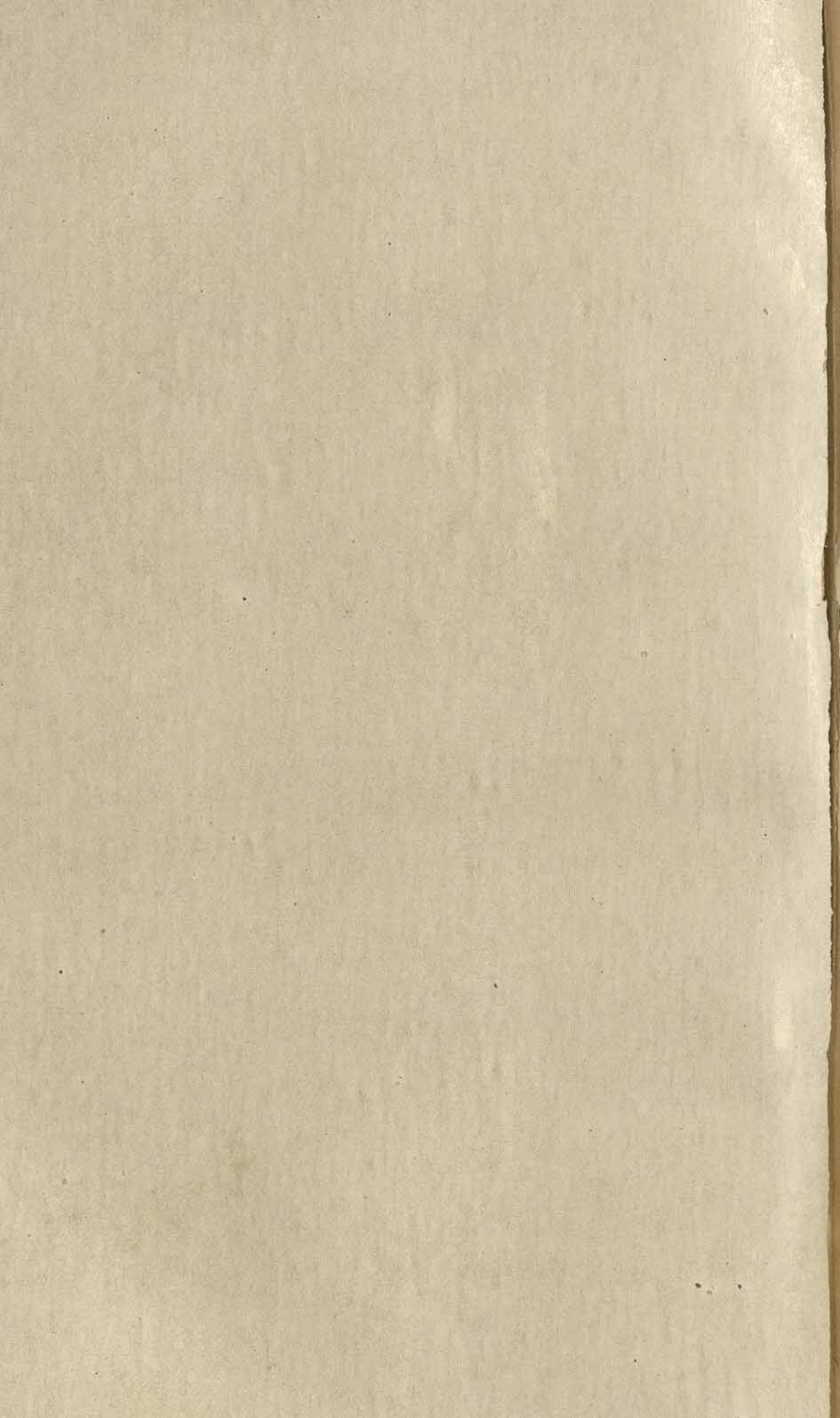
ভুলতে পারি নি। শুনলাম কেন আমাদের সকলেরই বিলেতি কাপড়, চিনি, নুন ও সিগারেট ছাড়া প্রয়োজন। সেই আমার হৃদয়ে সর্বপ্রথম অঙ্কুরিত হল বাংলাবোধ, স্বদেশ ও স্বজাতি-বোধ এবং দেশী-বিলাতি-পার্থক্যবোধ। সে বোধ তখন যতই অস্পষ্ট থাকুক না কেন সে অঙ্কুর কখনও শুকিয়ে যায় নি, যুগধর্মের প্রভাবে তা কালে কালে পল্লবিত ও পুষ্পিতই হয়েছে।

বলা বাহুল্য আমার এই বাল্যস্মৃতির উপলক্ষ হচ্ছে ১৩১২ সালের ৩০এ আশ্বিন অর্থাৎ ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবরে বাংলা বিভাগ এবং একতাবদ্ধ অখণ্ড বাংলার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সঙ্কল্প গ্রহণ! বাংলার জাতীয় জীবন সম্বন্ধে এই আমার প্রথম স্মৃতি। তার পূর্বে অবশ্য ৭ই অগস্টের (১৩১২ শ্রাবণ ২২) আলোড়নের কিছু কিছু ঢেউ গায়ে লেগেছিল। কিন্তু তার তাৎপর্য কিছুই বুঝিনি, শুধু ওই তারিখটার কথা পুনঃপুনঃ কানে এসেছিল সে কথা মনে আছে। কিন্তু তিরিশে আশ্বিনের স্মৃতিই আমার জীবনে স্বদেশ সম্বন্ধে প্রথম স্মৃতি ও গভীরতম স্মৃতি। পরবর্তী জীবনে আর কোনো স্মৃতিই গভীরতায় বা তাৎপর্যের মহত্ত্বে এই প্রথম স্মৃতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।

আমার জীবনে মন্ত্রের মতো কাজ করেছে যে কবিতাটি সেটি হচ্ছে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। তার পূর্বে অবশ্যই বাংলা পদ্যরচনা কিছু কিছু পড়ে থাকব, কিন্তু আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে তার কোনোটাই সঞ্চিত থাকে নি। কিন্তু সেখানে রত্নের মতো জ্বল জ্বল করছে বাংলার রাখিসংগীতটি। কিন্তু এই মন্ত্রের রচয়িতা কে, আমার হৃদয়ে বঙ্গানুভূতির উদ্বোধক কে, সে কথা জেনেছি অনেক কাল পরে।

অতঃপর ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকে একটি কবিতা পড়লাম যা আমার হৃদয়কে অবিস্মরণীয়রূপে মুগ্ধ করল। কবিতাটির প্রথমেই আছে—

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে ;

হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে ॥

বঙ্গভূমিকে মাতৃসম্বোধন! সে যে কি আলোড়ন তুলেছিল, কি অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল আমার হৃদয়ে,—ভক্তি প্রীতি না বিস্ময়?—তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। কবিতাটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই

প্রথম রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। আমার চিত্তে বঙ্গানুভূতি গভীরতর হল এবং তার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে থাকল রবীন্দ্রনাথের নাম।

১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগকে প্রতিরোধ করবার সঙ্কল্প নিয়ে বাঙালি জাতি দেশে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তাকে আন্দোলন মাত্র বললে ইতিহাসের তাৎপর্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে। সে আলোড়নের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে বিপ্লব। এই বঙ্গবিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয়, এক হিসাবে বলা যায় তিনিই ওই বিপ্লবের অন্তরে যথার্থ প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছিলেন। বঙ্গবিভাগের প্রতিরোধ চেষ্টা স্বভাবতই প্রবাহিত হচ্ছিল একমাত্র রাজনীতির খাতে। রবীন্দ্রনাথ তাকে সবলে আকর্ষণ করে চালিত করলেন সর্বাঙ্গীণ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পথে—সাহিত্যে সংগীতে শিল্পে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, এক কথায় বাংলার সমাজজীবনে। নিছক রাজনীতিক সংকীর্ণ ক্ষেত্র থেকে যখন সে জলস্রোত বন্যার রূপ ধরে বাংলার সামাজিক জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রকে প্লাবিত করে প্রবাহিত হল তখনই সে আন্দোলন বিপ্লবে পরিণত হল। এই বিপ্লবে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষতঃ সক্রিয় যোগ রক্ষা করেছিলেন অতি অল্প দিনই—১৯০৫ সালের কয়েক মাস মাত্র। কিন্তু স্বদেশআত্মার বাণীমূর্তিরূপে ওই বিপ্লবে শক্তি জোগাচ্ছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি"। শুধু বিশ্বভুবন নয়, স্বদেশকেও তিনি সত্যরূপে চিনেছিলেন গানের ভিতর দিয়েই এবং তাঁর স্বদেশবাসীকেও তিনি গানের দৃষ্টি দিয়েই স্বদেশকে চিনিয়েছিলেন। বঙ্গবিপ্লবের যুগে তিনি যে-সব গান রচনা করেছিলেন তার ভিতর দিয়েই বাঙালি সর্বপ্রথম অন্তর দিয়ে স্বদেশকে অনুভব করতে শিখেছিল।

এক সময় ছিল যখন তিনি নির্জীব নিষ্ক্রিয় বাঙালিকে ধিক্কারের আঘাতে জাগাবার চেষ্টা করতেন; আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচাবার ব্রতই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা দেশকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে।...

মুখ লুকাও মা ধূলিশয়নে
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে ॥
—'কড়ি ও কোমল', বঙ্গভূমির প্রতি

বাঙালিকে ধিক্কার দিয়ে বললেন—

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
একি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা ॥
—'কড়ি ও কোমল', বঙ্গবাসীর প্রতি

তার এই বেদনার কারণ এই।—

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কইরে বাঙালি কই ?
—'কড়ি ও কোমল', আহ্বান গীত

অতঃপর বাঙালিকে জাগাবার ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করলেন—

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।……
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান জিনে দাও তুমি ॥
—'কড়ি ও কোমল', আহ্বান গীত

মানসী কাব্যের যুগেও দেখি 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর'

প্রভৃতি কবিতায় 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব' বলে 'কথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান'কে অজস্র ধিক্কার দিচ্ছেন। তার কারণ এই।—

দূর হোক এ বিড়ম্বনা,
বিদ্রূপের ভান,
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনাভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয় তলে
সরমতাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান॥

—'মানসী', দেশের উন্নতি

'সোনার তরী'র যুগেও ওই একই বেদনা একই ভাবনা কবির চিত্তকে আলোড়িত করেছে।—

জগৎমাতানো সংগীত-তানে
কে দেবে এদের নাচায়ে?
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দেবে এদের বাঁচায়ে!……
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ?

—'সোনার তরী', বিশ্বনৃত্য

এর পরেও বহুকাল 'শীর্ণ শান্ত সাধু' প্রকৃতির নির্জীব বাঙালি-চরিত্র তাঁর হৃদয়কে পীড়া দিয়েছে। তাই তিনি স্বদেশকে সম্বোধন করে বলেছেন—

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিও না ধরে।

—'চৈতালি', বঙ্গমাতা

এই রচনাটিতেই বাঙালিচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অন্তরের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে সব চেয়ে বেশি। 'রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি' এই উক্তির মধ্যেই দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্ষোভ ও বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। কল্পনা কাব্যের যুগেও দেখি 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'মাতার আহ্বান', 'সে আমার জননীরে' প্রভৃতি রচনাতে ওই একই দুঃখ গভীরতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

অবশেষে বাংলার মুমূর্ষু দেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা দিল, বাঙালির স্রোতো-বেগহীন জীবনধারায় জোয়ার এল বঙ্গবিভাগ-প্রতিরোধের সঙ্কল্পকে উপলক্ষ করে। বলা বাহুল্য, এ ঘটনা আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। তার আয়োজন চলছিল দীর্ঘকাল ধরেই। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত বহু কণ্ঠের আহ্বানে বাঙালির জাতীয় জীবনে জাগরণের লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছিল। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠের প্রভাব কারও চেয়ে কম ছিল না। এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার যোগে বাঙালিকে স্ব-রূপ দর্শনে প্রবৃত্ত করেছিলেন। তার পর উনবিংশ শতাব্দীর সূর্য রক্তমেঘমাঝে অস্ত যাবার পরে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই নূতন পরিবেশে তিনি বঙ্গদর্শনের সহায়তায় বাঙালিকে বঙ্গের নূতন রূপ দর্শন করাতে প্রবৃত্ত হলেন। এমন অবস্থায় বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে বাঙালির চিত্তে জীবনের ধারা প্রবাহিত হল বন্যার বেগ ধরে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের ক্ষোভ দূর হল; উল্লসিতচিত্তে তিনি বাঙালির জীবনজোয়ারে বেগ সঞ্চার করতে লাগলেন। তিনি গান ধরলেন—

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী।
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে,
খুলে ফেল সব দড়াদড়ি।
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে,
যা হয় হবে বাঁচি মরি॥

এক সময় ছিল যখন সাত কোটি কুসন্তানের জননী দীনহীনা দুঃখিনী বঙ্গ-মাতৃকার মঙ্গলমূর্তি দেখে তাঁকে লজ্জিতচিত্তে বলতে হয়েছিল 'নতশির কবি-চক্ষে ভরি আসে জল'। কিন্তু ১৯০৫ সালের বাংলার নূতন রূপ দেখে তাঁর হৃদয়ভার লঘু হয়ে গেল। এই প্রথম তিনি পরিপূর্ণ আবেগে গান ধরলেন—

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলে জননী !…
কোথা সে তোর দরিদ্রবেশ,
কোথা সে তোর মলিন হাসি,
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি ।
আজি দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে
ভাসাও তরণী ।
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে,
হৃদয়-হরণী ।
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে
আঁখি না ফিরে ।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেল
সোনার মন্দিরে ॥

বঙ্গ-বিভাগের দুর্দিনে বাংলাদেশের শক্তিমূর্তি দেখে, 'নিদ্রারসে ভরা' বাঙালির জাগ্রত ও উদ্যত রূপ দেখে তিনি উল্লসিতচিত্তে সেই বঙ্গবিপ্লবের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করতে লাগলেন তাঁর গান দিয়ে, তাঁর বাণী দিয়ে। সে গান ও বাণীর বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা সঙ্গত যে, ওই বিপ্লবের বহু কার্যকলাপ তিনি পছন্দ করেননি, ফলে দেশনায়ক হিসাবে তিনি তার সঙ্গে সক্রিয় সংযোগ রাখেন নি। কিন্তু ভুল হক, ভ্রান্তি হক, তবু বাঙালি যে জেগেছে, তাতেই তাঁর আনন্দ, তাতেই তাঁর কবিচিত্ত পরিতৃপ্ত। ফলে দেখতে পাই একদিকে তিনি সমালোচকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তখনকার দিনের কার্যক্রমের বিচারবিশ্লেষণ করছেন, 'সফলতার সদুপায়' সম্বন্ধে পথ-নির্দেশ করছেন, দেশের মধ্যে আত্মশক্তি জাগাবার ও স্বদেশী-সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করছেন এবং অপরদিকে বিপ্লবযুগের কবিনায়কের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে জাতীয় অভ্যুত্থানের পালে ঝড়ের বেগ জুগিয়ে চলেছেন। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে ডেকে বললেন—

এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা
হাতে হাতে ধর গো,
আজ আপন পথে ফিরতে হবে,
সামনে মিলন-স্বর্গ।...
আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে,
দেরি কেন করিস তবে,
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে,
মরতে হয় তো মর গো॥

নির্যাতিত দেশকর্মীদের লক্ষ করে তিনি বললেন—

বাংলাদেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে ভূষিত করিয়াছে।...তাঁহাদের জীবন সার্থক।

অতঃপর বাংলার বিপ্লবপ্রবাহ যখন রুদ্ররূপ ধারণ করল, তখনও তিনি দ্বৈত বাণী উচ্চারণ করছেন, দেশকে সত্যপথের নির্দেশ দিচ্ছেন, আর দেশের সম্মুখে তুলে ধরছেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর আদর্শ। পক্ষান্তরে দূর ঈশানের কোণে আকাশে ঘন-ঘোর মেঘোদয় দেখে তাঁর কবিচিত্তে শতবরণের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো বিকশিত হয়ে উঠল। স্মরণীয় 'দুর্দিন' কবিতাটি।—

ঐ আকাশ-পরে আঁধার মেলে
কি খেলা আজ খেলতে এলে,
তোমার মনে কি আছে তা জানব না।
আমি তবুও হার মানব না, হার মানব না।
তোমার সিংহভীষণ রবে,
তোমার সংহার-উৎসবে,
তোমার দুর্যোগ-দুর্দিনে

তোমার তড়িৎশিখায় বজ্রশিখায় তোমায়
লব চিনে ;
কোনো শঙ্কা মনে আনব না গো আনব না।
যদি সঙ্গে চলি রঙ্গভরে
কিম্বা পড়ি মাটির পরে
তবুও হার মানব না, হার মানব না।
আজ আঁধারে ঐ শূন্য ব্যেপে
কণ্ঠ আমার ফিরুক কেঁপে,
জাগিয়ে তোলো ঝঞ্ঝা ঝড়ের ঝঞ্ঝনা ॥

অরবিন্দের কারাবরণ-উপলক্ষে তাঁকে অকুণ্ঠকণ্ঠে নমস্কার জানিয়ে বললেন—

দেবতার দীপ-হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে ? বন্ধন-শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার,
কারাগার করে অভ্যর্থনা।...
তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্ঝা-সাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণ-পিঞ্জর টুটি, বজ্র-গর্জরব
ভেরীমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব,
এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ-মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার ॥

ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে তিনি দেশবাসীকে শোনালেন—

ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝঙ্কার।
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার।

অঙ্গ বেড়ি দিল বেড়ী
বিনা দামের অলঙ্কার।
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর ॥

এই অভয়সংগীতেরই আর এক রূপ এই—

ওরে আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই ;
তোমার শিকল-ভাঙ্গা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।
তুমি দুহাত তুলে আকাশপানে
মেতেছ আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারী যাই ॥

'মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ অভয়মন্ত্রে'র যে কবি একদিন পঞ্জাব-মহারাষ্ট্রের কাহিনী অবলম্বন করে বাঙালির সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন বন্দী বীরের আদর্শ —'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন'—সে কবি আজ বাংলাদেশের পূর্ব-গগনে দুর্দিনের মেঘগর্জন শুনে তাকেই 'সুপ্রভাতের রাগিণী' বলে বরণ করে নিলেন, আর বাঙালিকে শোনালেন নব-যুগের অভয়মন্ত্র—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,—
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'
হে রুদ্র, তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী,
মরণ-নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয়-ডমরু বাজাবো,
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাবো ॥

এসব বাণীর তাৎপর্য সুস্পষ্ট। এসব বাণী এককালে বাঙালির হৃদয়ে কি অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, তা আজ আর অবিদিত নাই। যে বাঙালিকে একদিন তিনি 'চিরশিশু' ও অ-মানুষ বলে ধিক্‌কার দিয়েছিলেন,

১৯০৫ সাল থেকে সেই বাঙালিকেই তিনি চালনা করলেন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমরত্ব লাভের পথে।

সেই ১৯০৫ সালের পরে দীর্ঘকাল বিগত হয়েছে। এই দীর্ঘ ব্যবধানের পরেও আজ বঙ্গবিভাগ-প্রতিরোধে সঙ্কল্পবদ্ধ বাঙালি জাতির কবিনায়ক রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে। বাংলার আজ বড়ই দুর্দিন। এখন বাংলা দ্বিধাবিভক্ত নয়, বহুধা-বিভক্ত। এই দুর্দিনে বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতাকে—"Thou shouldst be living at this hour" বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলব না। কারণ তাঁর বাণী এখনও আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে, তাঁর প্রেরণা এখনও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় নি। বর্তমানকালে তাঁকে স্মরণ করবার তিনটি দিন প্রশস্ততম। এক, তাঁর জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ। যে কবিনায়ক আমাদের শুনিয়েছেন 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ,' তাঁর জন্মদিন বাঙালি জাতিরই জন্মদিন বলে স্বীকার্য। দুই, ৭ই অগস্ট বা ২২শে শ্রাবণ। অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে এই দিনেই বাঙালি বিভাগ-প্রতিরোধের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। আবার এই দিনেই রাখি-পূর্ণিমার অবসানে রাখি-বন্ধনের প্রবর্তক ও বঙ্গমন্ত্রের দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটে। তিন, ১৬ই অক্টোবর বা ৩০এ আশ্বিন। এই দিনেই বিদেশী সরকারের হুকুমে বাংলা বিভক্ত হয় এবং এই দিনেই বাঙালি পরস্পরের হাতে মিলনসূত্র বেঁধে দিয়েও সমবেত কণ্ঠে বাংলার ঐক্যমন্ত্র উচ্চারণ করে বিভাগ প্রতিরোধের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে বঙ্গকবি নিজে জেগে উঠে মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুকে প্রাণ দিয়েছিলেন, বাংলার প্রাণদাতা সেই কবির জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে বাঙালিচিত্ত যে একাগ্র হয়ে ওঠে সেটাই আমাদের পরম আশার কথা।

জনজাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ

বনেদি জমিদারবংশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, আভিজাত্যের সহজাত কবচ নিয়েই তাঁর আবির্ভাব। তাঁর সাহিত্যেও সৌন্দর্য-বিলাসের অতিমুগ্ধতার অভাব নেই। বস্তুতঃ তাঁর রচনায় বাস্তব জীবনের কঠোরতার স্পর্শলেশহীন নিছক ভাববিলাসের এত প্রাচুর্য আছে যে, এক সময়ে সাধারণ পাঠক এটাকেই রবীন্দ্রসাহিত্যের (এমন কি রবীন্দ্রচরিতেরও) মুখ্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করত। এই বিশিষ্টতা 'রবিয়ানা' নামে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। আধুনিক কালে 'রবিয়ানা'র অভিযোগের কথা শোনা যায় না বটে। কিন্তু অভিযোগটা যে নেই তা নয়, এটা রূপান্তর এবং নামান্তর পরিগ্রহ করেছে মাত্র। এখন তার নাম হয়েছে escapism বা পরিহারপ্রবণতা। এক শ্রেণীর বাস্তবপন্থীর মতে রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে বাস্তবজীবনের দুঃখবেদনা, রূঢ়তা কঠোরতাকে অস্বীকার ও পরিহার করে চলার প্রয়াস। প্রতিপক্ষ অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে 'স্বর্গ হইতে বিদায়'এর কবি ইত্যাদি বলে এবং

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

ইত্যাদি বহু নজির তুলে রবীন্দ্রসাহিত্যের অতিবাস্তববিমুখতা ও সুস্পষ্ট ইহপরায়ণতার প্রমাণ দিয়ে উক্ত অভিযোগ খণ্ডন করতে কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু অভিযোক্তারা তাতে সন্তুষ্টও হননি, নিরস্তও হননি। আজকালকার যুগটা হচ্ছে শ্রেণীসংঘাত ও ধনসাম্যবাদের যুগ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ধনী অভিজাত শ্রেণীর বিশিষ্ট প্রতিনিধি; তাঁর জন্ম, বৃত্তি ও শিক্ষাদীক্ষাই তাঁকে ওই শ্রেণীর গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। সমাজের নিম্নতম স্তরে নিপীড়িত সর্বহারাদের বেদনা অনুভব করার কোনো স্বাভাবিক উপায় তাঁর ছিল না। তাই তাঁর সাহিত্যও শ্রেণী-বিশেষের সাহিত্য হয়েই রইল, জনগণের বাস্তব জীবনের সংস্পর্শ পেয়ে বৃহত্তর ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভের অবকাশ পেল না। রবীন্দ্রসাহিত্যের এই অভাবের দিক্‌টাকে ফলাও করে দেখবার প্রয়াস অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। এই অভিযোগের মধ্যে কতটা সত্য আছে বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

১

রবীন্দ্রপ্রতিভার একটা প্রধান লক্ষণই হল তার বহুমুখীনতা। মানুষের মনে যত রকম চিন্তা ও অনুভূতি দেখা দেয় তার প্রত্যেকটাই তাঁর চিত্তে ও কল্পনায় কিছু না কিছু স্পন্দন জাগিয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো কবির রচনায় এত অজস্র অনুভূতিবৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে কিনা জানিনা। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যে বহু বিপরীতধর্মী ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। হাসিও আছে, অশ্রুও আছে; ভোগের লালসা ও ত্যাগের মহিমা—কোনোটারই অভাব নেই; ঐকান্তিক ভগবদ্‌ভক্তি এবং মানবানুরক্তি দুই-ই সমান মর্যাদা পেয়েছে; ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বস্থাপনেও গভীর আগ্রহ দেখা যায়, আবার শূদ্রের অধিকার প্রচারের নিষ্ঠাও কম নয়; ধনী-সম্প্রদায়ের জীবন তাঁর সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও নিঃস্বদের বেদনাও তাঁর হৃদয়কে কম আন্দোলিত করেনি। এই অবস্থায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোনো একটা বিশেষ দিকের উপর অতিমাত্র ঝোঁক দিলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। যে যুগ এবং পরিবেশের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তার প্রভাবের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। সে প্রভাবের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহিমান্বিত শান্তি ও শৃঙ্খলা, তারই আওতায় নবসৃষ্ট জমিদারশ্রেণীর আভিজাত্য ও নিশ্চিন্ত ঐশ্বর্যভোগ, ক্রমবিকাশমান নূতন রাজধানীর নব্য নাগরিকতার আকর্ষণ এবং সর্বোপরি ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় যুগের রোমান্টিক সাহিত্যের মোহবিস্তারী ইন্দ্রজাল, কোনোটাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে জনমুখীনতা সৃষ্টির অনুকূল ছিল না। তার উপরে এল 'art for art's sake' মতবাদের সর্বনেশে প্রভাব। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই মতবাদের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। সুতরাং তৎকালীন রবীন্দ্রসাহিত্যে সর্বহারাদের জীবনসংগীতের প্রতিধ্বনি আশা করাই অন্যায়। কিন্তু তথাপি দুর্গতদের দুঃখলাঞ্ছনা ক্ষণেক্ষণেই তাঁর অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে বেদনার আলোড়ন জাগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন কেটেছে শহরে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। তাই তাঁর তখনকার জীবনে লোকসংস্পর্শের প্রভাব ঘটার অবকাশ হয়নি। সে প্রভাব দেখা দেয় পরবর্তী জীবনে শিলাইদহে, 'সাধনা'র যুগে। তাই লোকজীবনের চিত্র পাই সে

সময়কার গল্পগুচ্ছে, চিঠিপত্রে এবং কাব্যেও। লক্ষ করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও সুখদুঃখের প্রতি তাঁর চিত্ত উত্তরোত্তর বেশি করেই আকৃষ্ট হয়েছে। জন-কল্যাণের জন্য তিনি যে কতখানি ভেবেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানতঃ তাঁর গদ্য রচনায় ও তাঁর কার্যকলাপে। কিন্তু দুর্গতদের দুঃখ তাঁর হৃদয়কে কিভাবে আন্দোলিত করেছে তার সাক্ষ্য আছে তাঁর কাব্যে। বর্তমান আলোচনায় প্রধানতঃ এই কাব্যরচনার সাহায্যেই জনগণের প্রতি তাঁর মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করব।

'কড়ি ও কোমল' যখন প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স পঁচিশ বৎসর। তখনই ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য তাঁর চিত্তকে কিভাবে পীড়িত করেছিল তার পরিচয় রয়েছে এই কাব্যের 'কাঙালিনী' কবিতায়।—

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।...
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
দেখিবারে আনন্দের খেলা।...
ভাবিতেছে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে,
আমি তো ওদের কেহ নই।

দরিদ্রের এই দুঃখ কবির চিত্তে কি প্রতিবেদনা সৃষ্টি করেছে তাই বিশেষ করে লক্ষ করার বিষয়।—

ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি;
দুয়ারেতে সজল নয়ন—
এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি।
আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার—
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নেই আর।...

দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লান মুখে বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকারশাখা
তবে মিছে মঙ্গলকলস ॥

—'কড়ি ও কোমল', কাঙালিনী

এই বাণী রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণী। চৈতালি কাব্যের 'দেবতার বিদায়', 'পুণ্যের হিসাব', 'বৈরাগ্য', 'সামান্য লোক' প্রভৃতি কবিতায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সামান্যতাই অসামান্যতার আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সামান্য চাষীর সুখদুঃখ, স্নেহপ্রেম, ক্ষেত, গোরু, চাষবাস ইত্যাদিও কবির দৃষ্টিতে অপূর্ব রূপে দেখা দিয়েছে। আর, 'কর্ম' কবিতাটি মনিবের মূঢ় দাম্ভিকতার প্রতি কঠোর ধিক্‌কার এবং কন্যার মৃত্যুতে নীরব শোকাচ্ছন্ন ভৃত্যের প্রতি গভীর অনুকম্পায় অপূর্ব মাধুর্য লাভ করেছে। সামান্য পরিচারকের মধ্যেও যে মহৎ মনুষ্যত্বের চিরন্তনতা রয়েছে, কবির অনুভূতি-স্পর্শে তা কতখানি গভীরতা লাভ করতে পারে, তার আর-এক পরিচয় পাই চিত্রা কাব্যের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায়। কিন্তু ধনী-দরিদ্রের সম্পর্কের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা ও গ্লানি আছে তা কঠোর ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে 'দুই বিঘা জমি' কবিতায়। জমিদারবাবুরা চাষী প্রজাদের ধনসম্পদ কিভাবে অপহরণ করেন তার অকুণ্ঠ বর্ণনা পাই এই কবিতাটিতে। এই পরস্বাপহারী দাম্ভিকদের ঔদ্ধত্যও ফুটে উঠেছে এই রচনাটির লাইনে লাইনে। কিন্তু ধনীদরিদ্রের সম্পর্কের বাস্তবতাকে রবীন্দ্রনাথ অমরতা দান করেছেন দুটি পংক্তিতে।—

এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

এর চেয়ে কঠোর ভাষা কোনো রাজনীতিকও ব্যবহার করেছেন কিনা সন্দেহ। রাজারা কাঙালের ধন চুরি করেই ক্ষান্ত হন না, নিজে সাধু সেজে চোর অপবাদটাও চাপিয়ে দেন ওই কাঙালেরই উপরে। একথাও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলতে ভোলেননি।

দরিদ্রের দুঃখের প্রতি রাজকীয় অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের আরও পরিচয় পাই 'রাজা ও রানী' নাটকে।—

শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।
অভদ্র অসভ্য যত বর্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়।
দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজও তার অনশন হল না অভ্যাস,
এমনই আশ্চর্য!

ক্ষুধিত দরিদ্রের প্রতি এই রাজকীয় ব্যঙ্গোক্তির মধ্যেই ধনিকের হৃদয়হীনতা অব্যর্থ ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে।

'কথা'কাব্যের 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটিতেও দরিদ্রের প্রতি অভিজাত-শ্রেণীর নির্মমতা নিষ্ঠুরভাবে ফুটে উঠেছে। রাজৈশ্বর্যের মধ্যে দৈন্যের দুঃখ যে কি, তা বোঝাও সম্ভব নয়। তাই কবি বলেছেন—

যতদিন তুমি আছ রাজরাণী
দীনের কুটিরে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি।

দরিদ্রের দুঃখ বুঝতে হলে দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় চাই। তাই—

রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া,
ভিখারী নারীর চীরবাসখানি
দিল রানীদেহে তুলিয়া।

মনুষ্যত্বের প্রতি অবজ্ঞাময় রাজকীয় ঐশ্বর্য ও দম্ভকে কবি কি চোখে দেখতেন তার একটি প্রমাণ পাই 'দীনদান' কবিতাটিতে। রাজা বিশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দেবমন্দির নির্মাণ করেছেন। কিন্তু সাধু নরোত্তম সে মন্দিরকে উপেক্ষা করে তরুতলেই নামকীর্তন করছেন। রাজা যখন আহত অহমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে এর কারণ জানতে চাইলেন—

শান্তমুখে সাধু কহে—'যে-বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়...
সে বৎসর

বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সেদিন কহিলা ভগবান,
…দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান!' চলি গেলা সেইক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীনসাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্রতলে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়,
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ্।"

—'কথা ও কাহিনী', দীনদান

সম্মানিত অভিজাতসম্প্রদায় জনসাধারণকে অবজ্ঞার দ্বারা দূরে ঠেকিয়ে রেখে নিজেকে কলুষস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যগ্র। কিন্তু সচল জনতার প্রবাহই হচ্ছে আসল জীবনপ্রবাহ। সে জনতাকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে অভিজাতরা নিজের জীবনকেই ব্যর্থ করে তোলেন। কবির পরিণত বয়সের রচনায় একথা নিঃসন্দিগ্ধ সবল ভাষায় পরিস্ফুট হয়েছে।—

উচ্চ প্রাচীরে রুদ্ধ তোমার শুভ্র ভুবনখানি,
হে মানী, হে অভিমানী।
মন্দিরবাসী দেবতার মতো সম্মানশৃঙ্খলে
বন্দী রয়েছ পূজার আসনতলে।
সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে নিজেরে পৃথক্ করি
আছ দিনরাত গৌরবগুরু কঠিন মূর্তি ধরি।
সবার যেখানে ঠাঁই।
বিপুল তোমার মর্যাদা নিয়ে সেথায় প্রবেশ নাই।
অনেক উপাধি তব
মানুষ উপাধি হারায়েছ শুধু
সে ক্ষতি কাহারে কব॥
হে রাজা, তোমার পূজাঘেরা মন
আপনারে নাহি জানে।

প্রাণহীন সম্মানে
উজ্জ্বল রঙে রঙ-করা তুমি ঢেলা,
তোমার জীবন সাজানো পুতুল
স্থূল মিথ্যার খেলা।
আপনি রয়েছ আড়ষ্ট হয়ে আপনার অভিশাপে,
নিশ্চল তুমি নিজ গর্বের চাপে।
সহজ প্রাণের মান নিয়ে যারা মুক্ত ভুবনে ফিরে,
মরিবার আগে তাদের পরশ লাগুক তোমার শিরে ॥

—'পরিশেষ', মানী

ধনাভিজাত্যের প্রতি এই যে বিরূপতা এবং সাধারণজনের সহজ প্রাণের প্রতি এই যে আগ্রহ, এটা শুধু কল্পনাপ্রবণ কবিমনের ক্ষণিক আবেগমাত্র নয়। এর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিমনের আন্তরিকতা নিঃসংশয়ে অনুভব করা যায়। বিরাট্ জনতার কর্মনিরত বাস্তবজীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে যে রোমান্টিক কাব্যবিলাস, কবির চিত্ত তাতে অপরিতৃপ্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। এক দিকে যেমন তিনি স্বর্গীয়তা থেকে বিদায় নিয়ে পার্থিবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি অন্যদিকে কাব্যবিলাসকে বিদায় দিয়ে বাস্তব জীবনের কর্মসাধনাকে বরণ করে নেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এই মোড় ফেরার কথা তাঁর বিখ্যাত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় অবিস্মরণীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সুপরিচিত রচনাটি থেকে কোনো অংশ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবু সম্পূর্ণতার খাতিরে কয়েক লাইন তুলে দিলাম।—

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। —ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা ?…স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।…
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,

বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, রুদ্ধ অন্ধকার।
…এ দৈন্য মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।
যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আজি দান ॥

এই আন্তরিকতা পরবর্তী কালে আরও সহজ, সরল ও স্পষ্টতর রূপ নিয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন দেশপ্রীতির বান ডেকেছে তখন রবীন্দ্রনাথ গান ধরলেন—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

শুধু যদি আকাশ-বাতাসের কথাই থাকত তাহলে এটাকে অবাস্তব কবিত্বমাত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া চলত। কিন্তু তারপরেই আছে—

ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী।

কবিহৃদয়ের এই গভীর অনুভূতি পরবর্তী কালে তাঁর ধর্মবোধকেও প্রেরণা দিয়েছে। ফলে রবীন্দ্রনাথ অতিজাগতিকতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রাত্যহিক সামান্যতার মধ্যেই যথার্থ ধর্মের সন্ধানে ব্যগ্র হয়েছেন। সমাজে যারা অধম, যারা দীনদরিদ্র, তারাই সমাজকে ধারণ করে রেখেছে। তাদের জীবন-সাধনাই যথার্থ ধর্ম। যে ধর্ম সে-সাধনাকে অস্বীকার করে সে ধর্ম আধ্যাত্মিক বিলাস মাত্র, সে ধর্ম মিথ্যা।—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে।
অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে।
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ॥—গীতাঞ্জলি, ১০৭

ধর্মাভিজাতে…র এই ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি।

সত্য-সাধনার পথ যে অনভিজাতের কর্মজীবনের তুচ্ছতার মধ্য দিয়েই চরম সার্থকতার দিকে এগিয়ে গেছে, একথাও তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন।—

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারোমাস।
রাখোরে ধ্যান থাকরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥

শ্রমের মহিমা আর কারও কাছে এর চেয়ে বেশি মর্যাদা পেয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু শ্রমের মহিমাকে শুধু বাগ্‌বিস্তারের দ্বারা স্বীকার ও প্রচার করলেই তো সব কর্তব্য শেষ হয় না। সবার পিছে, সবার নীচে যে সর্বহারা শ্রমিকদের স্থান, সমাজব্যবস্থায় তাদের উন্নতিবিধান করা চাই তাদের দুঃখকষ্ট ও লাঞ্ছনার প্রতিকার চাই। তাদের দৈন্য-দারিদ্র্যের মধ্যে শুধু 'স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি' নিয়ে এলেই চলবে না। কেননা তাদের দুঃখ-দৈন্য অত্যন্ত বাস্তব, নিছক ভাবগত নয়। তাদের জন্য—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।

২

কিন্তু এসবের ব্যবস্থা করবে কে? কৃপা করে অনুকম্পা করে সর্বহারাদের দুঃখমোচনের চেষ্টা করলে, তাতে করে তাদের অপমানের বোঝাকেই বাড়িয়ে তোলা হবে। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই আত্মশক্তির উপাসক। জনসমূহের মধ্যে তাঁর নিজের শক্তি জাগিয়ে তোলা চাই। রবীন্দ্রনাথের মতে—

শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেটা সত্যকার কারবার হয়। এই সত্যকার কারবারে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিক্‌রা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুইপক্ষের

সম্বন্ধ সত্য হইয়া উঠিবে।...আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে। ইহাতে তাহারা ভদ্র-সাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্ন শ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা।"

—'কালান্তর', লোকহিত

জনশক্তি জাগাবার ব্যবস্থা হলেই তাদের দুঃখদৈন্যেরও অবসান ঘটবে। আধুনিক কালে অনেকেই মনে করেন জনচেতনা-সঞ্চারের অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে জনসাহিত্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এ রকম কৃত্রিম জনসাহিত্য রচনার সার্থকতা স্বীকার করেননি।

আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, ঐসব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব, তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙাকুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে।

—'কালান্তর', লোকহিত

এটা হচ্ছে ১৯১৪ সালের কথা। বহুকাল পরে জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসেও রবীন্দ্রনাথ অধিকতর জোরের সঙ্গে এই কথা বলে গিয়েছেন।—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।

সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি ॥

—জন্মদিনে, ১০

রবীন্দ্রনাথের মতে দেশের দুর্গত জনসাধারণের দৈন্য ঘোচাবার প্রধান উপায় শিক্ষা। এই শিক্ষার দুই রূপ। প্রথমতঃ, শ্রদ্ধাপূর্বক সম্ভ্রমপূর্বক তাদের জানতে হবে, অনুগ্রহ বা অনুকম্পা করে নয়। তাদের ভালো করে জানতে শিখলে আমরা নিজেরাই উপকৃত হব।

> আমাদের শিক্ষিত লোকেরা প্রকৃত জনসাধারণের কোন খবরই রাখেন না। তাঁহারা একথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে—নূতনকালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না।…মানবসাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে, পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে।

শ্রদ্ধার সঙ্গে এই শিক্ষালাভ করলেই তবে জনসাধারণের হীনতা ও দুর্গতি ঘোচাবার যোগ্যতা হয়। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণকেই শিক্ষিত করে তুলতে হবে ; শিক্ষিত-অশিক্ষিতের পার্থক্যের আকারে যে নূতন জাতি-ভেদ দেশে দেখা দিয়েছে তা ঘোচাতে হবে—নতুবা উচ্চশ্রেণী বা নিম্নশ্রেণী কারও কল্যাণ নেই। সমগ্র দেশে যে শিক্ষা ও বুদ্ধির দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জোরে জাতীয় অকল্যাণকে দিন-দিন বাড়িয়ে তুলছে, তার গুরুত্ব দেশব্যাপী অন্ন-দুর্ভিক্ষের চেয়ে কম নয়, বরং শিক্ষা ও বুদ্ধির দুর্ভিক্ষের ফলেই অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব দেখা দিয়েছে এবং উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে। এই অকল্যাণকে রোধ করতে হলে "তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানেই অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।" সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। তাই শিক্ষাকে ইস্কুল কলেজের বাইরে দেশের যারা পনেরো আনা সেই বিরাট্ জনসাধারণের মধ্যে বিছিয়ে দেবার ব্যবস্থা

করতে হবে। পূর্বে বলা হয়েছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করে তুলতে না পারলে উচ্চশ্রেণীয়দেরও কল্যাণ নেই। "সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে, সেই উপায় তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।" এইটেই হচ্ছে জনসাধারণের কল্যাণকামী ভদ্রসাধারণের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। শিক্ষার বিকিরণের এই আদর্শের কথা শুধু পুনঃপুনঃ প্রচার করেই রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হন নি। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে দেশে লোকশিক্ষাবিস্তারের একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থাও তিনি করে গেছেন।

কিন্তু শুধু লেখাপড়া বা পুঁথিগত বিদ্যা দিয়েই যে দেশের দুর্গতদের শিক্ষিত করে তোলা যায়, তা নয়। শিক্ষাপ্রচারের অন্যান্য বহু উপায়ের কথাই তিনি বলেছেন। তার মধ্যে স্বদেশী মেলা একটি। পল্লীতে পল্লীতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই সব মেলার সাহায্যে কিভাবে একই সঙ্গে আনন্দ ও জ্ঞান পরিবেশনের ব্যবস্থা করা যায় সে কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে তাঁর "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে। কিন্তু এসব মেলা হচ্ছে নৈমিত্তিক বস্তু। জনকল্যাণের স্থায়ী ব্যবস্থাও করা চাই। তার একটি আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানে। এই নিত্য ও নৈমিত্তিক পন্থা যথোচিতভাবে অনুসৃত হলে দেশের নিঃস্ব ও নিপীড়িত সমাজের আর্থিক অর্থাৎ অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্যের অভাবজাত দুর্গতির অনেকখানি লাঘব হতে পারে।

কিন্তু পল্লীসংগঠনের এসব ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। আর্থিক দুর্গতির মূলে আছে রাজনৈতিক দুরবস্থা। দেশের জনসাধারণকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধেও সচেতন করা চাই। রবীন্দ্রসাহিত্যে একথা পুনঃপুনঃ স্বীকৃত ও ঘোষিত হয়েছে। 'সমূহ' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলিতে, গোরা উপন্যাসে, প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ নাটকে, রাশিয়ার চিঠিতে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে।

যথোচিত শিক্ষা, পল্লীসংগঠন এবং রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে চেতনা সঞ্চারের অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে প্রজাসাধারণের সংহতি। বস্তুতঃ একতা ও সংঘবদ্ধতার দ্বারা গণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই হচ্ছে নিম্ন ও উচ্চ উভয় শ্রেণীরই কল্যাণসাধনের প্রকৃষ্টতম পন্থা। অবজ্ঞাত সাধারণ জনতার ব্যূহবদ্ধ শক্তির রূপ কবির দৃষ্টিতে বহুকাল পূর্বেই দেখা দিয়েছিল।—

এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে,
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

দেশের লাঞ্ছিত নিপীড়িত সর্বহারারা যেদিন বুকে আশা এবং মুখে ভাষা নিয়ে একত্র দাঁড়াতে শিখবে সেদিন ধনমানগর্বিত অভিজাত শ্রেণীর "স্বার্থোদ্ধত অবিচার" এবং "গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচার" নিমেষেই তিরোহিত হবে, একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না—

আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনও নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না।···তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট্ দুঃখের অন্তর্গত, এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের কাছে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।···

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোক-সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এইজন্য জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব গালি দিতেছে, গুরুঠাকুর মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন জারি করিবার জো নাই।

—'কালান্তর' লোকহিত

লোকসাধারণ যদি নিজেকে জেনে সংঘবদ্ধ হতে পারে তাহলে সব

দুর্গতিরই অবসান হবে। শুধু তাই নয়, তাতে ভদ্রসমাজেরও কল্যাণ। কারণ—

> আমাদের সমাজ লোকসাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে সেইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে—এইখানেই মানুষের পতন। আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের মহাজনের রাজপুরুষের, মোটের উপর ভদ্রসাধারণের, দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, তাহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে।
>
> "যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
> পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

এই দুর্গতি থেকে রক্ষা পাবার উপায় উৎপীড়িতদের প্রতি সদয় হয়ে তাদের উপকার করা নয়, তাদের শিক্ষিত সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলা।

আমাদের দেশের গণশক্তি আজ সুষুপ্ত, আত্মসম্বিৎহীন। কিন্তু এ শক্তি চিরন্তন। রাজ্যসাম্রাজ্য যায়, কিন্তু এ শক্তি থাকে।—

> বিপুল জনতা চলে
> নানা পথে নানা দলে দলে
> যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
> জীবনে মরণে।
> ওরা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
> ওরা মাঠে মাঠে
> বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
> ওরা কজে করে
> নগরে প্রান্তরে।
> শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
> ওরা কাজ করে॥
>
> —আরোগ্য, ১০

এই চিরন্তন মহাশক্তিকে যে রাজশক্তি দম্ভভরে অবজ্ঞা করে তার বিনাশ

অবশ্যম্ভাবী। জনশক্তির স্রোতঃপ্রবাহকে প্রতিরোধ করতে উদ্যত হলে সাম্রাজ্যের ঐরাবতকেও ভেসে যেতে হয়।—

সিংহাসন-তলচ্ছায়ে দূর দূরান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা,
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা।…
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে ॥

—জন্মদিনে, ২২

আমাদের দেশেও এই গণবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন। এই অবশ্যম্ভাবী অভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করেই কবি বলেছেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,…
চরণে দলিত হয়ে ধূলায় সে যায় বয়ে,
সেই নিম্নে নেমে এস, নহিলে, নাহিরে পরিত্রাণ।…
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।…
সবারে না যদি ডাক এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যু মাঝে হতে হবে চিতাভস্মে সবার সমান ॥

—গীতাঞ্জলি, ১০৮

এই আসন্ন বিপ্লবের মধ্যে একদিন ধনী-দরিদ্র উচ্চনীচ ব্রাহ্মণ শূদ্রের সমতা আসবেই, একথা রবীন্দ্রনাথ জীবনের একেবারে শেষ বৎসরেও নিঃসন্দিগ্ধকণ্ঠেই ঘোষণা করে গেছেন গল্পসল্প-বইএর "বড়ো খবর" গল্পে। মহাজনী নৌকোয় ঝগড়া চলছে বড়োলোক পালে আর ছোটোলোক দাঁড়ে। ঝগড়ার মীমাংসা হবার পূর্বেই আকাশে মেঘ দেখা দিল। মেঘের দিকে তাকিয়ে পাল বুঝতে পারল—

লক্ষণ ভালো নয়। দাঁড়গুলোর মজবুত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোন্ দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের গুমর। ধরা পড়বে দাঁড়েই চালায় নৌকো।

অতঃপর তিনি বলেছেন, "খাঁটি খবর ছোটো হয়েই থাকে—যেমন বীজ। ডালপালা নিয়ে বড়ো গাছ আসে পরে।" এই ছোটো খবর 'দেখতে দেখতে একদিন বড়ো হয়েই উঠবে'। তখন সকলকেই ঐ দাঁড়গুলোর সঙ্গে তাল মেলানো অভ্যাস করতে হবে।

এই আসন্ন ঝটিকার সংবাদ ঘোষণা করেই রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হন নি। বিপ্লবের আবাহন-গীতিও তিনি রচনা করে গেছেন।—

দামামা ঐ বাজে,
দিনবদলের পালা এল ঝোড়ো যুগের মাঝে।...
কৃপণতার পাথর-ঠেলা বিষম বন্যাধারা,
লোপ করে দেয় নিঃস্ব মাটির নিষ্ফলা চেহারা।...
পলিমাটির ঘটায় অবকাশ,
মরুকে সে মেরে মেরেই গজিয়ে তোলে ঘাস।...
অন্তরেতে মৃত
বাইরে তবু মরে না যে অন্ন ঘরে করেছে সঞ্চিত;
ওদের ঘিরে ছুটে আসে অপব্যয়ের ঝড়
ভাঁড়ারে ঝাঁপ ভেঙে ফেলে, চালে ওড়ায় খড়।
পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি,
দামামা তার ঐ উঠেছে বাজি॥

—জন্মদিনে, ১৬

অত্যাসন্ন ঝোড়ো যুগের মাঝে যখন সত্যি-সত্যি দিনবদলের পালা আসবে তখনই শুরু হবে দীর্ঘদিনের সুবিধাভোগী ধনাভিজাত সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক প্রায়শ্চিত্ত। তখন দেশে যে সর্বনাশা ধ্বংসলীলা আরম্ভ হবে তার কথা ভেবে পিছপা হলে চলবে না, সাহস করে তাকে আমন্ত্রণ করেই আনতে হবে। নতুবা যুগ যুগ সঞ্চিত অন্যায়ের অবসান হবে না। এই আমন্ত্রণগীতি রচনা করতে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠও কম্পিত হয়নি।—

ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,।
সভ্যনামিক পাতালে যেথায় জমেছে লুটের ধন।...
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে আগে হয়ে যাক ক্ষয়।...
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন ভস্মে ফেলুক গ্রাসি' ॥
—'নবজাতক', প্রায়শ্চিত্ত

অভিজাতসম্প্রদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল হচ্ছে বিধাতার কৃপা। সত্যদ্রষ্টা কবি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিধাতার দরবারেও এপাপের ক্ষমা নেই, স্বার্থপরায়ণ কপটভক্তিও তাদের নিষ্কৃতি দিতে পারবে না।—

সবে না দেবতা হেন অপমান এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে আজও তেজ কল্যাণশক্তির,
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে জাগিবে নূতন দেশে ॥
—'নবজাতক', প্রায়শ্চিত্ত

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

অধর্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥
—'কালান্তর', সভ্যতার সংকট

মনস্বী কবির এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর আলোকেই আজ এই দুর্ভাগা দেশকে অন্ধকারের মধ্যে পথ চিনে চলতে হবে।

অচলায়তন

সমস্ত ভারতবর্ষটা যে একটা ধর্মের অচলায়তনে পরিণত হয়েছে, এ দুঃখ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে দীর্ঘকাল পীড়িত করেছে। ধর্ম মানুষকে জীবনের পথে ক্রমবিকাশের দিকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দেবে, এটাই ধর্মের স্বভাব। কিন্তু ধর্মের মধ্যে যখন বিকার ঘটে তখন সে মানুষকে 'সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে', তখন তার মতো বন্ধন আর হয় না, তখন সে দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলের মতোই মানুষের পায়ে জড়িয়ে থেকে তার অগ্রগতিকে রোধ করে। যে জল মানুষের জীবনধারণের পক্ষে এমন অত্যাবশ্যক সেই জলই যখন বিষাক্ত হয়, তখন জীবনের পক্ষে তাই হয়ে ওঠে সব চেয়ে মারাত্মক। ভারতবর্ষের ধর্মের মধ্যেও এই সর্বনাশা বিকার দেখা দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষজর্জর করে তুলেছে, এ দুঃখ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে সারা জীবনই বেদনার্ত করে রেখেছিল। 'অচলায়তন' নাটকেই এই বেদনা প্রকাশ পেয়েছে সবচেয়ে বেশি করে। অচলায়তনের প্রকাশ কাল ১৯১২ সালে। কিন্তু এই অচলায়তনের ভাবরূপ রবীন্দ্রনাথের মনে দেখা দিয়েছিল তার বহু পূর্বেই। আর, ওই নাটকটি রচনার বহুকাল পরেও এই চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করে ছিল।

সোনার তরী কাব্যের 'দেউল' কবিতাটির (১৮৯৩) মধ্যেই অচলায়তনের কল্পনা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় সুস্পষ্টরূপে। এই দেউলই অচলায়তন।—

> রচিয়াছিনু দেউল একখানি
> অনেক দিনে অনেক দুখ মানি'।
> রাখিনি তার জানালা দ্বার,
> সকল দিক্ অন্ধকার,
> ভূধর হতে পাষাণভার
> যতনে বহি আনি'
> রচিয়াছিনু দেউল একখানি ॥

ধর্মের এই পাষাণমন্দিরই মানুষের মনকে দুর্ভেদ্য বেষ্টনের মধ্যে দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। এই বেষ্টনী তার মনকে ক্রমেই মোহের জারকরসে জীর্ণ করে

আনছিল। কিন্তু মোহগ্রস্ত মন তাকেই আঁকড়ে রেখেছিল প্রাণপণে, মুক্তির কল্পনাও সে-মনে কখনও দেখা দিতে পারেনি। অবশেষে একদিন বিধাতার রুদ্ররোষ এসে বজ্রের রূপে সেই পাষাণ-দেউলকে বিদীর্ণ করে ফেলল। এই বজ্রাঘাত প্রথমে মানুষের মনে তীব্র দুঃখেরই সৃষ্টি করে, কিন্তু অবশেষে তাই এনে দেয় মুক্তির আনন্দ।—

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম
পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম,
অগ্নিময় সর্পসম
কাটিল অন্তরে।
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে॥

কিন্তু অবশেষে—

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি',
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি ;
দেবের কর-পরশ লাগি
দেবতা মোর উঠিল জাগি ;
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি
আঁধার-পাখা তুলি।
দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি॥

'দেউল' কবিতার তিন দিন পরে রচিত 'বিশ্বনৃত্য' কবিতাটিতেও (১৮৯৫) এই পাষাণ-রচিত ধর্মায়তনের কথা এবং তাকে ভেঙে ফেলার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।—

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই,
কেন আছে সবে নীরবে ?
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পূরবে।
শুধু চারিদিকে প্রাচীন পাষাণ
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধি সমান

গ্রাসিয়া রেখেছে অযুত পরাণ,
রয়েছে অটল গরবে ॥

কিন্তু এই ক্ষুধিত পাষাণের গ্রাস থেকে মুক্তি যে চাই-ই, নতুবা নিস্তার নেই।

জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দেবে এদের বাঁচায়ে ?
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতি জালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস,
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ ?

এই যে ধর্মের পাষাণকারা, এ হচ্ছে বিকৃত ধর্মের বেষ্টনী, শাস্ত্রবিধানের অন্ধ অনুসরণের পরিণাম। রূপকের ভাষা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষাতেও তার পরিচয় দিয়েছেন।—

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার ॥
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনো মতে।
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ 'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে ॥

—'চৈতালি', দুই উপমা (১৮৯৬)

এই যে বিচারহীন শুধু শাস্ত্র-মেনে-চলা অন্ধ আচার, এ-ই হচ্ছে মানুষের অগ্রগতির, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এবং অন্তরের মুক্তিলাভের সব চেয়ে বড় অন্তরায়। এই আচার-ধর্মের বন্ধনজাল থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি ? উপায় ভগবানের রুদ্র প্রসাদ লাভ, তাঁর হাতের নির্দয় আঘাত প্রাপ্তি।—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালু রাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',

পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি' পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত ॥

—নৈবেদ্য, ৭২

বিধাতার হাতের এই যে নির্দয় আঘাত, 'দেউল' কবিতায় তাই বর্ণিত হয়েছে বজ্রাঘাতরূপে। বিধাতার প্রসন্ন হস্তের বজ্রাঘাতের ফলে আচারের মরুবালুরাশি অপসারিত হয়ে খুলে যাবে বিচারের স্রোতঃপথ। বিচারের পথ একেবারে খুলে গেলে তার খাত বয়ে ছুটে আসবে যে বন্যাধারা, তারই নাম ধর্মবিপ্লব। রবীন্দ্রনাথ এই বিপ্লবকেই কামনা করেছেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে। কেননা তাঁর বিশ্বাস ওই বিপ্লবের ফলেই দেশের মন থেকে সমস্ত কলুষ ধুয়ে মুছে গিয়ে নিষ্কলুষ উজ্জ্বল সত্যধর্মের আবির্ভাব ঘটবে আমাদের জাতীয় হৃদয়ক্ষেত্রে। এই আকাঙ্ক্ষিত ধর্মবিপ্লবের কথাই রূপকের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে 'অচলায়তন' নাটকে। ওই নাটকের বিষয়বস্তু সকলেরই সুবিদিত। সুতরাং এ স্থলে তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ওই নাটকে যে যোদ্ধবেশ গুরুর কথা আছে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং রুদ্রমূর্তি বিধাতা। তিনি মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছ শোণপাংশুদের সহায়তায় অচলায়তনের পাষাণপ্রাচীর ভেঙে দিলেন। কিন্তু তা সহজে হল না। উভয়পক্ষে অনেক লড়াই ও অনেক রক্তপাতের পর অচলায়তনের পাষাণ-প্রাচীর ধ্বসে পড়ল। তারপরেই শুরু হল গুরুর পুনর্গঠনের কাজ। তিনি পঞ্চককে বললেন—"কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।" কিন্তু সে মন্দির গড়তে হবে প্রশস্ততর ভিত্তির উপরে বৃহত্তর আয়তনে, যাতে স্থবিরক শোণপাংশু প্রভৃতি সব জাতিরই তাতে কুলয়। "না যদি কুলয় তাহলে এমনি করে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে, সেই বুঝে গেঁথো—আমার আর কাজ বাড়িয়ো না।" কিন্তু এই বৃহত্তর সর্বজনীন আয়তন গাঁথবে কারা ? যে স্থবিরক ও শোণপাংশুর দল প্রাণপণে লড়াই করে পরস্পরের রক্তপাত ঘটিয়েছে তাদেরই আজ হাত মেলাতে হবে নূতন মন্দির গড়বার কাজে। এ বিষয়ে গুরুর আদেশ এই।—

ওই ভিতের উপরে কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলেছে।…এই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের শাদা ভিতকে আকাশের মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে।

কোন্ অনির্দেশ্য ভাবী কালে গুরুর এই আদেশ পালিত হবে তা কে জানে? এই নাটকে গুরু যাকে বলেছেন কারাগার, সেই ধর্মকারার উপরে বজ্রাঘাত করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে পরবর্তী কালেও বিধাতার কাছে আবেদন জানাতে হয়েছে।—

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।…
হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি'।
যে-পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে,
ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো,—ভাঙো তারে নিঃশেষে।
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো॥

—'পরিশেষ', ধর্মমোহ

এই কবিতাটির রচনাকাল ১৯২৬ সাল। রবীন্দ্রনাথ দেউলের উপরে বজ্রাঘাতের কথা প্রথম কল্পনা করেন ১৮৯৩ সালে। এর থেকে বোঝা যায় কত দীর্ঘকাল ধরে দেশব্যাপী ধর্মমূঢ়তা রবীন্দ্রনাথের মুক্তিকামী হৃদয়কে বেদনাভারাতুর করে রেখেছিল। এই কবিতাটির রচনার কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে যে ভাষণ দেন তাতেও তিনি বলেন,—

আমরা নাকি ধর্মপ্রাণ জাতি! তাইতো আজ দেখছি ধর্মের নামে পশুত্ব দেশ জুড়ে বসেছে।…এই মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে
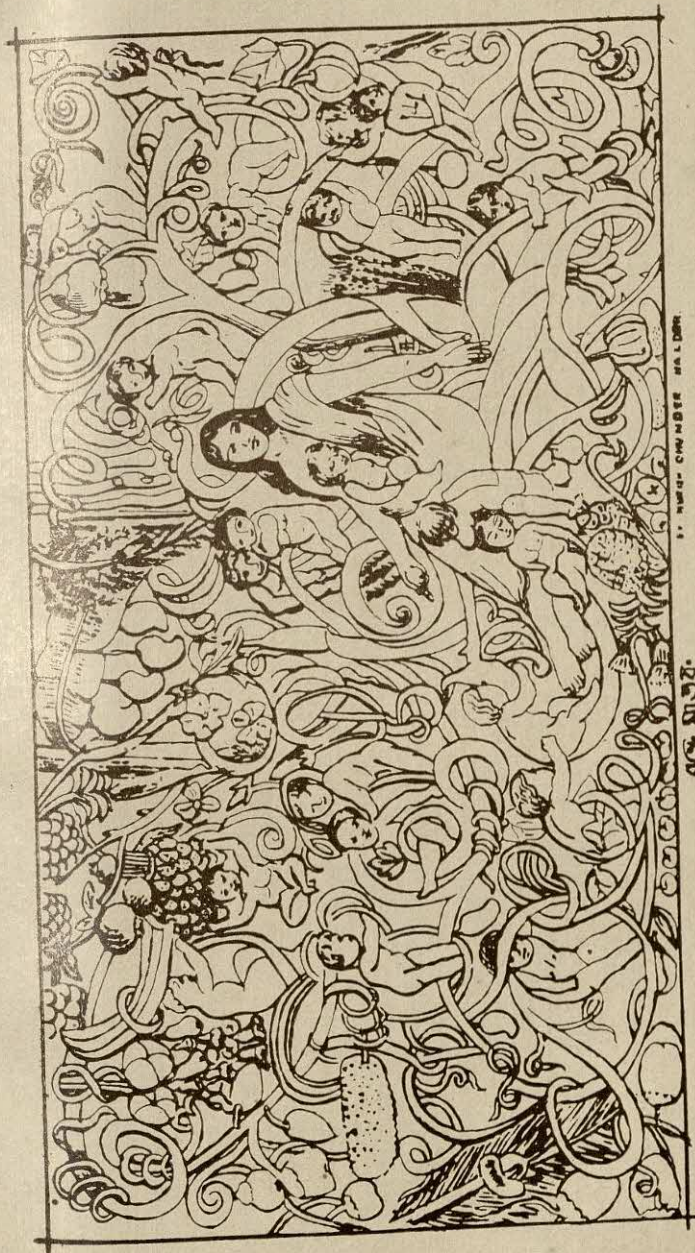
হরিশচন্দ্র হালদার-অঙ্কিত বন্দেমাতরং
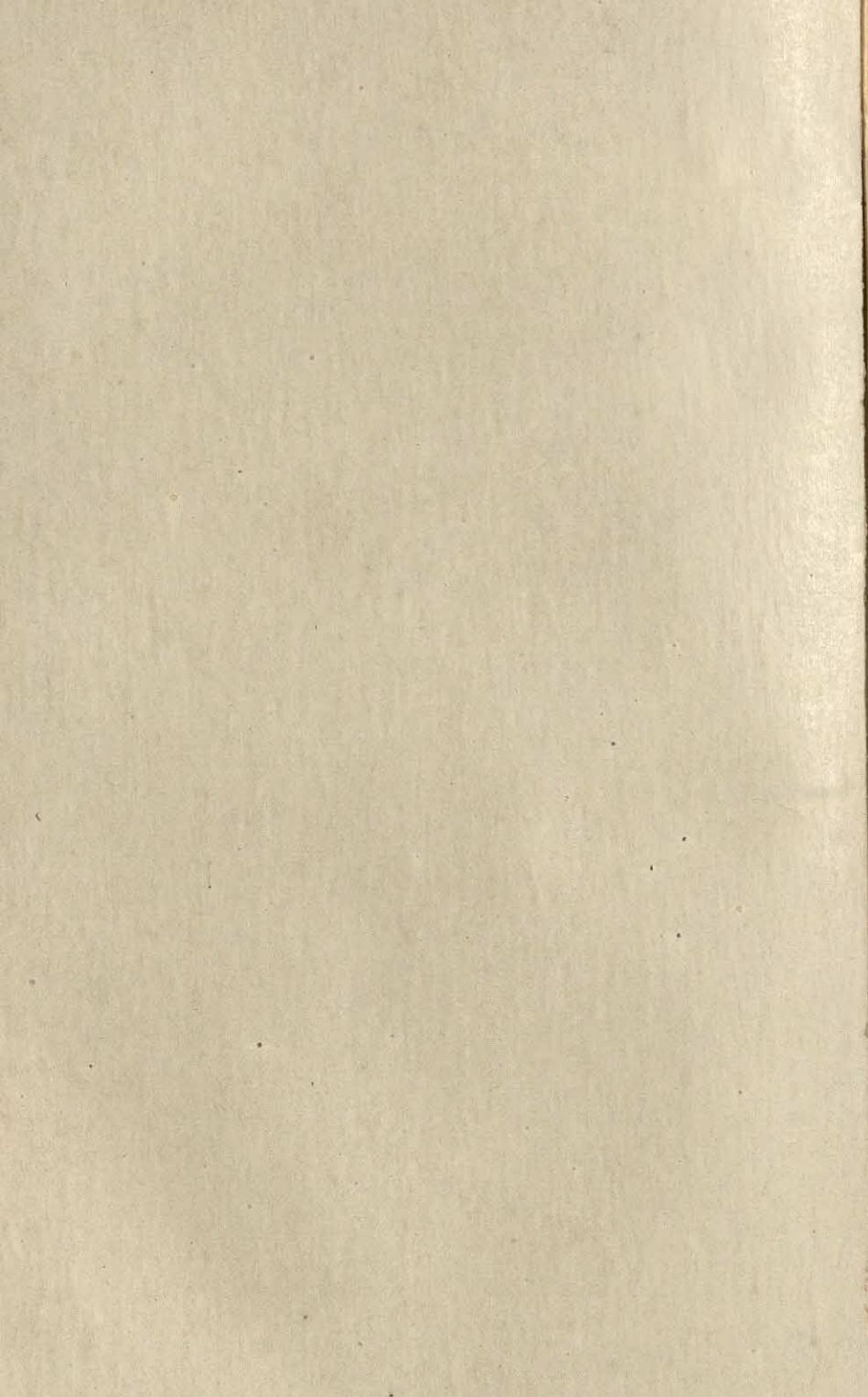
> সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো। আজ মিছে-ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটি-ধর্ম, খাঁটি নাস্তিকতা পায়, তবে ভারত সত্যই নবজীবন লাভ করবে। নাস্তিকতার আগুনে তার সব ধর্মবিকারকে দাহ করা ছাড়া, একেবারে নূতন করে আরম্ভ করা ছাড়া, আর কি পথ আছে বুঝতে তো পাচ্ছিনে।
>
> —প্রবাসী, ১৩৩৩, আষাঢ়, পৃ ৪৪৬

এই যে একেবারে ভেঙে ফেলে নূতন করে আরম্ভ করার কথা, নবজীবন লাভের কথা, এটাই হ'ল অচলায়তন নাটকের অন্তরের কথা। জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েও রবীন্দ্রনাথ এই নবজীবন লাভের বাণী উচ্চারণ করে গেছেন।

> আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।
>
> —'কালান্তর', সভ্যতার সংকট

আমরাও সেই মহাঅভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় পূর্বদিগন্তের অভিমুখে উৎসুক দৃষ্টি মেলে শান্তচিত্তে অপেক্ষা করব।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত

প্রথম পর্যায়

জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত, দুই-ই দেশাত্মবোধের প্রতীক। যে জাতির দেশাত্মবোধ নেই তার বিশেষ পতাকাও থাকে না, তার জাতীয় সংগীতও থাকে না। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। তার প্রমাণ আছে কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আর রঙ্গলালের 'পদ্মিনীউপাখ্যান' কাব্যে (১৮৫৮)। এই কাব্যের

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?

ইত্যাদি বাণীতেই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের প্রথম যথার্থ মন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের (১৮৫৯) প্রস্তাবনায় ঘটেছে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ।—

শুনগো ভারতভূমি
কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুমঘোর,
হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়॥

এই বাণী কণ্ঠে নিয়েই বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব। আর তিনি বঙ্গবাণীর মন্দির থেকে কার্যতঃ বিদায় গ্রহণ করেন চতুর্দশপদী কবিতাবলীর (১৮৬৬) এই শেষ প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করে—

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারতরতনে।

এই যে দেশাত্মবোধের অনুভূতি কবিকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয় তা শুধু বাণীজগতেই আবদ্ধ থাকেনি, কর্মজগতেও তার প্রকাশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিন্দুমেলার আবির্ভাব (১৮৬৭)। এই মেলার প্রায় প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনের উদ্‌বোধন হত সত্যেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের রচিত 'গাও ভারতের জয়' গানটি দিয়ে। গানটির প্রথম অংশ এই।—

মিলে সব ভারতসন্তান
একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয় ॥

এটিই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সংগীত। এই গান সম্বন্ধে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

> এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-নর্মদা-গোদাবরী-তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতিকোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।
>
> —বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ চৈত্র

লক্ষ করার বিষয়, এই গানটির মতো 'বন্দেমাতরম্' গানেরও প্রথমাংশে মাতৃভূমির ভূমূর্তির ধ্যান আছে। বিশেষভাবে 'ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী' অংশ 'সুজলাং সুফলাং' বিশেষণ-দুটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বন্দেমাতরম্ গানের 'অবলা কেন মা এত বলে' এই ভাবটিও পরোক্ষ পূর্ণাভাস পাওয়া যায় 'মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়' কথাগুলিতে।

মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে হিন্দুমেলার যুগে 'গাও ভারতের জয়' গানের আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলেন। এই বাল্যশিক্ষার প্রভাবই যৌবনকালে তাঁকে এই নূতন সুর দিতে প্রবৃত্ত করেছিল এবং আরও পরিণত বয়সে তাঁকে স্বরচিত 'জনগণমন' গানে ভারতবিধাতার পৌনঃপুনিক জয়

ঘোষণায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। সুভাষচন্দ্রের 'জয়হিন্দ্' ধ্বনিরও পূর্বাভাস রয়েছে এই মহাগীতের 'হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়' ইত্যাদি ধুয়াটির মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে সরলাদেবীকৃত 'হিন্দুস্থান' গানটিও স্মরণীয়। এই বিখ্যাত গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল ১৯০১ সালে কলকাতা বীডন স্কোয়ারে কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে। এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় মহাসভায় পুনঃপুনঃ গীত এই গানটির প্রথম কয়েক লাইন উদ্‌ধৃত করছি।—

অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি, গাহ আজি হিন্দুস্থান।
মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি, গাহ আজি হিন্দুস্থান।
কর বিক্রম-বিভব-যশ-সৌরভ-পূরিত সেই নাম গান;
বঙ্গবিহার-উৎকলমান্দ্রাজ-মারাঠগুর্জর-পঞ্জাবরাজপুতান।
হিন্দু পার্সি জৈন ইসাই শিখ মুসলমান,
গাও সকলকণ্ঠে সকলভাবে—'নমো হিন্দুস্থান,
জয় জয় জয় হিন্দুস্থান, নমো হিন্দুস্থান'।
ভেদরিপু-বিনাশিনি মম বাণি, গাহ আজি ঐক্যগান।
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি, গাহ আজি ঐক্যগান।
বঙ্গবিহার-উৎকলমান্দ্রাজ···

এই গানে একদিকে সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত 'গাও ভারতের জয়' মহাগীতের প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথকৃত 'জনগণমন' বা 'ভারত-বিধাতা' গানের পূর্বাভাসও তেমনি সুস্পষ্ট। 'গাও ভারতের জয়' এবং 'গাহ আজি হিন্দুস্থান' এই দুই গানেই ভারতের অতীতগৌরব, তার পৌনঃপুনিক জয়ঘোষণা এবং ঐক্যের দ্বারা বললাভের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। অপরপক্ষে 'হিন্দুস্থান' এবং 'ভারতবিধাতা', এই দুই গানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত ও সম্প্রদায়ের উল্লেখের মধ্যে চিন্তা ও আদর্শগত ঐক্য সুস্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে, অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর আগে। কিন্তু এই গ্রন্থপ্রকাশের পর অল্পকালের মধ্যেই যে 'বন্দেমাতরম্' গানটি দেশের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল তার প্রমাণ আছে। ১৮৮৫ সালে (বাংলা ১২৯২ বৈশাখ) ঠাকুরবাড়ি থেকে

'বালক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ; এর সম্পাদক হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় 'গান-অভ্যাস' বিভাগে শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী (রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের কন্যা) লিখলেন—

> এবারে আমরা দুইটি গান লিখিয়া দিতেছি। তন্মধ্যে বঙ্কিমবাবুর রচিত 'বন্দেমাতরম্' নামক বিখ্যাত গানটির সমস্তটা দেওয়া গেল না। কারণ উক্ত গানের সুর অত্যন্ত কঠিন, সমস্তটা দিলে পাঠকের সহজে আয়ত্ত হইবে না। 'বন্দেমাতরং' গানে বিস্তর অলঙ্কার লাগিয়াছে।···
>
> এবারে যে দুইটি গান প্রকাশ করা হইতেছে, উহাদের তাল কাওয়ালি।···'বন্দেমাতরং' গানের যে অংশটুকুর স্বর লেখা হইয়াছে সেই অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত হইল।
>
> বন্দেমাতরং
> সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
> শস্যশ্যামলাং মাতরং।
> শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং
> ফুল্ল-কুসুমিতদ্রুমদল-শোভিনীং
> সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
> সুখদাং বরদাং মাতরং।
>
> —বালক, ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৯৩-৯৫

বালক-পত্রিকায় এই গানটির সঙ্গে সুজলা সুফলা বহুসন্তানপরিবৃতা বঙ্গজননীর একটি পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী ছবিও আছে। ছবির নীচে নাম দেওয়া আছে—'বন্দেমাতরং'। শিল্পীর নামও দেওয়া আছে—by Hurish Chunder Halder। এই হরিশচন্দ্র হালদার তৎকালে হ চ হ নামে পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার তাঁর নাম করেছেন ; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'গল্পসল্প' গ্রন্থের 'মণিকুন্তলা' গল্পটির নাম উল্লেখ করতে পারি। যাহক, হ চ হ কৃত এই ছবিটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আধুনিককালে এটির পুনর্মুদ্রণ হওয়া প্রয়োজনীয়।

বালক পত্রিকায় 'বন্দেমাতরং' গানের স্বরতালের পরিচয় দেওয়া আছে,

'রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি'। কিন্তু এ সুর কার দেওয়া তার উল্লেখ নেই। সরলাদেবীর 'শতগান' পুস্তকে (প্রথম সংস্করণ, ১৩০৭ বৈশাখ, পৃষ্ঠা ১১৩) "সুখদাং বরদাং মাতরং" পর্যন্তই দেওয়া আছে। আর আছে সুর-তালের পরিচয় 'রাগিণী-দেশ—একতালা' এবং সুরকারের নাম রবীন্দ্রনাথ। তাল-পরিচয়ে কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গানের স্বীকৃত আংশিক পাঠ এবং রাগিণীর ঐক্যের কথা ভাবলে মনে হয় বালকে প্রকাশিত সুরও সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। 'সপ্তকোটি কণ্ঠ' ইত্যাদি অংশের সুর দিয়েছিলেন—সরলাদেবী, একথা সকলেরই জানা।

যাহক, বালক পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য এবং ছবি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ১৮৮৫ সালেই 'বন্দেমাতরম্' গানটি 'বিখ্যাত' হয়ে গিয়েছিল, ঠাকুর-বাড়িতেও সে খ্যাতির মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৮৬ সালে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশনটি স্মরণীয় করে রেখেছেন, তাঁর একটি রচনার দ্বারা—

গাহিল সকলে মধুর কাকলি, গাহিল 'বন্দেমাতরম্',
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং সুখদাং বরদাং মাতরম্।
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে,
ভারত-জগৎ মাতিল।

দেখা যাচ্ছে ১৮৮৬ সালে 'বন্দেমাতরম্' গানটি শুধু বিখ্যাত নয়, কংগ্রেস-মণ্ডলীতেও স্বীকৃত হয়েছিল। ১৮৮৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে এই গানটি গাওয়া হয়েছিল কিনা, জানা যায়নি। তবে কংগ্রেসের এই কলকাতা অধিবেশনের উদ্‌বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' এই গানটি গেয়ে, এ কথা জানা যায়। এর দশ বছর পরে ১৮৯৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের প্রথম দিনের উদ্‌বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম্' গানটি গেয়ে। সম্ভবতঃ তিনি 'সুখদাং বরদাং মাতরং' পর্যন্ত প্রথমাংশটুকুই গেয়েছিলেন। ১৯০০ সালে প্রকাশিত সরলা দেবীর 'শতগান' পুস্তকেও শুধু ওই অংশটুকুরই রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর পাওয়া যায়।

দেখা গেল, অন্ততঃ ১৮৮৫ সাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম্' গানটির

প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু সে শ্রদ্ধা শুধু ঐ গানের প্রথম অংশটুকুর উপরেই। সুতরাং কিছুকাল পূর্বে যখন 'বন্দেমাতরম্' গান নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলছিল (১৯৩৭), তখনও যে তিনি পণ্ডিত জওহরলালের মারফতে ওই গানের শুধু প্রথম অংশটুকুকেই জাতীয় সংগীত বলে স্বীকৃতিদানের পক্ষে অভিমত জানিয়েছিলেন এটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

'বন্দেমাতরম্' গানের প্রতি এত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের চিত্ত তাঁর আবাল্যশ্রুত 'গাও ভারতের জয়' গানের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিল, একথা স্বীকার করতেই হবে। ফলে ১৯১১ সালে তিনি যখন 'জনগণমন' গানটি রচনা করেছিলেন তখন তিনি সত্যেন্দ্রনাথের 'গাও ভারতের জয়' এবং সরলাদেবীর 'গাহ আজি হিন্দুস্থান' এই দুটি গানকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলা বিভাগ করেন আর ১৯১১ সালে ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লি দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বাংলা বিভাগের অবসান ঘোষণা করেন। তার অল্প পরেই অন্যতম কংগ্রেসনায়ক আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় (রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবীর স্বামী) কংগ্রেসের আসন্ন কলকাতা অধিবেশনে গাওয়ার জন্য সম্রাটের একটি প্রশস্তিসংগীত রচনা করে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শ ও অভিমত ছিল ভিন্ন ধরণের। তাই এই অনুরোধ শুনে তাঁর মনে বিস্ময় ও উত্তাপের সঞ্চার হয়। এই উত্তাপের প্রতিক্রিয়ায়

> আমি জনগণমন অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথ-পরিচায়ক।

কংগ্রেস নেতারাও বুঝলেন গানটিকে সম্রাটের প্রশস্তি হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। তাই এটিকে কংগ্রেসের অন্যতম উদ্‌বোধন-সংগীতরূপে ব্যবহার করাই স্থির করলেন। ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ১৯১১, এই তিনদিন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তিন দিন তিনটি জাতীয় সংগীত দিয়ে কংগ্রেসের উদ্‌বোধন হয়—প্রথম দিন বন্দেমাতরম্, দ্বিতীয় দিন জনগণমন-অধিনায়ক এবং তৃতীয় দিন 'গাহ আজি হিন্দুস্থান'। তখন থেকেই জনগণমন

গানটি জাতীয় সংগীত হিসাবে বন্দেমাতরম্ গানের পাশেই স্থানলাভ করেছে।

অতঃপর ১৯১৭ সালে আবার যখন কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তখনও উক্ত তিনটি গান দিয়েই তিন দিনের উদ্‌বোধন হয়। এই কংগ্রেসেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 'জনগণমন' গানটিকে Song of the Victory of India বলে অভিনন্দিত করেন। এই সময় থেকেই গানটির জাতীয় চিত্তজয়ের যাত্রা শুরু হয় এবং সেই যাত্রাপথ কিছু পরিমাণে সুগম হয় ইংরেজি অনুবাদের দ্বারা। ১৯১৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের অল্প পরেই গানটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় মডার্ন্ রিভিউ পত্রিকায় (১৯১৮ ফেব্রুয়ারি)। অতঃপর কবি নিজেও একাধিকবার এটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। এইভাবে গানটির জনপ্রিয়তা ক্রমে বাড়তে থাকে এবং বাংলা দেশের বাইরে সর্বভারতে এর প্রভাব প্রসারিত হয়। ফলে ১৯৩৭ সালে যখন ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে, তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে 'বন্দেমাতরম্' গানের প্রথমাংশের অনুকূলে অভিমত দেন। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্রের আসক্তি প্রকাশ পায় 'জনগণমন' গানের অনুকূলে। পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে যে আজাদহিন্দ্ বাহিনী গঠন করেন, জনগণমনই তার জাতীয় সংগীত বলে স্বীকৃত হয়। অতঃপর পূর্ব এশিয়ায় আজাদহিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠাকালেও এই গানটিই জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। সে সময়ে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে গানটি হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরেও মূল গানের ভাবাদর্শ ও সুর অব্যাহত আছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্টের পরে যখন স্বাধীন ভারতের জাতীয়সংগীত নির্বাচনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন আবার এই গানটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৪৭ সালে নিউইয়র্ক শহরে বিশ্বরাষ্ট্রসম্মেলনে 'জনগণমন'ই ভারতীয় জাতীয় সংগীতরূপে উপস্থাপিত হয়। তারই ফলে এটি আপন বিশিষ্টতাগুণে বিশ্বজগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল গণপরিষদে ঘোষণা করেন—

From various countries we received message of appreciation and congratulation of this tune, which was

considered by experts and others as superior to most of the National Anthems which they had heard.

অতঃপর ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারতীয় গণপরিষদ্ বন্দেমাতরম্ ও জনগণমন গান-দুটিকে ভারতবর্ষের যুগল জাতীয়সংগীত বলে ঘোষণা করেন। জনগণমন গানটি বয়সে বন্দেমাতরমের প্রায় ত্রিশবছরের কনিষ্ঠ হলেও মনে রাখতে হবে, এটি বন্দেমাতরমেরও অগ্রজ বঙ্কিমবন্দিত 'গাও ভারতের জয়' মহাগীতেরই উত্তরাধিকারী।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত

দ্বিতীয় পর্যায়

১

রবীন্দ্রনাথের জনগণমন-অধিনায়ক গানটি আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগীতরূপে ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তে, এমন কি বহির্জগতেও, অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। এটিকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসংগীত বলে গ্রহণ করা উপলক্ষে এটির প্রতি ব্যাপকভাবে দেশের মনোযোগ নিবিষ্ট হয়েছে। এই সময় গানটির ইতিহাস আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে।

এই গানটি রচনার উপলক্ষ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে (ইং ২০।১১।৩৭, শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত) বলেছেন—

> রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান্ আমার কোনো বন্ধু[১] সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক। সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না।
>
> —বিচিত্রা, ১৩৪৪ পৌষ, পৃ ৭০৯

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আর একখানি পত্রে (ইং ২৯।৩।৩৯, শ্রীসুধারানী দেবীকে লিখিত) বলেছেন—

> শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের চিরসারথি বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত

১ সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement, p. xviii)। তাঁর সাহিত্যবুদ্ধির উল্লেখ আছে জীবন-স্মৃতি গ্রন্থে।

মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।

—পূর্বাশা, ১৩৫৪ ফাল্গুন, পৃ ৭৩৮

এ কথা আজ সুবিদিত যে, গানটি প্রথম গাওয়া হয়[২] ১৯১১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে[৩] (২৭ ডিসেম্বর বুধবার)। তৎকালে কংগ্রেস ছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ মডারেট নেতাদের প্রভাবাধীন। তার মাত্র একপক্ষ কাল পূর্বে (১২ ডিসেম্বর) দিল্লীর দরবারে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ তৎকালীন বঙ্গবিভাগের অবসান ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় উল্লসিত হয়ে মডারেট নেতারা স্থির করলেন, কংগ্রেসমণ্ডপ থেকেই সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে রাজদম্পতিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হবে। কংগ্রেস-অধিবেশন-সমাপ্তির দু দিন পরেই ৩০ ডিসেম্বর তাঁদের কলকাতায় আগমনের তারিখ। এই স্বাগত সম্ভাষণের জন্য উপযুক্ত প্রশস্তিসংগীতও চাই। সম্ভবতঃ এই রচনার জন্যই পূর্বোক্ত রাজভক্ত বন্ধু রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারতের তদানীন্তন অধিপতির স্তবগান না করে রচনা করলেন ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাগ্যবিধাতার জয়গান। রবীন্দ্রনাথের রাজভক্ত বন্ধু বুঝলেন এই গানটিকে রাজপ্রশস্তির কাজে লাগানো চলে না। অথচ রাজভক্তির গান চাই। তাই রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে অন্যত্র সে গানের সন্ধান করতে হয়েছিল এবং মডারেটদের সন্তোষজনক গানও যথাসময়ে পাওয়া গেল। সে কথা পরে বলছি।

১৯১১ সালের কলকাতা-কংগ্রেসে তিন দিনে গীত চারিটি গানেরই পরিচয় নেওয়া আবশ্যক। প্রথম দিনের উদ্‌বোধন হয় বন্দেমাতরম্ গান

---

২ কারও কারও ধারণা ছিল, গানটি প্রথম গীত হয় দিল্লিতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের অভিষেক-দরবারে (১২ ডিসেম্বর ১৯১১)। কিন্তু এই ধারণার সমর্থক কোনো প্রমাণ নেই। দিল্লির অভিষেক-দরবার ও কলকাতা প্রভৃতি স্থানে রাজসংবর্ধনার যে সুবিস্তৃত সরকারি বিবরণগ্রন্থ তখন প্রকাশিত হয় তাতে কোথাও এই গানটির প্রসঙ্গমাত্র নেই।

৩ ওই সময়ে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান উদ্‌বোক্তা ডাক্তার নীলরতন সরকারের একজন সহকারী। ডাক্তার নীলরতনের নির্দেশে তিনিই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গানটি এনে তাঁকে দেন। কংগ্রেসে গীত হবার পূর্বে ডাক্তার নীলরতনের হ্যারিসন রোডের বাসভবনেই গানটির রিহারস্যাল হয়।—জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বিবৃতি, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯৪৭ ডিসেম্বর ১৫।

দিয়ে। দ্বিতীয় দিনের উদ্‌বোধন হয় জনগণমন-অধিনায়ক গানটি দিয়ে।[৪] তার পরে কংগ্রেসহিতৈষীদের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক টেলিগ্রাম ও চিঠিপত্র পঠিত হয়। অতঃপর রাজদম্পতিকে আনুগত্য ও স্বাগত জানিয়ে একটি প্রস্তাব-গ্রহণান্তে তাঁদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রচিত একটি হিন্দি প্রশস্তিগান গাওয়া হয়।[৫] রবীন্দ্রনাথের কাছে নিরাশ হবার পর গানটি তাঁর রাজভক্ত বন্ধু-প্রমুখ মডারেট নেতাদের নৈরাশ্য মোচন করেছিল, এই হিন্দি প্রশস্তিটিই হচ্ছে সে গান। তৃতীয় দিনের উদ্‌বোধন হয় 'অতীতগৌরববাহিনি মম বাণি' গানটি দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্‌ এবং সরলা দেবীর 'অতীতগৌরব-বাহিনি' যে দেশভক্তির গান তাতে সন্দেহ নেই। বাকি দুটি গান, অর্থাৎ জনগণমন-অধিনায়ক এবং হিন্দি প্রশস্তিটি সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্রাদি থেকে কি জানা যায় দেখা যাক।—

১। কংগ্রেসের ষড়্‌বিংশ অধিবেশনের সরকারি রিপোর্টে আছে যে, ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে—

> The proceeding commenced with *a patriotic song* composed by Babu Rabindranath Tagore.

তার পরে র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ড-প্রমুখ কংগ্রেসবন্ধুদের পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ এবং সভাপতিকর্তৃক উত্থাপিত রাজানুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণের বর্ণনা আছে। অতঃপর আছে—

> After that *a song of welcome* to Their Imperial Majesties composed for the occasion was sung by the choir.

---

৪ গায়কদের অন্যতম ছিলেন শ্রীযুক্ত অমল হোম (অমলবাবুর বিবৃতি, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯৪৭ ডিসেম্বর ১৪)। গায়িকাদের মধ্যে ছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র সিদ্ধান্তের পত্নী শ্রীমতী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত (পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

৫ "আমিও একজন living witness ১৯১১ সালের কংগ্রেসের। গানের দলে আমি ছিলাম। একটি রাজবন্দনাও গেয়েছিলাম কিন্তু। সে গানটি রচনা করেছিলেন ৺সরলা দেবীর স্বামী ৺রামভুজ দত্ত চৌধুরী। তার প্রথম লাইন 'যুগ জীব, মেরা পাদশা, চহুঁ দিশ রাজ সবায়া'। সব কথা মনে নেই, কিন্তু সুরটি কানে রয়েছে।"—রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত শ্রীযুক্তা চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের একখানি পত্র।

২ জানুয়ারি ১৯১২ তারিখের বেঙ্গলী :পত্রিকায় কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের একটি ষ্টীমার-

দেখা যাচ্ছে একটিকে দেশভক্তির গান এবং অপরটিকে সম্রাট্‌দম্পতির স্বাগতসংগীত বলে বর্ণনা করে দুটির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

২। অমৃতবাজার পত্রিকায় (২৮ ডিসেম্বর ১৯১১) আছে—

> The proceedings began with the singing of a Bengali *song of benediction* ..This [রাজানুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণ] was followed by another *song in honour of* Their Imperial Majesties' visit to India.

এখানেও দুটি গানের প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে। Benediction কথার তাৎপর্য পরে স্পষ্ট হবে।

৩। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ১৯১১ সালের কংগ্রেসের প্রধান উদ্‌যোক্তা। তাঁর 'বেঙ্গলী' কাগজে স্বভাবতই বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যায়। ওই কাগজ (২৮ ডিসেম্বর ১৯১১) থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি।—

> The proceedings commenced with a *patriotic song* composed by Babu Rabindranath Tagore, the leading poet of Bengal ('*Janaganamana-adhinayaka*'), of which we give an English translation—
> King of the heart of nations, Lord of our country's fate ইত্যাদি।

অতঃপর সভাপতিকর্তৃক উত্থাপিত রাজানুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণান্তে—

> *A Hindi song paying heart-felt homage* to Their Imperial Majesties was sung by the Bengali boys and girls in chorus.

এই বিবরণও কংগ্রেসরিপোর্টের সমর্থক। অর্থাৎ এখানেও দেশভক্তি

পার্টির বর্ণনা আছে। ওই উপলক্ষে বন্দেমাতরম্, মিলে সব ভারতসন্তান প্রভৃতি দেশভক্তির গানের সঙ্গে উক্ত রাজভক্তির গানটিও গাওয়া হয়েছিল।—"First there was *Bande Mataram*, then *Miley sob varat santan* ,..the chorus under the able leadership of Mrs. Dutt Choudhury sang the *loyal* song *jug jibey mere padsa* ,..Mrs. Dutt Choudhury gave another song. The words were new—at least they seemed to be so, but they were redolent of deep pathos and *patriotism*." —*Bengalee*, 1912 Jan. 2.

এবং রাজভক্তির গানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হিন্দি রাজভক্তির গানটির ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া দূরে থাকুক বেঙ্গলী পত্রিকায় (কংগ্রেসরিপোর্টেও) গানটির আরম্ভাংশ এবং তার রচয়িতার নাম পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

এবার ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজের বিবরণ উদ্ধৃত করছি।

৪। প্রথমেই তৎকালীন ইংলিশম্যানের (২৮ ডিসেম্বর ১৯১১) বিবৃতি দেওয়া যাক।—

> The proceedings opened with a *song of welcome* to the King Emperor, specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore···
>
> This [রাজানুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণ] was followed by another *song in Hindi welcoming* Their Imperial Majesties. The choir in both songs was led by Mrs. Rambhuj Dutt Chaudhuri.

এই বিবরণ অনুসারে রবীন্দ্রনাথের বাংলা গানটিও রাজোদ্দেশ্যে রচিত স্বাগতসংগীত। এই বর্ণনা কংগ্রেসরিপোর্ট তথা অমৃতবাজার ও বেঙ্গলী পত্রিকার বিরোধী। জনগণমন-অধিনায়ক গানটি সম্বন্ধে কারও কারও মনে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল এটাই তার উৎসস্থল।

৫। অতঃপর স্টেটস্‌ম্যান (২৮ ডিসেম্বর ১৯১১)—

> The proceedings commenced shortly before 12 o'clock with a *Bengali song*···
>
> The choir of girls led by Sarala Devi (Mrs. Rambhuj Dutt Chaudhuri) *then* [রাজানুগত্যপ্রস্তাব গ্রহণের পর] sang *a hymn of welcome* to the King specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore, the Bengali poet.

এই বর্ণনায় বাংলা উদ্‌বোধনগীতটি কার রচিত তার উল্লেখ নেই। তবে এটি যে রাজভক্তির গান নয় তা পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে; কেননা এটি রাজভক্তির গান হলে তার বিশেষ উল্লেখ না থাকার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। দ্বিতীয় গানটি বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, এই গানটিও বাংলা বলেই স্টেট্‌স্‌ম্যানের ধারণা। যা হক,

এই বিবরণ অংশতঃ কংগ্রেস-রিপোর্ট প্রভৃতি দেশী বর্ণনার বিরোধী এবং অংশতঃ ইংলিশম্যানেরও বিরোধী। ওই দিনের বাংলা উদ্‌বোধনগানটিই যে রবীন্দ্রনাথের রচনা এ কথা ধরতে না পারাতেই যে স্টেট্‌স্‌ম্যানের অনভিজ্ঞ রিপোর্টারের ভ্রান্তি ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

৬। এবার রয়টার। বিলাতে ইণ্ডিয়া নামে সাপ্তাহিক কাগজে (২৯ ডিসেম্বর ১৯১১) রয়টারপ্রেরিত সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল এভাবে—

> When the Indian National Congress resumed its session on Wednesday, Dec. 27, *a Bengali song, specially composed in honour of* the Royal visit was sung and a resolution welcoming the King Emperor and Queen Empress was adopted unanimously.

কংগ্রেসরিপোর্ট প্রভৃতি দেশী বিবরণের সঙ্গে এই বর্ণনার সামঞ্জস্য নেই, স্টেট্‌স্‌ম্যানের সঙ্গেও নেই, কিছু আছে শুধু ইংলিশম্যানের সঙ্গে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, পূর্বোদ্‌ধৃত তিনটি ভারতীয় বিবরণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান; কিন্তু এই শেষোক্ত তিনটি বিবরণের পারস্পরিক অসামঞ্জস্য ও ভারতীয় বর্ণনাগুলির সঙ্গে বিরুদ্ধতা এত স্পষ্ট যে, দেখিয়ে দেবার অপেক্ষাও রাখে না। বস্তুতঃ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ও দুটি কাগজ এবং রয়টারের সংবাদপরিবেশকরা রাজভক্তির সংবাদ প্রচারে যত আগ্রহান্বিত ছিলেন সংবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে ততটা সতর্ক ছিলেন না। ফলে তাঁরা হিন্দি রাজপ্রশস্তিটির সঙ্গে জনগণমন গানটিকে গুলিয়ে ফেলেছেন।[৬]

রবীন্দ্রনাথ এসব ভ্রান্ত বিবরণের প্রতিবাদ করেছিলেন এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ তৎকালেও তিনি ইংলিশম্যান প্রভৃতির

---

৬ ভাষাজ্ঞানের অভাবে বিলাতি রিপোর্টারদের পক্ষে ভারতীয় সংবাদপ্রচারে কতখানি ভুল হওয়া সম্ভব, ইদানীং কালেও তার একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সান্‌ডে টাইম্‌স্‌ পত্রিকার সংবাদদাতা মিঃ আলুইন টোবটি সম্প্রতি দিল্লি থেকে উক্ত পত্রিকা মারফত এই সংবাদ প্রচার করেছেন।—

The National Anthem issue is a battle between two songs, *Bande Mataram*, "Mother, I come to thee", *written by Rabindranath*, the Bengali poet, and

মূঢ়তার প্রতিবাদ করাকে আত্মাবমাননা বলেই মনে করতেন। তাছাড়া, ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজগুলির বিবরণ তাঁর লক্ষগোচর নাও হয়ে থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে, কোনো মিথ্যা রটনার প্রতিবাদ না হলেই তা সত্য হয় না। গানটির পরবর্তী ইতিহাস অনুসরণ করলেই এবিষয়ের সত্যাসত্য স্বতই প্রমাণিত হবে। অতঃপর সেই ইতিহাসই যথানুক্রমিকভাবে বিবৃত করছি।

২

জনগণমন-অধিনায়ক গানটি কংগ্রেসে গীত হয় পৌষ মাসের ১১ তারিখে (২৭ ডিসেম্বর)। তার পরের মাঘ মাসেই এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই গানটির স্বরূপ আপনিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একে একে ওই ঘটনাগুলির পরিচয় দেওয়া যাক।—

১। ওই মাঘ মাসের (বাং ১৩১৮ সাল) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ) জনগণমন-অধিনায়ক গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[৭] তাতে গানের নাম দেওয়া হয় 'ভারতবিধাতা' এবং তার নীচেই

Jana-gana-mana, a modern Hindi song, favoured by Pandit Nehru because it is most easily transcribed into Western music and can be played by a Western military band.

Jana-gana-mana is now claimed to mean "Mother India, thou giver of all wealth, culture and goodness." But it was actually written at George V's Coronation and is a paean of praise for the King as the giver of all wealth, culture and goodness. Although Bande Mataram has the better words, the tune to which it is sung sounds to western ears like a Jam-session band-leader's nightmare. Jana-gana-mana will most likely win the day.

—*Sunday Times*, 1949 May 15

লক্ষ করবার বিষয় এখানেও জনগণমন গানটিকে পূর্বোক্ত হিন্দি রাজপ্রশস্তিটির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। ১৯১১ সালে কি ভাবে ভ্রান্তি ঘটেছিল, ১৯৪৯ সালের এই রিপোর্ট থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দ্রষ্টব্য *National Anthem Muddle*—অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৯৪৯ জুন ২০, এবং 'বিদেশী সাংবাদিকের অজ্ঞতা'—যুগান্তর, ১৯৪৯ জুন ১৯।

৭ এস্থলে বলা প্রয়োজন, কংগ্রেসে গীত হবার পরের দিনই বেঙ্গলী পত্রিকায় গানটির যে মূলানুসারী ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় তার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনীর পাঠ মিলিয়ে দেখলেই

এটির পরিচয় হিসাবে লেখা ছিল 'ব্রহ্মসংগীত'। তাতে বোঝা যাচ্ছে, স্বয়ং পরব্রহ্মই ভারতবিধাতা এ কথা প্রকাশ করাই ছিল রচয়িতার অভিপ্রায়। এই বর্ণনাকেই ইংলিশম্যান প্রভৃতির পরোক্ষ প্রতিবাদ বলে গ্রহণ করা চলে।

২। এই মাঘ মাসেই ভারতী পত্রিকায় কংগ্রেসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি গানের একটি অতি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। কংগ্রেস-অধিবেশনের অত্যল্পকাল পরেই বর্ণনাটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং সমকালীনতার বিচারে এটির মূল্য খুব বেশি। ভারতীর বর্ণনা পড়লেই বোঝা যায়, তার রচয়িতা অধিবেশনের তিনদিনই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তাতেও লেখাটির গুরুত্ববৃদ্ধি হয়েছে। যা হক, আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উদ্‌ধৃত করছি।—

> গত ২৬, ২৭, ২৮এ ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সভার কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে প্রতিদিনই জননী জন্মভূমির গৌরবগাথা গীত হইত। প্রথম দিন ভারতবর্ষের সুজলা শ্যামলা মাতৃমূর্তির, দ্বিতীয় দিন মানবজাতির অদৃষ্টবিধাতা যিনি
>
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,
> ধর্মসংস্থাপনার্থায়
>
> যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেন সেই ত্রিলোকনাথের, এবং তৃতীয় দিন অতীতগৌরবস্মৃতি-ঐশ্বর্যের খনি হিন্দুস্থানের বন্দনাগান হইয়াছিল। সুমধুর বালিকাকণ্ঠের সহিত যুবকদের সুগম্ভীর কণ্ঠে যখন এই স্তবগানসকল ধ্বনিত হইত তখন হৃদয় ভক্তিপরিপূর্ণ এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। ধূপসুগন্ধ যেমন মনকে পূজার অনুকূল অবস্থা দান করে, এইসকল বন্দনাগান তরুণ যুবক ও বালিকাদের কণ্ঠে গীত হইয়া অন্তরে সেই প্রকার ভক্তি সঞ্চার করিত।
>
> —ভারতী, ১৩১৮ মাঘ, পৃ ৯৯৬-৯৭

নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। অর্থাৎ কংগ্রেসে-গীত পাঠ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতরূপেই তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই বর্ণনা-অনুসারে জনগণমন-অধিনায়ক গানটি হচ্ছে যুগপৎ 'জননী জন্মভূমির গৌরবগাথা' এবং মানবজাতির অদৃষ্টবিধাতা 'ত্রিলোকনাথের বন্দনাগান'।[৮] লক্ষ করবার বিষয়, এই বর্ণনায় হিন্দি রাজপ্রশস্তিটি উল্লেখযোগ্য বলেও বিবেচিত হয়নি। কেননা এটিকে কোনো ক্রমেই 'জননী জন্মভূমির গৌরবগাথা'গুলির সমান মর্যাদা দেওয়া যায় না।

৩। অতঃপর সেই মাঘ মাসেরই এগারো তারিখে (২৫ জানুআরি, অর্থাৎ কংগ্রেসে গীত হবার প্রায় এক মাস পরে) কলকাতায় মহর্ষিভবনে মাঘোৎসবসভায় এই গানটি গাওয়া হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায়। সুতরাং গানটির লক্ষ্য যে স্বয়ং পরব্রহ্ম, তাতে সন্দেহ থাকে না।

শুধু তাই নয়, সেই মাঘোৎসবসভাতেই রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের নবযুগ' নামে যে ভাষণ দেন তার শেষাংশ[৯] এই—

> আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয়যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগ দিতে পারি।
>
> জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর, মানবভাগ্যবিধাতা
>
> —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩১৮ ফাল্গুন, পৃ ২৭২
>
> এবং ভারতী, ১৩১৮ ফাল্গুন, পৃ ১০৮৯

এর থেকে অতি সংগতরূপেই অনুমান করা যায় যে, ধর্মের বৃহৎ ভূমিকায় যিনি বিশ্বেশ্বর বা মানবভাগ্যবিধাতা, দেশপ্রীতির পটভূমিকায় তিনিই ভারতভাগ্যবিধাতা বলে অভিহিত হয়েছেন।[১০]

---

৮ এই মাঘ মাসের ভারতীতে (পৃ ১০২৮) দেখা যায় সরলা দেবীও স্পষ্ট ভাষায় ঈশ্বরকে 'ভারতের ভাগ্যবিধাতা' বলে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং সন্দেহ নেই যে, জনগণ-মন-অধিনায়ক গানের গায়িকার মতেও ঈশ্বরই এই গানটির উদ্দিষ্ট পাত্র।

৯ এই অংশটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

১০ তুলনীয় :—(১) হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে!
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে দেখিনু তোমারে স্বদেশে।···
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে, হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা, মোর সনাতন স্বদেশে।
—উৎসর্গ (১৯০৩-০৪), ৪০ নং

(২) ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।
—বঙ্গদর্শন, ১৩১২ আশ্বিন

ব্রহ্মসংগীত বা ধর্মসংগীতের পর্যায়ভুক্ত হলেও গানটির ভাবদ্যোতনা যে দেশভক্তি সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।[১১] রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি যে ধর্মনিরপেক্ষ নয়, একথা সুবিদিত। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের অনেক স্বদেশী গানের মূলেই আছে ভক্তিমিশ্র দেশাত্মবোধের প্রেরণা। জনগণমন-অধিনায়ক গানটি যে কংগ্রেস এবং মাঘোৎসব উভয়ত্রই গাওয়া হয়েছিল তার কারণ এই যে, দুই জায়গায় গাওয়ার উপযোগিতাই এটির আছে। অর্থাৎ এটি যুগপৎ জাতীয় সংগীত এবং ভগবৎসংগীত।[১২] এইজন্যই এটি প্রথমে 'ধর্মসংগীত' গ্রন্থের (১৯১৪) অন্তর্ভুক্ত হলেও পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এটিকে 'গীতবিতান' গ্রন্থে 'স্বদেশ'-পর্যায়ভুক্ত করেন এবং 'হে মোর চিত্ত', ও 'দেশ দেশ নন্দিত করি' এই দুটি গানেরও পুরোভাগেই স্থাপন করেন।

৪। মাঘোৎসবের পরের দিনই অর্থাৎ ওই মাঘ মাসের বারো তারিখেই (২৬ জানুআরি ১৯১২) বেঙ্গলী পত্রিকায় তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের নিম্নলিখিত গোপন সারকুলারটি প্রকাশিত হয়—

> It has come to my knowledge that an institution known as the '*Santiniketan*' or Brahmacharyasrama at Bolpur in the Birbhum district of Bengal is a place *altogether unsuitable for the education of the sons of Government servants.* As I have information that some Government servants in this province have sent their children there, I think it necessary to ask you to warn any well disposed Government servant whom you may know or believe to have sons at this institution or to be about to send sons

---

১১ মানবভাগ্যবিধাতা বিশ্বেশ্বর বা ব্রহ্মকে লক্ষ করে লিখিত হলেও এই গানের মূল প্রেরণা যে 'দেশাত্মবোধ' সে কথা স্পষ্টভাবেই জানা যায় কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে লিখিত (৩১ আগস্ট ১৯২৭) রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র থেকে (যাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র, দশম পত্র)। আর কংগ্রেসনেতাপ্রমুখ দেশের জনসাধারণ যে প্রথম থেকেই এটিকে দেশভক্তির গান বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, তার পরিচয় এই প্রবন্ধের (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী) বহু স্থানেই দেওয়া হয়েছে।

১২ মহাত্মা গান্ধীও এটিকে একাধারে 'nation[illegible] এবং 'devotional hymn' বলে বর্ণনা করেছেন (*Harijan*, 1946 May 19)

> to it, to withdraw them or refrain from sending them, as the case may be ; *any connection with the institution in question is likely to prejudice the future of the boys who remain pupils of it after the issue of the present warning.*
>
> —*Bengalee*, 1912 Jan. 26, p. 4

মনে রাখা প্রয়োজন, কংগ্রেসে জনগণমন-অধিনায়ক গানটি গাওয়া হয় ডিসেম্বর মাসে এবং পরের জানুআরি মাসেই (তখনই বিদ্যালয়ে ছাত্র ভরতি হবার সময়) এই সারকুলারটি প্রচারিত হয়। আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি সত্যই রাজার স্তাবকের ভূমিকায় নেমে যেতেন তাহলে এরকম সরকারি সারকুলারের প্রয়োজনই হত না।

৩

এবার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মনোভাবের বিশ্লেষণ করা যাক।

গোরা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালের প্রারম্ভে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটিকে যে তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা উপন্যাসটির একেবারে শেষ অধ্যায়ে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ও সংহত আকারে প্রকাশ পেয়েছে গোরার দুএকটি উক্তিতে।—

> আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত।···আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই,...যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা।
>
> —গোরা, অধ্যায় ৭৬

এই ভারতবর্ষের দেবতাই আলোচ্যমান গানটিতে 'ভারতভাগ্যবিধাতা' নামে অভিহিত হয়েছেন। এই গানেও 'ভারতভাগ্যবিধাতা'কে হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই দেবতা বলে গণ্য করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ'-নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনার তারিখ হচ্ছে

১৮ আষাঢ় ১৩১৭ (ইংরেজি ২ জুলাই ১৯১০)। অর্থাৎ গোরা প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরেই এটি রচিত হয়। তাতেও দেখি 'ভারতবিধাতা' গানের মতোই প্রথমে আছে ভারতবর্ষের ভূমূর্তির ধ্যান এবং তার পরে আছে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃতি সর্বসম্প্রদায়ের জনগণের ঐক্যবিধানেরই বাণী। 'তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি' দেবার এবং 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে' মার অভিষেকের কথাই এই রচনাটির মর্মকথা। এই কবিতায় 'উদার ছন্দে পরমানন্দে' যে দেবতাকে বন্দনা করা হয়েছে, বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন জনগণঐক্যবিধায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা।

গোরা উপন্যাসে (১৯১০ জানুআরি) এবং ভারততীর্থ কবিতায় (১৯১০ জুলাই) যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে, জনগণমন-অধিনায়ক রচনায় সেই বাণীই উৎসারিত হয়েছে সংগীতের রূপ ধরে। এই ভাবটি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে অধিকার করে ছিল।

১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশনের কয়েক মাস আগে বিখ্যাত 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি প্রকাশিত হয় (প্রবাসী, ১৩২৪ ভাদ্র, পৃ ৫২২)। লক্ষ করলে দেখা যাবে 'জনগণমন-অধিনায়ক' এবং 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানের আসল ভাব নিগূঢ়ভাবে এক। দুটি গানকে একত্র পড়লে কোনো সংশয় থাকে না যে, 'দেশ দেশ' গানে যাঁকে বলা হয়েছে জাগ্রত ভগবান্, 'জনগণমন' গানে তাঁকেই বলা হয়েছে ভারতভাগ্যবিধাতা।

৪

এবার ১৯১৭ সালের কলকাতা-কংগ্রেসের কথা স্মরণ করা যাক। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস তখন আর মডারেট নেতাদের আয়ত্ত নয়। জাতীয়তাবাদী নেতারাই তখন কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করেছেন। এবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। এই কংগ্রেসের তিন দিনের চারটি গান এবং *India's Prayer* কবিতাটির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম দিনের (২৬ ডিসেম্বর) উদ্‌বোধন হয় যথারীতি বন্দেমাতরম্ গান দিয়ে। তা ছাড়া সেদিন আরও কয়েকটি গান হয়, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি। এ সম্বন্ধে বেঙ্গলী পত্রিকায় (২৭।১২।১৭) আছে—

> A number of other songs were also in the musical programme including Sir Rabindranath's *latest patriotic song*, '*Desa desa nandita kari*'.

প্রথম দিনের কার্যারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর *India's Prayer* কবিতাটি পাঠ করেন। এ বিষয়ে ওই দিনের বেঙ্গলীতেই (২৭।১২।১৭) আছে—

> Then Sir Rabindranath rose to *offer his benediction* in a melodious and inspiring verse specially composed for the occasion.

এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের সরকারি রিপোর্টে (পৃ ১) বলা হয়েছে—

> The Chairman of the Reception Committee then called upon Sir Rabindranath Tagore to read out his *opening invocation*. [১৩]

দ্বিতীয় দিনে গাওয়া হয় সরলা দেবীর 'অতীতগৌরববাহিনি মম বাণি'। তৃতীয় দিন গাওয়া হয় 'জনগণমন-অধিনায়ক'। এই গানটি সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্রাদিতে কি বলা হয়েছিল তার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন।—

১। বেঙ্গলী পত্রিকায় (৩০।১২।১৭) আছে—

> The Congress chorus then chanted the *magnificent song* of Sir Rabindranath Tagore, *Jana-gana-mana*, Maharaja Bahadur of Nattore himself joining in aid of the instrumental music.

২। অমৃতবাজার পত্রিকায় (৩১।১২।১৭) আছে—

> The Indian National Congress sat to-day at 11-30 A. M., the proceedings commencing with an *inspiring patriotic song* of Rabindranath's sung as usual in chorus, the Maharaja of Natore joining in the instrumental music.

---

১৩ জনগণমন-অধিনায়ক এবং *India's Prayer*-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান। ১৯১১ সালে প্রথমটিকে বলা হয়েছিল a song of benediction, আর ১৯১৭ সালে দ্বিতীয়টিকেও benediction বা invocation বলেই বর্ণনা করা হল। বস্তুতঃ দুটিই এক পর্যায়ভুক্ত। দুটিই ভগবৎসমীপে ভারতবর্ষের অন্তরের প্রার্থনা।

৩। অতঃপর স্টেট্স্‌ম্যান-(৩০।১২।১৭)—

A *national song* composed by Sir Rabindranath Tagore having been sung the following resolution was moved.

১৯১১ সালে ইংলিশম্যান ও স্টেট্স্‌ম্যানের মতে যা ছিল রাজভক্তির গান ১৯১৭ সালে তাই দেশভক্তির গান বলে বর্ণিত হল!

ওই দিনের অধিবেশনে কংগ্রেসমঞ্চ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই গানটির সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯১৭ সালের কংগ্রেসের সরকারি রিপোর্টে তৃতীয় দিনের বিবরণ-প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জনের যে বক্তৃতা দেওয়া আছে (পৃ ১০৮) তারই একটি অংশ উদ্‌ধৃত করছি—

Brother delegates, at the very outset I desire to refer to the song to which you have just listened. *It is a song of the glory and victory of India.* We stand here today on this platform for the glory and victory of India (cheers).

এই প্রসঙ্গে বেঙ্গলী পত্রিকায় (৩০।১২।১৭) বলা হয়েছে—

Mr. C. R. Das desired to refer to the song which they had just listened to. It was the *song of the victory of India* (hear, hear). They stood there that day on platform for the glory and victory of India (hear, hear).

অমৃতবাজার পত্রিকাতেও (৩১।১২।১৭) অবিকল এই কথাগুলিই আছে।

১৯১১ সালে গানটি যদি রাজবন্দনারূপে রচিত ও গীত হত তাহলে ১৯১৭ সালে ওটি কংগ্রেসে গীত ও সর্বসম্মতিক্রমে দেশভক্তির গান বলে স্বীকৃত ও বর্ণিত হতে পারত না।

৫

এই সময় থেকেই গানটির জাতীয় চিত্তজয়ের যাত্রা শুরু হয় এবং সেই যাত্রা কিছু পরিমাণে সুগম হয় ইংরেজি অনুবাদের দ্বারা। উক্ত কংগ্রেস

অধিবেশনের অত্যল্পকাল পরেই গানটির কবিকৃত প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় মডার্ন্ রিভিউ পত্রিকায় (১৯১৮ ফেব্রুআরি)। অতঃপর ১৯১৯ সালের ফেব্রুআরি মাসে দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ গানটির আর একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন। অনুবাদের নাম দেন *The Morning Song of India.*[১৪]

১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত নির্বাচন উপলক্ষে দেশে যখন প্রবল বিতর্ক দেখা দেয় তখন ডক্টর জেম্স্ কাজিন্স্ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন (৩ নবেম্বর)। সেই বিবৃতি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে এই গানটি তৎকালে কতখানি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল তা উপলব্ধির সহায়তা হবে।—

> My suggestion is that Dr. Rabindranath's own *intensely patriotic*, ideally stimulating, and at the same time world-embracing *Morning Song of India* (*Jana-gana-mana*) should be confirmed officially as *what it has for almost twenty years been unofficially, namely the true National Anthem of India.*

পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্র জর্মনিতে যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন, 'জনগণমন'ই তার জাতীয় সংগীত বলে স্বীকৃত হয়। অতঃপর পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠাকালেও এই গানটিই জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। সে সময়ে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে গানটি হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত হয়।[১৫] রূপান্তর করার সময়ে গানটি ঈষৎ পরিবর্তিত হলেও এটিতে মূল গানের ভাবাদর্শ বজায় আছে এবং মূলের সুরও অব্যাহত আছে। বস্তুতঃ আজাদ হিন্দ সরকার এই হিন্দুস্থানী রূপটি বাংলা জনগণমন থেকে অভিন্নই মনে করতেন। তাই আরজি হুকুমত-ই-আজাদ হিন্দের নির্দেশনামাতে বলা হয়েছিল—

---

১৪ এই অনুবাদটি কিছু পরিবর্তিত আকারে 'বিশ্বভারতী নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৯৩৪ অক্টোবর, পৃ ৩০-৩১) এবং কবির মৃত্যুর পরে *Poems* নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৫ নেতাজীর নির্দেশে আজাদ হিন্দ সরকারের সচিব-মর্যাদাসম্পন্ন সেক্রেটারি আনন্দমোহন সহায় লয়ালপুরের তরুণ কবি হুসেনের সহায়তায় জনগণমন গানটিকে হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত করেন।—আনন্দমোহনের প্রবন্ধ, নেশন, ১৯৪৯ মার্চ ১০

Tagore's song Jaya-he has become our National Anthem.[১৬]

—*The Diary of a Rebel Daughter of India.*

আজাদ হিন্দ সরকার-কর্তৃক স্বীকৃত হবার পর থেকে ভারতবর্ষের বাইরে ও ভিতরে গানটির জনপ্রিয়তা বিশেষ ভাবে বেড়ে যায়। তাই ১৫ই অগস্ট ১৯৪৭ তারিখের অব্যবহিত পরেই যখন স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রসংগীত নির্বাচনের প্রয়োজন উপস্থিত হয় তখনও এই গানটিই সর্বাগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়। সম্মেলনের সময়ে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ 'জনগণমন'কেই ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত রূপে উপস্থাপিত করেন। তারই ফলে এটি আপন বিশিষ্টতাগুণে বিশ্বজগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়[১৭] এবং তখন থেকে

১৬ যে-সব বিশেষ দিনে এই গানটি গাওয়া হয়েছিল তার মধ্যে তিনটি দিন অবিস্মরণীয় হয়ে আছে :—যেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা জগতের কাছে প্রকাশ্যে ঘোষিত হয় (সিঙ্গাপুর, ১৯৪৩ জুলাই ৫); যেদিন হুকুমত-ই-আজাদ হিন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় (সিঙ্গাপুর, ১৯৪৩ অক্‌টোবর ২১); এবং যেদিন আজাদ হিন্দ বাহিনী মৌডক রণক্ষেত্রে জয়ী হয়ে ভারতভূমিতে প্রথম ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন (মৌডক, ১৯৪৪ মার্চ প্রথমাংশ—ঠিক তারিখটি জানা যায়নি)।—*The Diary of a Rebel Daughter of India* (1945), p. 41, 66 ; *I. N. A. & Its Netaji* by Maj.-Gen. Shah Nawaz Khan (1946) p. 116

১৭ গণপরিষদে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি (১৯৪৮ অগস্ট ২৫)—

When played before a large gathering it was very greatly appreciated, and representatives of many nations asked for a musical score of this new tune which struck them as *distinctive and dignified*. From various countries we received messages of appreciation and congratulation of this tune, which was considered by experts and others as *superior to most of the National Anthems* which they had heard.

—*Hindusthan Standard*, 1948 August 26

আজাদ হিন্দ সরকারের সম্পাদক আনন্দমোহন সহায়ও অনুরূপ উক্তি করেছেন।—

Many highly educated Japanese admitted that our anthem beat theirs in inspiring people and on many occasions they said so publicly. Netaji told me that Germans in Germany told him frankly that although they considered their anthem the best in the world, they found our anthem as inspiring as theirs, if not more,

—*Nation*, 1949 March 10

ভারতবর্ষে এটির রাষ্ট্রসংগীতের মর্যাদালাভের সম্ভাবনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৩ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভায় বলেন,—

> Before finally deciding on a National Anthem it was considered desirable to give trials to orchestral rendering. With this object in view such orchestral renderings have been prepared by experts of Tagore's *Jana-gana-mana*, and a number of military bands have been asked to practise them .. The most important part of National Anthem was the music of it. Therefore it was decided that orchestral renderings of Tagore's song should be examined.
>
> —*Hindusthan Standard*, 1948 March 4

এই পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়েছিল বলেই মনে হয়। কেননা, ওই উক্তির মাস তিনেক পরেই সংবাদপত্রে (৮ জুন) এই আভাস প্রকাশ পায় যে, গণপরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষে জনগণমন গানটিকেই ভারতসরকার রাষ্ট্রসংগীত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এর কয়েকদিন পরে ১২ জুন তারিখের এক সংবাদে উক্ত আভাস সমর্থিত হয়। সংবাদটি এই—

> In a circular issued on the subject the government of India is understood to have stated that the question of having a formal National Anthem has assumed certain urgency···The Government of India considered this matter. They feel that any final decision should be taken by the Constituent Assembly itself. But some interim arrangements have to be made for the playing of anthem even before the final decision is taken. For this purpose they approved of growing practice to play *Jana-gana-mana* on all occasions when the National Anthem is required. The provincial Governments, Embassies and Legations, and the Defence

services are therefore requested to note this provisional direction and to give effect to it.

—*Hindusthan Standard*, 1948 June 13

তখন থেকে এখন পর্যন্ত বৎসরাধিক কাল যাবৎ জনগণমন-অধিনায়ক গানটিই শেষ সিদ্ধান্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসংগীত রূপে প্রযুক্ত হচ্ছে।

শিবাজি ও ইতিহাসের শিক্ষা

শরৎকুমার রায়-প্রণীত 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি'-নামক গ্রন্থের ভূমিকায় (১৯০৮) রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকি তাহা রাজাদের জীবনবৃত্তান্ত, দেশের ইতিবৃত্ত নহে।...তাহা পড়িয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক শিক্ষা লাভ হয় না।.. কি নিয়মে কিসের প্রেরণায় জাতি গড়িয়া উঠে, কিসের শক্তিতে তাহার উন্নতি ঘটে, ঘরের দৃষ্টান্ত লইয়া যদি কেহ সেই তত্ত্বের আলোচনা ভারতবর্ষে করিতে চায়, তবে কেবলমাত্র মারাঠা ও শিখের ইতিহাস তাহার সম্বল।

বলা বাহুল্য, মারাঠা-ইতিহাসের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন শিবাজি। শিবাজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি অভিমত পোষণ করতেন, তাঁর মতে শিবাজির ইতিহাস আমাদের জন্যে কি শিক্ষা বহন করে, তা জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নন। তাই এ বিষয়ে তাঁর অভিমতের মূল্য কতখানি তাও দেখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা না করে শুধু দু-একটি মাত্র দিকের পরিচয় দিয়েই নিরস্ত হব।

শিবাজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে ঔৎসুক্য অনুভব করেন বলতে পারি না। তাঁর 'গুরুগোবিন্দ' কবিতার ('মানসী' কাব্য) রচনাকাল ১৮৮৮ সাল। সুতরাং তার কাছাকাছি সময়েই তিনি ভারত-ইতিহাসের অন্যতম মহানায়ক শিবাজির কার্যকলাপ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু 'কথা' কাব্যের অন্তর্গত 'প্রতিনিধি' (১৮৯৭) কবিতার পূর্বে তাঁর কোনো রচনাতেই শিবাজির কথা পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। ওই কবিতাটিতে শিবাজিকে ধর্মগুরু রামদাসের (১৬০৮-৮১) প্রতিনিধি রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। রাজশিষ্যের প্রতি গুরুর নির্দেশ এই—

> তোমারে করিল বিধি
> ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
> রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
> পালিবে যে রাজধর্ম

জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

আচার্য যদুনাথও এই কাহিনীটিকে অনৈতিহাসিক বলে প্রত্যাখ্যান করেন নি। তাঁর বাংলা 'শিবাজী' গ্রন্থে (ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ ২৪০) আছে—

> রাজ্যের প্রকৃত স্বত্বাধিকারী যখন এক সন্ন্যাসী, তখন সেই সন্ন্যাসীর গেরুয়া-বস্ত্র শিবাজির রাজপতাকা হইল—ইহার নাম 'ভাগবে ঝাণ্ডা'।

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি যা-ইহক, এর দ্বারা রাজা হিসাবেও শিবাজির ধর্মনিষ্ঠতা সূচিত হচ্ছে সন্দেহাতীতরূপে। রবীন্দ্রনাথ শিবাজির এই ধর্মনিষ্ঠতার দ্বারাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন; তাঁর পরবর্তী রচনাতেও তার প্রমাণ আছে।

'প্রতিনিধি' কবিতাটি যে-সময়ে রচিত হয় তার কাছাকাছি সময়েই মহারাষ্ট্র দেশে 'শিবাজি-উৎসব' অনুষ্ঠানের রীতি প্রবর্তিত হয়। তার অল্পকাল পরেই সখারাম গণেশ দেউস্করের উদ্‌যোগে বাংলা দেশেও শিবাজি-উৎসব অনুষ্ঠানের আগ্রহ দেখা যায়। বাংলা দেশে প্রথম শিবাজি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯০২ সালে। রবীন্দ্রনাথও অচিরেই এই উৎসবের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১৯০৪ সালের উৎসব উপলক্ষে সখারাম গণেশ দেউস্কর 'শিবাজির দীক্ষা' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন এবং এটি শিবাজি-উৎসব সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরিত হয়। এই পুস্তিকারই ভূমিকা-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজি-উৎসব' নামক বিখ্যাত কবিতাটি লিখে দেন। এই কবিতাটিতেও তিনি শিবাজির বীর্যময় ধর্মনিষ্ঠতার উপরেই জোর দিলেন; তাঁর কর্মকীর্তিকে তিনি পুণ্য-চেষ্টা ও সত্যসাধন বলে বর্ণনা করলেন, তাঁকে আখ্যা দিলেন 'রাজতপস্বী বীর' ও 'ধর্মরাজ'। আর ঘোষণা করলেন শিবাজির আদর্শ স্বীকারের সংকল্পবচন।—

সেদিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দরিদ্রের বল।

'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে', এ মহাবচন
করিব সম্বল ॥

এখানেও 'ভাগবে ঝাণ্ডা', ভাগবত পতাকা, উন্নয়নের কথা পাচ্ছি আর পাচ্ছি সমগ্র ভারতে এক ধর্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার আদর্শ। এই কবিতা রচনার কয়েক মাস পরে লিখিত 'ধম্মপদং' প্রবন্ধেও (বঙ্গদর্শন, ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ) দেখি রবীন্দ্রনাথ ধর্মনিষ্ঠাকেই শিবাজির কর্মসাধনার মূলকথা বলে স্বীকার করেছেন।—

> আমাদের দেশে মোগলশাসনকালে শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজীর ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন।
>
> —ধম্মপদং (১৯০৫), ভারতবর্ষ

এই যে ধর্মপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্র তাকেই শিবাজি-উৎসব কবিতায় বলা হয়েছে 'ধর্মরাজ্য' এবং এইজন্যই শিবাজিকে বলা হয়েছে 'ধর্মরাজ'। প্রশ্ন হতে পারে—শিবাজির ধর্ম কি সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম নয়, এবং তাঁর ধর্মরাজ্য হিন্দুস্বরাজ নয়? যদি তাই হয়, তবে শিবাজিকে আধুনিক কালেও আদর্শ বলে স্বীকার করা যায় কিরূপে? বস্তুতঃ শিবাজি-উৎসব কবিতাটির জন্যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনী-রচয়িতা প্রভাতকুমারও সাম্প্রদায়িকতার বিচারে এই কবিতাটির মধ্যে 'দুর্বলতা' আছে বলে মনে করেন। অহিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা শিবাজি তথা শিবাজি-উৎসব কবিতা সম্বন্ধে কি ভাব পোষণ করেন বা করতে পারেন তা আমাদের বিচার্য নয়। ইতিহাস শিবাজি সম্বন্ধে কি বলে দেখা প্রয়োজন।

যদুনাথকৃত 'শিবাজী' গ্রন্থে (ত্রয়োদশ অধ্যায়) আছে রামদাস এক পত্রে শিবাজিকে সম্বোধন করে বলেন,—'হে ধার্মিক বীর,···পৃথিবী তোলপাড় হইয়াছে; ধর্ম লোপ পাইয়াছে।···ধর্ম সংস্থাপনের জন্য নিজ কীর্তি অমর রাখিও।' অতঃপর যদুনাথ নিজে বলছেন—

> শিবাজী শেষ বয়সে রাজকার্যে সর্বদা স্বামীর উপদেশ লইতেন। রামদাসের শিক্ষায় ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের অনির্বচনীয় সামঞ্জস্য

হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত এবং জটিল রাজনৈতিক সমস্যায় শিবাজীর প্রতি উপদেশ মহারাষ্ট্র-স্বাধীনতার সাধনাকে সিদ্ধির সহজ পথে আনিয়া দেয়। রামদাসের ধর্মশিক্ষাকে 'ফলিত ভগবদ্‌গীতা' বলা যাইতে পারে; তাঁহার শিষ্য গীতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন।

—'শিবাজী', ত্রয়োদশ অধ্যায়

'শিবাজি-উৎসব' কবিতায় (১৯০৪) রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্য রবে,
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে।
অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন 'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী।
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে,
নিশ্চয় সে জানি॥

এই উক্তি কবিমনের উচ্ছ্বাস মাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ যে এ কথাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করতেন তার প্রমাণ আছে। পূর্বোক্ত 'শিবাজী ও মারাঠা-জাতি' গ্রন্থের ভূমিকায় (১৯০৮) তিনি একস্থানে বলেছেন—

মারাঠার ধর্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মথিত হইতেছিল। শিবাজীর প্রতিভা সেই মন্থন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা সমস্ত দেশের ধর্মোদ্বোধনের সহিত জড়িত, এই জন্যই দেশের শক্তিতে তিনি ধন্য ও তাঁহার শক্তিতে দেশ ধন্য হইয়াছে।

যদি একথা সত্য হইত যে, শিবাজী প্রতিভাশালী দস্যুমাত্র, তিনি নিজের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতাবিস্তারের জন্য অসামান্য কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন,—তবে তাঁহার সেই দস্যুতাকে অবলম্বন

করিয়া কখনই সমস্ত মারাঠাজাতি এক হইয়া উঠিত না। বিশেষতঃ শিবাজী যখন অওরঙ্গজেবের জালে জড়িত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূরে যাপন করিতে হইয়াছিল, তখনও যে তাঁহার কীর্তি ভাঙিয়া ভূমিসাৎ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশের ধর্মবুদ্ধির সহিত তাঁহার চেষ্টার যোগ ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার সাধনা সমস্ত দেশেরই ধর্ম-সাধনার একটি বিশেষ প্রকাশ। এই ধর্মসাধনার আহ্বানেই খণ্ড খণ্ড মারাঠা আপনার বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র সম্মিলিত করিয়া মঙ্গল উদ্দেশ্যের নিকট নিবেদন করিতে পারিয়াছিল, লুণ্ঠনের ভাগ লইয়া ক্ষমতার ভাগ লইয়া পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে নাই।

—'শিবাজী ও মারাঠাজাতি,' ভূমিকা

এর থেকে বোঝা যায়, কেন রবীন্দ্রনাথ শিবাজিকে 'ধর্মরাজ' ও তাঁর আকাঙ্ক্ষিত রাজ্যকে 'ধর্মরাজ্য' আখ্যা দিয়েছিলেন। শিবাজির ধর্ম ও ধর্ম-রাজ্যের আদর্শে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল কিনা তাও দেখা দরকার। প্রথমেই দেখতে হবে রবীন্দ্রনাথ নিজে 'ধর্ম' কথার দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকাতেই মারাঠাশক্তির উত্থান-পতনের কারণ বিশ্লেষণ উপলক্ষে তিনি বলেন—

অবশেষে যখন একদিন সেই ধর্মসাধনা স্বার্থসাধনে বিকৃত হইয়া গেল, তখন সমস্ত দেশের শক্তি আর একত্র মিলিতে পারিল না, তখন পরস্পর অবিশ্বাস ঈর্ষা বিশ্বাসঘাতকতা বটগাছের শিকড়-জালের মত মারাঠা প্রতাপের বিশাল হর্ম্যকে ভিত্তিতে ভিত্তিতে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দিল। ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল এবং স্বার্থই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে—ইহাই মারাঠা অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস।…ধর্মের উদার ঐক্য দেশের ভেদবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়া দিলে তবেই দেশের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় সফলতা লাভ করে, ইহাই মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের শিক্ষা; ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রবল প্রতাপও আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।

—'শিবাজী ও মারাঠাজাতি', ভূমিকা

অর্থাৎ 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ, হত এব হন্তি'। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। এই ধর্ম হচ্ছে নিত্যধর্ম বা বিশ্বজনীন ধর্ম; এ ধর্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনো সম্পর্ক নেই। যে বুদ্ধি মানুষকে স্বার্থত্যাগে প্রণোদনা দেয়, সমস্ত ভেদবিভেদ লঙ্ঘনে সহায়তা করে, তাকেই তিনি বলেন ধর্মবুদ্ধি। এই ধর্মের বিপরীত 'বিধর্ম' নয়, এর বিপরীত 'অধর্ম'।

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

এটি হচ্ছে রবীন্দ্রদর্শনের একটি গোড়ার তত্ত্ব, একথা আজ সুবিদিত। মারাঠা-ইতিহাস থেকেও তিনি এই তত্ত্বের শিক্ষাই পেয়েছেন। যতদিন মারাঠাশক্তি ধর্মাশ্রয়ী ছিল ততদিন অকল্যাণ দেখা দেয়নি, আর যখন সে শক্তি ধর্মকে ছেড়ে অধর্মকে আশ্রয় করল তখনই ঘটল পতন। শিবাজিকে আশ্রয় করেই ধর্মের প্রভাব মারাঠাজাতিকে অভ্যুদয়ের পথে প্রেরণা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এর দ্বারা কোনো সম্প্রদায়-সেবিত বিশেষ ধর্মের কথা বলেন নি, বিশ্বজনীন ও চিরন্তন মানবিক ধর্মের কথাই তিনি বলেছেন। সুতরাং 'ধর্মরাজ্য' বলতেও তিনি কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মরাজ্যের কথা ভাবেন নি।

'এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি', এতবড় ভাবনা শিবাজির মনে দেখা দিয়েছিল কিনা জানি না; রবীন্দ্রনাথের মনে যে দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। যে শক্তি স্বার্থকে সংযত ও অনৈক্যকে নিরস্ত করে সকলকে একই কল্যাণক্ষেত্রে মিলিত করে তারই নাম ধর্ম। এই ধর্মশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে রাজ্য, সেই ধর্মরাজ্যই খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একসূত্রে বাঁধতে পারে। কোনো সাম্প্রদায়িক রাজ্য তা পারে না,—রবীন্দ্রনাথ যে একথা বিশ্বাস করতেন তার প্রমাণ আছে।

সমস্ত অনৈক্য ও ভেদবিচ্ছেদকে নিরাকৃত করে সমগ্র ভারতে এক ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে পরবর্তী কালেও প্রদীপ্ত করে রেখেছিল। তার প্রমাণ 'ভারততীর্থ' কবিতা (১৯১০) ও 'ভারতবিধাতা' গান (১৯১১)।

এস হে আর্য, এস অনার্য, হিন্দুমুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ, এস এস খ্রীষ্টান।

মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্রকরা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এই আদর্শ বস্তুতঃ খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মশক্তিপাশে বেঁধে দেওয়ারই প্রকারভেদ এবং স্পষ্টতর রূপ মাত্র। জনগণের 'ঐক্যবিধায়ক' ভারতবিধাতাকে সম্বোধন করে যখন কবি বললেন—

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্যহিমাচল যমুনা-গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা॥

তখন কি 'এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি', এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় নি? বলতে গেলে 'ভারততীর্থ' ও 'ভারতবিধাতা' রচনা দুটি এই উক্তিরই মহাভাষ্য মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিবাজির অভ্যুদয়ের মূলে ছিল 'ধর্মের উদার ঐক্য'; এই ধর্মগত উদার ঐক্যই ছিল তাঁর ধর্মরাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা-ভূমি। ভারতবিধাতা গানের দ্বিতীয় স্তবকটিও 'ধর্মের উদার ঐক্য' কথার বিশদ ব্যাখ্যা বললে অন্যায় হয় না।

এখন দেখা যাক শিবাজি যে ধর্মের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তা বস্তুতঃই অসাম্প্রদায়িক ও খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত-ভারতকে এক ধর্মরাজ্য-পাশে বেঁধে দেবার পরিপোষক ছিল কি না। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে আচার্য যদুনাথের অভিমতই উদ্ধৃত করছি।

> তিনি [শিবাজি] নিজে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।...অথচ যুদ্ধযাত্রায় কোথাও একখানি কোরান পাইলে তাহা নষ্ট বা অপবিত্র না করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিতেন এবং পরে কোনো মুসলমানকে

তাহা দান করিতেন; মসজিদ ও ইসলামী মঠ দেখিলে তাহা আক্রমণ না করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। গোঁড়া মুসলমান ঐতিহাসিক খাফি খাঁ শিবাজির মৃত্যুর বর্ণনায় লিখিয়াছেন, 'কাফির জেহান্নমে গেল'; কিন্তু তিনিও শিবাজীর সৎ চরিত্র, দয়াদাক্ষিণ্য এবং সর্বধর্মে সমান সম্মান প্রভৃতি দুর্লভ গুণের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। শিবাজীর রাজ্য ছিল 'হিন্দবী-স্বরাজ', অথচ অনেক মুসলমান তাঁহার অধীনে চাকরী পাইয়াছিল, উচ্চপদে উঠিয়াছিল।

—শিবাজী, চতুর্দশ অধ্যায়

অতঃপর শিবাজি সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথের শেষ সিদ্ধান্ত এই।—

সর্ব জাতি, সর্ব সম্প্রদায় তাঁহার রাজ্যে নিজ নিজ উপাসনার স্বাধীনতা এবং সংসারে উন্নতি করিবার সমান সুযোগ পাইত। দেশে শান্তি ও সুবিচার, সুনীতির জয় এবং প্রজার ধনমান রক্ষা তাঁহারই দান। ভারতবর্ষের মত নানা বর্ণ ও ধর্মের লোক লইয়া গঠিত দেশে শিবাজির অনুসৃত এই রাজনীতি অপেক্ষা অধিক উদার ও শ্রেয়ঃ কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না।

—শিবাজী, চতুর্দশ অধ্যায়

অতঃপর বোধ করি একথা স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ শিবাজি সম্বন্ধে 'ধর্মের উদার ঐক্য' ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ আরোপ করে অপাত্রে প্রশস্তি বর্ষণ করেন নি, এবং পরোক্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেন নি।

খাফি খাঁর ন্যায় ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথও শিবাজির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। শিবাজিকে তিনি robber, wicked, treacherous ইত্যাদি বিশেষণেই ভূষিত করেছেন। এই স্মিথও লিখতে বাধ্য হয়েছেন—

Sivaji possessed and practised certain special virtues which nobody would have expected to find in a man occupying his position in his time and surroundings. It is a curious fact that the fullest account of those special virtues is to be found in the pages of the Muhammadan historian, Khafi Khan, who ordinarily writes of Sivaji as 'the reprobater', 'a sharp son of the devil', 'a father

of fraud' and so forth. An author who habitually applies such terms of abuse to his subject cannot be suspected of undue partiality towards him. Nevertheless Khafi Khan honours himself as well as Sivaji by the following passage :

...He made it a rule that wherever his followers went plundering, they should do no harm to the mosque, the Book of God, or the women of any one. Whenever a copy of the Kuran came into his hands, he treated it with respect, and gave it to some of his Musalman followers.

—*Oxford History of India*, pp. 432-33

দেখা যাচ্ছে শিবাজির মুসলমান অনুচরও ছিল, অথচ তিনি ছিলেন দিল্লি বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার মুসলমান রাজাদেরই শত্রু। যে সময়ে তাঁর পরমশত্রু ঔরঙ্গজীব মন্দির ধ্বংস ও জিজিয়া কর স্থাপনের দ্বারা হিন্দুদের ঐকান্তিক বিরাগভাজন হয়েছিলেন, সে সময়েই হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু শিবাজি কোরান-মস্‌জিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও মুসলমান পীর কর্মচারী ও সৈনিক অনুচরদের আস্থাভাজন ছিলেন। এর চেয়ে মহত্তর আদর্শ আর কি হতে পারে? শিবাজির অনুসৃত ধর্মনীতিকে যদি অসাম্প্রদায়িক বলে স্বীকার করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই তা ইতিহাসবিরুদ্ধ হবে না। ব্যক্তি-হিসাবে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হলেও রাজা-হিসাবে তিনি ছিলেন সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ নিত্যধর্মের উপর নির্ভরশীল।

শিবাজির ধর্মগত উদারতা সম্বন্ধে যদুনাথ তাঁর ইংরেজি শিবাজী গ্রন্থে বলেছেন—

Religion remained with him an ever fresh fountain of right conduct and generosity ; it did not obsess his mind nor harden him into a bigot. The sincerity of his faith is proved by *his impartial respect for holy men of all sects (Muslim as much as Hindu) and toleration of all creeds.* His chivalry to women and strict enforcement of morality in his camp was a wonder in that age and

extorted the admiration of hostile critics like Khafi Khan. How well he deserved to be king is proved by his equal treatment and justice to all men within his realm, *his protection and endowment of all religions,* his care for the peasantry. (বক্রলিপি লেখককৃত।)

—*Shivaji, Chapter XIV*

তবে কেন শিবাজির ধর্মরাজ্য স্থায়ী হল না ? তবে কেন মারাঠারা শেষ পর্যন্ত একটি সুসংবদ্ধ পূর্ণাবয়ব রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা নেশনে পরিণত হতে পারল না ? 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' গ্রন্থের (১৯০৮) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের যে উত্তর দেন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 'ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল এবং স্বার্থই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে, ইহাই মারাঠা অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস।' শিবাজির 'ধর্মসাধনা' একদিন তাঁর উত্তরাধিকারীদের 'স্বার্থসাধনে' বিকৃত হয়ে গেল এবং ঈর্ষা অবিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতায় মারাঠাপ্রতাপের হর্ম্য দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল। এই ব্যাখ্যাও যথেষ্ট নয়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ মারাঠাদের পতনের কারণ আরও গভীরভাবে নির্ণয় করেন। তাঁর সে অভিমত পাওয়া যায় শরৎকুমার রায় প্রণীত 'শিখগুরু ও শিখজাতি' পুস্তকের ভূমিকায় (১৯১১)। এই প্রবন্ধে শিখ-ইতিহাসের তুলনায় মারাঠাশক্তির উত্থানপতনের কারণও আলোচিত হয়েছে। শিবাজির অভিপ্রায় ও লক্ষ সম্বন্ধে তিনি তাতে বলেন—

> শিবাজী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়া লইয়াই ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্রে মারাঠাজাতির অবতারণ করিয়াছিলেন ; তিনি দেশজয় শত্রুবিনাশ রাজ্যবিস্তার যাহা কিছু করিয়াছেন সমস্তই ভারতব্যাপী একটি বৃহৎ সংকল্পের অঙ্গ ছিল।…
>
> শিবাজী যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা কোনো ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাহার প্রধান কারণ তিনি যে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মকে মুসলমান শাসন হইতে মুক্তিদান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা আয়তনে…ব্যাপক ; সুতরাং সমগ্র ভারতের

ইতিহাসকেই নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।...

শিবাজী যে-সকল যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা সোপান-পরম্পরার মত; তাহা রাগারাগি-লড়ালড়ি মাত্র নহে। তাহা সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং দূর কালকে লক্ষ্য করিয়া একটি বৃহৎ আয়োজন বিস্তার করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি বিপুল আনুপূর্বিকতা ছিল। তাহা কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রকাশ নহে, তাহা একটি অভিপ্রায় সাধনের উদ্‌যোগ।

—'শিখগুরু ও শিখজাতি', ভূমিকা

এই মহৎ অভিপ্রায় ও বৃহৎ আয়োজন শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে ও সুদূরকালে ব্যাপ্ত না হয়ে অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই ব্যর্থ হয়ে গেল কেন? রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই—'শিবাজীর মনে যাহা বিশুদ্ধ ছিল, পেশোয়াদের মধ্যে তাহা ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতারূপে কলুষিত হইয়া উঠিল'। তারই বা কারণ কি? কারণ এই—'শিবাজীর চিত্ত সমস্ত দেশের লোকের সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। এইজন্য শিবাজীর অভিপ্রায় যাহাই থাক না কেন, তাহার চেষ্টা সমস্ত দেশের চেষ্টারূপে জাগ্রত হইতে পারে নাই, এই জন্যই মারাঠার এই উদ্‌যোগ পরিণামে ভারতের অন্যান্য জাতির পক্ষে বর্গির উপদ্রবরূপে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছিল।'

শিবাজির অভিপ্রায় ও চেষ্টা যে সমস্ত দেশের অভিপ্রায় ও চেষ্টা হয়ে উঠতে পারেনি, রবীন্দ্রনাথের মতে তার কারণ আমাদের সমাজের বিচ্ছিন্নতা। ঐক্যই ভাবকে ধারণ করে রাখতে পারে। আমাদের সমাজে সমস্ত মহৎ ভাব তার বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। এইজন্য 'আমাদের দেশে শক্তির উদ্‌ভব হয়, কিন্তু তাহার ধারাবাহিকতা থাকে না। মহাপুরুষেরা আসেন এবং তাঁহারা চলিয়া যান, তাঁহাদের আবির্ভাবকে ধারণ করিবার, পালন করিবার, তাহাকে পূর্ণ পরিণত করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক সুযোগ এখানে নাই।... এইজন্য মহৎ চেষ্টা বৃহৎ চেষ্টা হইয়া উঠে না এবং মহাপুরুষ দেশের সর্বসাধারণের অক্ষমতাকে সমুজ্জ্বলভাবে সপ্রমাণ করিয়া নির্বাণ লাভ করেন।'

এখানেই শিবাজির রাষ্ট্রসাধনার দুর্বলতা। যে হিন্দুসমাজকে তিনি

রাষ্ট্রসাধনায় প্রবর্তনা দিলেন তাকেই তিনি ওই সাধনার যোগ্য করে গড়ে তুলতে চেষ্টিত হন নি। এটাই হচ্ছে মারাঠা-সাধনার ব্যর্থতার গোড়ার কথা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

> শিবাজী সমসাময়িক মারাঠা হিন্দু সমাজে একটা প্রবল ভাবের প্রবর্তন এতটা পর্যন্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অভাবেও কিছুদিন পর্যন্ত তাহার বেগ নিঃশেষিত হয় নাই। কিন্তু শিবাজী সেই ভাবের আধারটিকে পাকা করিয়া তুলিতে পারেন নাই, এমন কি, চেষ্টা মাত্র করেন নাই। সমাজের বড় বড় ছিদ্রগুলির দিকে না তাকাইয়া তাহাকে লইয়া ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিলেন।...শিবাজী যে হিন্দু সমাজকে মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারগত বিভাগবিচ্ছেদ সেই সমাজের একেবারে মূলের জিনিস। সেই বিভাগমূলক সমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা—ইহাই অসাধ্যসাধন।
>
> শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দুসমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে।...সেই শতদীর্ণ ধর্মসমাজের স্বারাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে।
>
> —'শিখগুরু ও শিখজাতি', ভূমিকা

শিবাজি সমস্ত ভেদবিভাগ দূর করে বৃহৎ হিন্দুসমাজকে স্বরাজসাধনার যোগ্য করে গড়ে তুলতে চেষ্টিত হননি, ফলে তাঁর মহৎ সংকল্প ও অভিপ্রায় ওই সমাজের ছিদ্রপথেই নির্গত হয়ে যায়, মারাঠা শক্তির ব্যর্থতা সম্বন্ধে এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত অভিমত। ইদানীংকালে মহাত্মাজির স্বরাজসাধনা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের এই আশঙ্কা ছিল। তাই তাঁকে পুনঃ পুনঃ সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করতে হয়েছিল।

শিবাজির ব্যর্থতা ও মারাঠাশক্তির পতন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত আচার্য যদুনাথের কাছেও পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। মারাঠা রাজ্যের পতনের বিভিন্ন কারণের মধ্যে জাতিভেদকেই তিনি প্রথম স্থান দিয়েছেন। 'শিখগুরু ও শিখজাতি' গ্রন্থের পূর্বোক্ত ভূমিকাটি যদুনাথ ইংরেজিতে অনুবাদ

করে *The Rise and Fall of the Sikh Power* নামে মডার্ন্ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেন (১৯১১ এপ্রিল)। যদুনাথের ইংরেজি শিবাজী গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। তাতে দেখা যায় তিনি শিবাজির ব্যর্থতার কারণনির্ণয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে তাঁর উক্তি উদ্‌ধৃত করেন। এ প্রসঙ্গে যদুনাথ বলেন—

> Why did Shivaji fail to create an enduring state ?··· An obvious cause was, no doubt, the shortness of his reign, barely ten years after the final rupture with the Mughals in 1670. But this does not furnish the true explanation of his failure. It is doubtful if with a very much longer time at his disposal he could have averted the ruin which befell the Maratha State under the Peshwas, for the same moral canker was at work among the people in the 17th century as in the 18th. The first danger of the new Hindu Kingdom established by him in the Deccan lay in the fact that the national glory and prosperity resulting from the victories of Shivaji and Baji Rao created a reaction in favour of Hindu orthodoxy ; it accentuated caste distinction which ran counter to the homogeneity and simplicity of the poor and politically depressed early Maratha society. Thus, his political success sapped the main foundation of that success.
>
> In the security, power and wealth engendered by their independence, the Marathas of the 18th century forgot the past record of Muslim persecution ;...the social grades turned against each other,...we have unmistakable traces of it as early as the reign of Shivaji. Caste grows by fission. It is antagonistic to national union. In proportion as Shivaji's ideal of a Hindu *Swaraj* was based on orthodoxy, it contained within itself the seed of its own death. —*Shivaji, Chapter* XVI

বাংলা শিবাজী গ্রন্থে যদুনাথ এই কথাই অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। তাও এস্থলে উদ্‌ধৃত করা অনুচিত হবে না।

> মারাঠারা যখন শিবাজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের জন্য খাড়া হয় তখন তাহারা বিজাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তখন তাহারা গরিব ও পরিশ্রমী ছিল, সাদাসিদেভাবে সংসার চালাইত, তখন তাহাদের সমাজে একতা ছিল, জাত বা শ্রেণীর বিশেষ পার্থক্য বা বিবাদ ছিল না। কিন্তু শিবাজীর অনুগ্রহে রাজত্ব পাইয়া বিদেশ লুঠের অর্থে ধনবান্ হইয়া তাহাদের মন হইতে সেই অত্যাচারস্মৃতি এবং তাহাদের সমাজ হইতে সেই সরলতা ও একতা দূর হইল; সাহসের সঙ্গে সঙ্গে অহংকার ও স্বার্থপরতা বাড়িল। ক্রমশঃ সমাজে জাতি-ভেদের বিবাদ উপস্থিত হইল। জাতের সঙ্গে জাত, এমন কি একই জাতের মধ্যে এক শাখার সঙ্গে অপর শাখা বিবাদ করিতে লাগিল। সমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, রাষ্ট্রীয় একতা লোপ পাইল, শিবাজীর অনুষ্ঠান ধূলিসাৎ হইল।...জাতিভেদের বিষ এতই ভীষণ।
>
> —শিবাজী, চতুর্দশ অধ্যায়

মারাঠাশক্তির উত্থান ও পতনের ইতিহাসে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ইদানীং মহাত্মাজির সাধনায় আমরা স্বরাজ লাভ করেছি। কিন্তু সে স্বরাজকে ধারণ করে রাখবার যোগ্যতা আমাদের আছে কি-না, যে-সব ছিদ্রপথে ওই দুঃখলব্ধ সম্পদ্ অন্তর্হিত হবার আশঙ্কা আছে সে-সব ছিদ্রকে রুদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের মনোযোগ গিয়েছে কি না, ভেবে দেখা দরকার এবং অবিলম্বে ওই ছিদ্র নিরসন করে স্বরাজকে ধারণ ও পোষণ করবার যোগ্যতা অর্জনের কাজে উদ্যমসহকারে প্রবৃত্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। তা করতে গেলে মারাঠা-ইতিহাসের কাছ থেকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী চিন্তা স্বদেশ, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, রাজা-প্রজা, সমবায়নীতি প্রভৃতি বহু গ্রন্থে নিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর দর্শনচিন্তার কথাও সুবিদিত; 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থে ও বহু প্রবন্ধে তার পরিচয় আছে। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখা দেয় বাল্যকালেই। এই অনুরাগের নিদর্শন পরিকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর অসংখ্য রচনায় নানা প্রসঙ্গে এবং বিজ্ঞানবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধে। অবশেষে তার পরিণত রূপ প্রকাশ পেয়েছে 'বিশ্বপরিচয়' পুস্তকটিতে। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসপ্রীতিও কম গভীর ছিল না; কাব্যে নাটকে গল্পে উপন্যাসে ভ্রমণকথায় সর্বত্রই তার প্রচুর পরিচয় বিদ্যমান। কিন্তু তার সর্বাধিক নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধগুলিতে। তাঁর এমন প্রবন্ধ কমই আছে যাতে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কিছু না কিছু ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের অবতারণা না করেছেন। বস্তুত: চিন্তনীয় বিষয়মাত্রকেই তিনি দার্শনিক ও ঐতিহাসিক এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতেন, আর এই দ্বিবিধ দৃষ্টিও পরস্পরনিরপেক্ষ নয়। শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টি নয়, গভীর ঐতিহাসিক চিন্তারও পরিচয় আছে তাঁর অনেক প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারাজীবনই বিশ্বমানবতার আদর্শকে অনুসরণ করে চলেছেন এবং তাঁর সাহিত্যজীবনের অন্যতম প্রধান উপজীব্য ছিল মানুষ। সুতরাং তিনি মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ও আগ্রহান্বিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান জাতির ইতিহাসের সঙ্গেই যে তাঁর পরিচয় ছিল তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনাবলীতে কিন্তু তিনি স্বভাবত:ই তাঁর ইতিহাসচিন্তাকে সংহত করেছিলেন ভারত-বর্ষীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহুশতাব্দীব্যাপী বিচিত্র বিবর্তনের প্রতি। ভারতীয় সংস্কৃতির যিনি একজন মুখ্য ব্যাখ্যাতা, তাঁর পক্ষে ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি গভীর আগ্রহ না থাকাই বিচিত্র।

ইতিহাসজ্ঞান ছাড়া যে সংস্কৃতির মর্মার্থ যথার্থভাবে হৃদয়ংগম করা যায় না, এ কথা প্রাচীন ভারতীয়রাও সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। মহাভারত

যে মূলতঃ ইতিহাস, একথা মহাভারতেই পুনঃপুনঃ উক্ত হয়েছে। যেমন আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়েই বলা হয়েছে—

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ॥

অর্থাৎ—'তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সনাতন বেদবিভাগ সমাপ্ত করে সত্যবতী-সুত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই পুণ্য ইতিহাস অর্থাৎ মহাভারত রচনা করেন।' এই অধ্যায়েই পরে বলা হয়েছে—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥

অর্থাৎ—'ইতিহাসপুরাণের জ্ঞানের দ্বারা বেদজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করবে, কেননা ইতিহাসজ্ঞানহীন অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে প্রহার করবে এই ভেবে বেদ ভীত হয়।' ইতিহাস ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না এবং ইতিহাস-জ্ঞানহীনের হাতে বেদ মার খায় অর্থাৎ অপব্যাখ্যাত হয়, দেখা যাচ্ছে এই উপলব্ধি প্রাচীন কালেই হয়েছিল। এইজন্যই অন্যত্র স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—

পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ।

এসব স্থলে ইতিহাস ও পুরাণ জোড়াবুলি একার্থক এবং বেদ বা শ্রুতি তদানীন্তন ভারতীয় সংস্কৃতিরই প্রতীক বলে গ্রহণীয়। ইতিহাস বেদের পরিপূরক, কেননা ইতিহাসের দ্বারাই বেদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়—এই হচ্ছে মহাভারতের অভিমত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে ইতিহাসের স্থান আরও উচ্চে; তাতে ইতিহাসকে অন্যতম বেদ বলেই গণ্য করা হয়েছে এবং অথর্ববেদের পরে ইতিহাসবেদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে ইতিহাস হচ্ছে পঞ্চম বেদ। মহাভারতকে যে পঞ্চম বেদ বলা হয়, তার কারণ মহাভারত হচ্ছে মূলতঃ ইতিহাস। ইতিহাস বেদশিক্ষার পরিপূরকই হক বা অন্যতম বেদ বলেই গণ্য হক, ইতিহাস ছাড়া যে বেদ অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মোপলব্ধি সম্ভব নয়, একথা মহাভারত ও অর্থশাস্ত্র উভয়েরই স্বীকৃত। শুধু বেদার্থ নয়, বিশ্ব-লোকসমাজেরও স্বরূপ প্রকাশিত হয় ইতিহাসের দ্বারা, একথাও আছে মহাভারতে।—

ইতিহাসপ্রদীপেন মোহাবরণঘাতিনা।
লোকগর্ভগৃহং কৃৎস্নং যথাবৎ সম্প্রকাশিতম্ ॥[১]

অর্থাৎ—'মোহাবরণনাশী ইতিহাসপ্রদীপের দ্বারা বিশ্বলোকালয় যথাযথরূপে প্রকাশিত হয়।' যে মোহ বা অজ্ঞতার তিমির লোকজীবনের স্বরূপকে আবৃত করে রাখে তাকে অপসারিত করতে হলে ইতিহাসের প্রদীপ জ্বালানো চাই।

রবীন্দ্রনাথও আমাদের অজ্ঞতার আবরণ মোচন করে ভারতীয় সংস্কৃতি তথা জনজীবনের স্বরূপ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ইতিহাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং ভারত-ইতিহাসের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কি ছিল, তা জানবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই মত হতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা বর্তমান কালেও প্রণিধান-যোগ্যতা হারায় নি। ভারত-ইতিহাসের মূলগত নীতিসূত্রের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তার বিশদ পরিচয় দিতে গেলে তাঁরই উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।—

> যে-সকল দেশ ভাগ্যবান্ তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উলটা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্য-গর্বোদ্‌গারকাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা, তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিক্‌টাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারত-

[১] পুরাণচন্দ্রেণ এবং ইতিহাসপ্রদীপেন ইত্যাদি দুটি অংশ পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বলে গণ্য হয়। কিন্তু তাতেও মূল বক্তব্যের হানি হয় না। প্রক্ষেপগুলিও তো ভারতীয় চিন্তারই প্রকাশ। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং উক্তির সঙ্গেও এগুলির সংগতি আছে। তা ছাড়া বর্তমান মহাভারতের অধিকাংশই যে পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ, এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন।

বর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।…ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে। বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীতে ও বর্তমানে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। যিনি সেতু নির্মাণ করিবেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।… এখন যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে সম্মুখে মূর্তিমান্ করিয়া তুলিবেন, অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আমরা আহ্বান করিতেছি।…হে ঐতিহাসিক, আমাদের দিবার সংগতি কোন্ প্রাচীন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা দেখাইয়া দাও, তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন কর।

—ভারতবর্ষের ইতিহাস ('ভারতবর্ষ') : বঙ্গদর্শন ১৩০৯ ভাদ্র

সকল মানুষের জীবনচরিত যেমন, তেমনি সকল দেশের ইতিহাস এক ভাবের হইতেই পারে না।…ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ছাঁদের ইতিহাসের উপকরণ মেলে না। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষে এক বা একাধিক নেশন কোনো দিন রাষ্ট্রের চাক বাঁধিয়া তুলিতে পারে নাই। সুতরাং এ দেশে কে কবে রাজা হইল, কতদিন রাজত্ব করিল, তাহা লিপিবদ্ধভাবে রক্ষা করিতে দেশের মনে কোনো আগ্রহ জন্মে নাই। ভারতবর্ষের মন যদি রাষ্ট্রগঠনে লিপ্ত থাকিত, তাহা হইলে ইতিহাসের বেশ মোটা মোটা উপকরণ পাওয়া যাইত এবং ঐতিহাসিকের কাজ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে ; তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিন্তু তাহা আজ পর্যন্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত

ভারত ও বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস। সেই যোগটি কী লইয়া? পূর্বে বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লইয়া নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, ধর্ম লইয়া।...

য়ুরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ঐক্য হইতেই পারে না, একথা আমরা বারম্বার ভুলিয়া যাই। যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত-ভবিষ্যৎ বিধৃত, তাহাকে যথার্থভাবে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়—রাজবংশাবলীর জন্য বৃথা আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ নাই। য়ুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, একথা আমাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে।

—ধম্মপদং ('প্রাচীন সাহিত্য') : বঙ্গদর্শন ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ

মিথ্যা-ইতিহাসের কুহেলিকা বা মোহান্ধকারকে নিরসন করে সত্য-ইতিহাসের আলোকে স্বদেশকে উজ্জ্বল করে দেখাবার ব্রতই গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই ইতিহাসসাধনার ফল নিবদ্ধ হয়েছে তাঁর তিরোধানের পরে সংকলিত 'ইতিহাস' গ্রন্থখানিতে (১৩৬২)। এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলির দ্যোতনা ও বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ করলেই রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাসচিন্তার গভীরতা ও বিস্তার সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলি বাদেও রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধ আরও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে সংস্কৃতসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধে, ভারত-ইতিহাসে বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা নিবদ্ধ হয়েছে 'ধম্মপদং' প্রবন্ধে। দুটি প্রবন্ধই সংকলিত হয়েছে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে। ভারতবর্ষ তথা বাংলার ধর্ম ও সমাজের ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে অনুসৃত হয়েছে 'সাহিত্য' পুস্তকের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের

মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে তা গভীর চিন্তার ফল। 'কালান্তর' গ্রন্থের 'বাতায়নিকের পত্র' এবং 'শক্তিপূজা' নামক প্রবন্ধদুটিতেও বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে; এ দুটিকে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধের অনুবৃত্তি বলে মনে করা যায়। 'কালান্তর' প্রবন্ধটিতেও বাংলাদেশের মধ্যযুগের প্রসঙ্গ আছে, আর আছে তার সঙ্গে আধুনিক যুগের সংস্কৃতির তুলনা। রামায়ণকাহিনীকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের সমাজ ও মনোজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হয়েছে 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধটিতে। 'রাজাপ্রজা' গ্রন্থে 'পথ ও পাথেয়' নির্দেশ উপলক্ষেও ইতিহাসেরই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় সুচিন্তিত ইতিহাসপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এই ইতিহাসপ্রসঙ্গগুলিকে বিষয়ানু-ক্রমে সাজিয়ে একত্র সংকলন করবার বিশেষ সার্থকতা আছে। তাতে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ও চিন্তার সমগ্রতা প্রকাশিত হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, অশোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বর্তমান লেখক-কর্তৃক বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে সংকলিত হয়ে 'মহাসম্রাট অশোক' নামে প্রকাশিত হয়েছিল 'ইতিহাস' পত্রিকায় (১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ)[১]। 'তপোবন' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় (১৩১৬ পৌষ) এবং পরে সংকলিত হয় 'শান্তিনিকেতন' ও 'শিক্ষা' গ্রন্থে। এটিতে ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ, বিশেষ করে বিক্রমাদিত্যের যুগ, সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীরচিন্তাপূর্ণ সিদ্ধান্ত সন্নিবদ্ধ হয়েছে। বহু বৎসর পরে 'তপোবন' প্রবন্ধ অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে ভাষণ দেন তা প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায় এবং 'দেশ' থেকে উদ্ধৃত হয় প্রবাসীর 'কষ্টিপাথরে' (১৩৪১ ভাদ্র, পৃ ৬৫৭-৬৫৯)। এই ভাষণটিতে তপোবনের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিণত অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর উল্লেখযোগ্য বাংলার অধ্যাপকরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত প্রথম ভাষণটি। এটি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পুস্তিকা আকারে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' নামে প্রকাশিত হয় (১৯৩২)। বর্তমানে 'শিক্ষা'

১। অশোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত চিন্তাখণ্ডগুলি সামগ্রিকভাবে আলোচিত হয়েছে পূর্ববর্তী 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে অশোক' প্রবন্ধে।

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই রচনাটিতে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের, বিশেষতঃ উপনিষদ্ মহাভারত ও নালন্দা-যুগের, শিক্ষার ইতিহাস অতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-ইতিহাসের এমন সুচিন্তিত বিচার দুর্লভ।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তা ও সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে 'বুদ্ধদেব' নামে একটি প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩৪২ আষাঢ়)। তা ছাড়া আরও অনেক রচনায় বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ গভীর শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী কালে এগুলিকে একত্র সংকলন করে 'বুদ্ধদেব' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে (১৯৫৬)। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ তথা কালিদাসের যুগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিক্ষিপ্ত আলোচনা-গুলিও বিষয়ানুক্রমে সংকলিত হতে পারে। 'কালান্তর' গ্রন্থের 'বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধটি এবং তৎসঙ্গে 'জাভাযাত্রীর পত্র' গ্রন্থটিও স্মরণীয়। এ দুটিতে নানা প্রসঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিস্তার সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক আলোচনা আছে ভারতসংস্কৃতির স্বরূপ অনুধাবনের পক্ষে তার মূল্য কম নয়। অতঃপর রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য, দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তিসংকলনের সার্থকতা সম্বন্ধে বোধ করি দ্বিমত হতে পারে না। 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন' প্রভৃতি গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গে প্রাচীনতম যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির বিবর্তনের কথা আলোচিত হয়েছে। পারস্যভ্রমণ-কাহিনীতে এশিয়ার নবজাগরণের দৃষ্টিতে এবং বৃহত্তর কাল ও ক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিকায় পারসীক ও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। এসব কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

শুধু প্রাচীন ইতিহাস নয়, আধুনিক ইতিহাসের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের নিদর্শন আছে। 'স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাসের গুটিকয়েক সূত্র' নাম দিয়ে তিনি উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি খসড়া রচনা করে পত্রযোগে[১] দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে পাঠিয়েছিলেন। বহুকাল পূর্বে এটি 'ইতিহাস ও আলোচনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপর

১। মূলপত্রখানি রক্ষিত আছে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে। পত্রের তারিখ ১লা অগ্রহায়ণ ১৩১২।

প্রকাশিত হয় শারদীয়সংখ্যা 'যুগান্তর' পত্রিকায় (১৩৫৬)। বর্তমান প্রসঙ্গে এই খসড়া ইতিহাসটিও উপেক্ষণীয় নয়। বাংলার নবজাগরণ-ইতিহাসের তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যে রূপে প্রতিভাত হয়েছিল, তার গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। রবীন্দ্রচিন্তার গতিপ্রকৃতি উপলব্ধির পক্ষেও এটির গুরুত্ব কম নয়। এটি এখনও কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। তাই পাঠকের সাহায্যার্থে এটি বর্তমান প্রবন্ধের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হল।

বোধ করি রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক রচনা 'ঝানসীর রাণী' (১২৮৪) এবং শেষ আলোচনা 'তপোবন' (১৩৪৭)। তাঁর এই দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাস-আলোচনায় মোহেনজোদাড়োর সময় থেকে বাংলার স্বদেশী-আন্দোলনের সময় পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক যুগের কথাই কিছু না কিছু আছে। তাঁর কাব্যে-নাটকেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রায় প্রত্যেক পর্বই উজ্জ্বল হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতীয় রেনেসাঁসের যিনি মুখ্যতম কবিপ্রতিনিধি ও ব্যাখ্যাতা তাঁর কাছে এটাই প্রত্যাশিত। তাঁর কাব্য নাটক তথা প্রবন্ধ আলোচনা করলে দেখা যায় ভারতীয় ইতিহাসের বেদ-উপনিষদ্, বুদ্ধ-অশোক, বিক্রমাদিত্য-কালিদাস, বানভট্ট-হিউএন্থ সাঙ, নানক-কবীর-চৈতন্য এবং শিখ-মারাঠা পর্বের প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল সব চেয়ে বেশি। 'ইতিহাস' পুস্তকে সংকলিত প্রবন্ধগুলি থেকেও অনেকাংশে একথার সমর্থন পাওয়া যাবে।

আরও দেখা যাবে যে, নেহাত তথ্যপুঞ্জের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর আগ্রহ ছিল ইতিহাসের তত্ত্ব ও শিক্ষার প্রতি। ইতিহাসের প্রাণরসের যোগে জাতীয় জীবনকে সব দিক্ থেকে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ইতিহাসের তত্ত্বনির্ণয় নির্ভর করে ঐতিহাসিকের প্রতিভাবৈশিষ্ট্যের উপরে। এইজন্যই ঐতিহাসিকভেদে ইতিহাসব্যাখ্যার পার্থক্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলেছেন—

> ইতিহাস লোকের মুখে মুখে জনশ্রুতি আকারে ছড়াইয়া থাকে; ঐতিহাসিকের প্রতিভা তাহাদিগকে একটি সূত্রের চারি দিকে বাঁধিয়া তুলিবামাত্র এত কালের অব্যক্ত ইতিহাসের ব্যক্তমূর্তি আমাদের কাছে ধরা দেয়।
>
> —সাহিত্য সৃষ্টি, 'সাহিত্য'

এই ঐক্যসূত্রই হচ্ছে ইতিহাসের তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বদৃষ্টি ভারতীয় ইতিহাসের যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কারে নিয়োজিত ছিল, 'ইতিহাস' পুস্তকের প্রবন্ধাবলীতেও তার পরিচয় পাওয়া যাবে। দীর্ঘকাল ধরে রাজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার ও যদুনাথ, এই তিনজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ইতিহাসদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সাহচর্যের ফলে তাঁর নিজের ইতিহাসদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যও পরিপুষ্ট হয়েছিল। তাই তিনি জোর করেই বলতে পেরেছিলেন—

> পূর্ব পশ্চিম রাজাপ্রজা সকলকেই ভারতবর্ষ সকলপ্রকার বিরুদ্ধতার ভিতরেও একক্ষেত্রে আকর্ষণ করবার জন্য চিরদিন চেষ্টা করছে—এই তার ধর্ম, এই তার কাজ। অন্য দেশের পোলিটিক্যাল ইতিহাস থেকে এ-সম্বন্ধে আমি কোনো শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নই, আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের একটি অতি উদার অতি বিরাট্ ইতিহাস সৃষ্টির আয়োজন চলছে, এই আমার নিশ্চয় বিশ্বাস।[১]

এই উক্তিতে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তার স্বাতন্ত্র্য তথা তাঁর স্বীকৃত ভারত-ইতিহাসের মূলতত্ত্ব বা ঐক্যসূত্র দুই-ই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। 'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত বিভিন্ন প্রবন্ধে এই বিশিষ্টতারই পরিচয় পাওয়া যাবে। ভারতীয় ইতিহাসের রবীন্দ্রস্বীকৃত মূলতত্ত্ব গ্রহণীয় হক বা না হক, তার সঙ্গে পরিচয় থাকলে রবীন্দ্রচিন্তারাজ্যে প্রবেশপথ সুগম হবে, অন্ততঃ এটুকু স্বীকার্য এবং এর মূল্যও কম নয়।

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির যে রূপ, তা অনেকাংশেই তাঁর ইতিহাসদর্শনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ইতিহাসদর্শনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁর ভারতসংস্কৃতি ব্যাখ্যার তাৎপর্য অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। 'ইতিহাস' গ্রন্থখানিতে তাঁর ইতিহাসচিন্তা বিষয়ক মুখ্য প্রবন্ধগুলি একত্র সংগৃহীত হওয়াতে রবীন্দ্রসাহিত্য তথা রবীন্দ্রচিন্তার বহু

---

১ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র (২৩ আশ্বিন ১৩১৬)—বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা: ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ, পৃ ৩০০।

কক্ষময়প্রাসাদের আর একটি দ্বার উন্মুক্ত হল। এই দ্বারপথে যাঁরা রবীন্দ্রচিন্তার কক্ষে প্রবেশ করবেন তাঁরাই একটা নূতন আনন্দ ও বিস্ময় অনুভব করবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিস্ময় বা আনন্দ-লাভ ইতিহাস-চর্চার লক্ষ্য নয়; ইতিহাসচর্চার আসল উদ্দেশ্য শিক্ষা, যে শিক্ষা জাতিকে চালনা করে, তাকে নিয়ে যায় তার প্রকৃতি-অনুযায়ী সার্থকতার অভিমুখে। এই হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' গ্রন্থখানির যে গুরুত্ব, তা সুপরিমেয় নয়।

২

আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় বা রাজকীয় ইতিহাসকে ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস; তাঁর মতে ভারতইতিহাসে রাজ-নীতির কাহিনী একান্তভাবেই উপেক্ষণীয়। আমাদের ইতিহাস রাজকীর্তির ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। তথাপি রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ তিন যুগের তিনজন রাজার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এই তিনজন হলেন যথাক্রমে অশোক, আকবর ও শিবাজি। কিন্তু তাঁদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে শ্রদ্ধা তা তাঁদের নিছক রাষ্ট্রকীর্তির জন্য নয়। তাঁদের রাষ্ট্রকীর্তিও ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। আর সে ধর্মও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ছিল না, সে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল উদার বিশ্বজনীনতার বৃহৎ ভূমিকার উপরে। তা ছাড়া, তাঁরা ভারতীয় সমাজের যথার্থ নেতৃত্বপদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে অশোক ও শিবাজির রাজকীর্তির যথার্থ স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এ স্থলে আকবর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমতের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অসংগত হবে না।

ভারতইতিহাসের যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি এক স্থলে বলেছেন—

> আমাদের দেশে মোগলশাসনকালে শিবাজিকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজির ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার

প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল।

—ধম্মপদং ('প্রাচীন সাহিত্য'), বঙ্গদর্শন ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ

অতএব এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই যে, রবীন্দ্রনাথের মতে আদর্শ ভারতীয় রাষ্ট্রসাধনাও ছিল ধর্মসাধনারই অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথের মতে শিবাজির ইতিহাসের যা সত্য, অশোক এবং আকবরের ইতিহাসের সত্যও তাই।—

মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতে মোগলসম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে তার পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে ঐক্যের সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল

—স্বাধিকারপ্রমত্তঃ ('কালান্তর'), প্রবাসী ১৩২৪ মাঘ

অথচ আকবরের রাজনীতি সম্বন্ধে যে অনেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করতেন, সে কথা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। উক্ত বিপরীত মতের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরই একটি উক্তিতে।—

আকবরকে কেহ বলে উদার প্রজাহিতৈষী, কেহ বলে তাঁহার হিন্দুপ্রজার পক্ষে তিনিই যত নষ্টের গোড়া।

—সৌন্দর্যবোধ ('সাহিত্য'), বঙ্গদর্শন ১৩১৩ পৌষ

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে আকবরকে উদার প্রজাহিতৈষী বলেই স্বীকার করতেন তাতে সন্দেহ নেই। উদ্‌ধৃত উক্তিটির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু প্রসঙ্গেই দেখা যায় আকবরের উদারতাই রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি পেয়েছে। বস্তুতঃ দিল্লি-আগ্রার সুলতান-বাদশাহদের মধ্যে একমাত্র আকবরের প্রতিই রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন বলে মনে হয়। আকবর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ

উল্লেখ আছে তাঁর নানা রচনায়। 'ইতিহাসকথা' প্রবন্ধের শেষ পংক্তিগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'শিবাজি ও গুরু গোবিন্দসিংহ' প্রবন্ধেও (১৩১৬ চৈত্র) 'আকবরের উদার রাষ্ট্রনীতি'র উল্লেখ আছে। আর আছে 'আকবর শাহের উদারতা' নামে একটি গল্পে (বালক ১২৯২ আষাঢ়)। এই গল্প রচনার আট বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে চৈতন্য-লাইব্রেরির অধিবেশনে পঠিত 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ' আকবর সম্বন্ধে নিজ অভিমত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন।—

> তিনি [আকবর] ভারতবর্ষের ভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে প্রেম ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন।...আকবর সকল ধর্মের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয়মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত নিষ্ঠার সহিত হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান পারসি ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রী-সভায়, হিন্দু বীরগণকে সেনানায়কতায় আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারা নহে, প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে রাজা প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন।...আকবর যে একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইংরেজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই।[১]
>
> —ইংরেজ ও ভারতবাসী ('রাজা প্রজা'), সাধনা ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক, পৃ ৫২৪-২৫

১ রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে আকবরের প্রসঙ্গ অবতারণ করেছেন এভাবে—"ইংরেজ রাজকবি টেনিসন মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থে সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষকে কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াছেন। কবিবর উক্ত গ্রন্থে 'আকবরের স্বপ্ন' নামক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। আকবর তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ আবুল ফজলের নিকট রাত্রের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষ্যে তাঁহার ধর্মের আদর্শ ও জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছেন।"

আকবরের আদর্শ কেন যে অশোক এবং শিবাজির মতোই রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল, অতঃপর সে বিষয়ে আর কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারেনা।

সর্বশেষে 'ঝানসীর রাণী' নামক প্রবন্ধটির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ভারতীতে (১২৮৪ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির নীচে স্বাক্ষর আছে 'ভ—'। এটি ভানুসিংহ নামের আদ্যক্ষর বলে সহজেই অনুমান করা যায়। এই প্রবন্ধটির ঠিক পরেই আছে ভানুসিংহের কবিতা—'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে' ইত্যাদি। এটি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই শনিবারের চিঠিতে (১৩৪৬ কার্তিক, পৃ ১৫২) 'রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী'তে স্থান পেয়েছিল। অতঃপর আমি 'ঝানসীর রাণী' নামে এক প্রবন্ধে লিখেছিলাম—

> রবীন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থাতেই সিপাহিবিপ্লবের নেত্রী ঝানসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর উপরে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার প্রমাণ আছে। পরবর্তী কালে এই প্রবন্ধটিকেই একটু বাড়িয়ে ও মেজে ঘষে প্রথম বর্ষের ভারতীতে (১২৮৪ অগ্রহায়ণ) প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটিতে ষোলো বছরের বালক দেশানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে যে গভীর চিন্তাশীলতা ও পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। আজ প্রায় সত্তর বছর পরেও প্রবন্ধটির মূল্যহানি ঘটেনি।
>
> —আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫২ বার্ষিক সংখ্যা, পৃ ৩১

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অনেক অংশ উদ্‌ধৃত ও আলোচিত হয়েছিল।

শ্রীমতী মালতী সেন রবীন্দ্রনাথের যে পাণ্ডুলিপিখানি বিশ্বভারতীকে উপহার দেন, সেটি এখন 'মালতীপুঁথি' নামে পরিচিত। এখানিই রবীন্দ্র-

---

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৩০০ সালের বৈশাখ-সংখ্যা সাধনা পত্রিকার 'সারসংগ্রহ' বিভাগে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আকবরের স্বপ্ন' কবিতাটির সারমর্ম প্রকাশ করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছে, টেনিসনের (১৮০৯-৯২) "মৃত্যুর পর সম্প্রতি উক্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।"—সাধনা ১৩০০ বৈশাখ, পৃ ৫২১

এই প্রবন্ধ শুনিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে 'প্রশংসাবাক্য' ও 'সমাদর' লাভ করেছিলেন।

নাথের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি এবং বর্তমানে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে (২৩১-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি)। এই পুঁথিটিতে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থার একটি সাপ্তাহিক রুটিন বা পাঠক্রমও রক্ষিত আছে। তাতে দেখা যায় সোম ও বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট ছিল ইংলণ্ডের ইতিহাসের জন্য, আর ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল মঙ্গল ও শনিবার। আর রবিবার ছিল Exercises করবার দিন। এই পুঁথিটিতে বহু বিচিত্র বিষয় স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় কুমারসম্ভব কাব্যের যে পদ্যানুবাদ করেছিলেন বলে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায়, তাও এটিতে রক্ষিত আছে। পরবর্তী কালে এটি মার্জিতরূপে ভারতীতে (১২৮৪ মাঘ) প্রকাশিত হয় 'মদনভস্ম' নামে। এই পুঁথিতেই 'ঝান্সীর রাণী' নামে একটি খণ্ডিত রচনা আছে (পাণ্ডুলিপি, পৃ ৩২)। এই প্রবন্ধের শেষে এই খণ্ডিত রচনাটি অবিকল রূপে মুদ্রিত হল। এটির ভাষা ও রচনাপ্রণালীর প্রতি একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, এটি কোনো ইংরেজি লেখার অনুসরণে রচিত। ভারতীর প্রবন্ধটি যে এটিরই মার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ, দুটি রচনার মধ্যে একটু তুলনা করলেই তা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হবে।

পরিশিষ্ট

১. ঝান্সীর রাণী

ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ঝান্সীর বিধবা রাণীর রাজ্য হস্তগত করিলেন এবং তাঁহার রাজকোষে যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল তাহাও অপহরণ করিলেন। এইরূপে রাজ্যহীনা সম্পত্তিহীনা তেজস্বিনী রাজ্ঞী এই নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন, এবং যেমন শুনিলেন, কম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে অমনি, তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে সুকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। লক্ষ্মীবাঈর বয়স বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক হইবে, অত্যন্ত সুন্দরী, এবং তাঁহার শরীর ও মন সমান বলিষ্ঠ।

ঝান্সী নগরী অত্যন্ত পরিপাটি ছিল ; সরোবর ও বৃহৎ বৃক্ষাবলীর কুঞ্জ-মধ্যে স্থাপিত। চতুর্দ্দিকে দৃঢ় প্রাচীর। একটি শৈলের উপর দুর্গবদ্ধ

রাজপ্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে। বিদ্রোহের সময় ইংরাজরা সংবাদ পাইলেন যে ঝান্সীরাজ্ঞির এক ভৃত্য লক্ষ্মণরাও সৈনিকদের বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে, এবং স্থানে স্থানে এই নিমিত্ত গুপ্তচর নিয়োজিত হইয়াছে। অবশেষে ঝান্সী নগরীতে বিদ্রোহ-অগ্নি জলিয়া উঠিল। ক্যাপটেন ডানলপ হত হইলেন। নগরীস্থ ইংরাজেরা ছদ্মবেশে পলাইতে আরম্ভ করিল কিন্তু ধৃত ও হত হইল। ঝান্সীর বিদ্রোহী সৈন্যদের দ্বারা ইংরাজেরা পরাজিত হইলেন এবং লক্ষ্মীবাঈ তাঁহার পৈত্রিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন (1859)।[১]

1858—সার হিউ রোস্ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে ঝান্সীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গ্রানিটপ্রস্তরনির্মিত, উচ্চ শৈলে স্থাপিত, নগর-প্রাচীরে ব্রিটিশ কামান গোলাবর্ষণ করিল। দুর্গ হইতে স্ত্রীলোকেরা কামান ছুড়িতে লাগিল, সৈনিকের খাদ্যাদি বহন করিতে লাগিল। ৩১ মার্চ রাণী দেখিলেন ইংরাজ শিবির পার্শ্বে তাঁতিয়া টোপী ও বানপুররাজের সৈন্যদল সঙ্কেত অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছে, হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝান্সী দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পর দিন তাঁতিয়া টোপী ইংরাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু ১৫০০ লোক নিহত রাখিয়া, ১৮ কামান ও অনেক খাদ্যাদি ফেলিয়া রাখিয়া বেটোয়ার পরপারে তাড়িত হইলেন।

যুদ্ধে প্রত্যহ রাণীর ৬০।৭০ জন করিয়া লোক হত হইতে লাগিল। রাণীর ভাল কামানগুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং তাঁহার ভাল ভাল গোলন্দাজরা হত হইয়াছে।

নগরপ্রাচীরে একটি গর্ত্ত খোদিত হইল এবং প্রাসাদ ও নগরের প্রধান অংশ ইংরাজদের দ্বারা অধিকৃত হইল। প্রাসাদের মধ্যে দারুণ হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। রাণীর শরীররক্ষকের একদল (৪০ জন) অশ্বালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, ভূমিশায়ী সৈন্যেরা মুমূর্ষু অবস্থাতেও শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র [নিক্ষেপ] করিতে লাগিল। একে একে সকলেই

১ সম্ভবতঃ 1857 হবে।

'ঝান্সীর রাণী' প্রবন্ধের (মালতী পুঁথি) এক পৃষ্ঠা
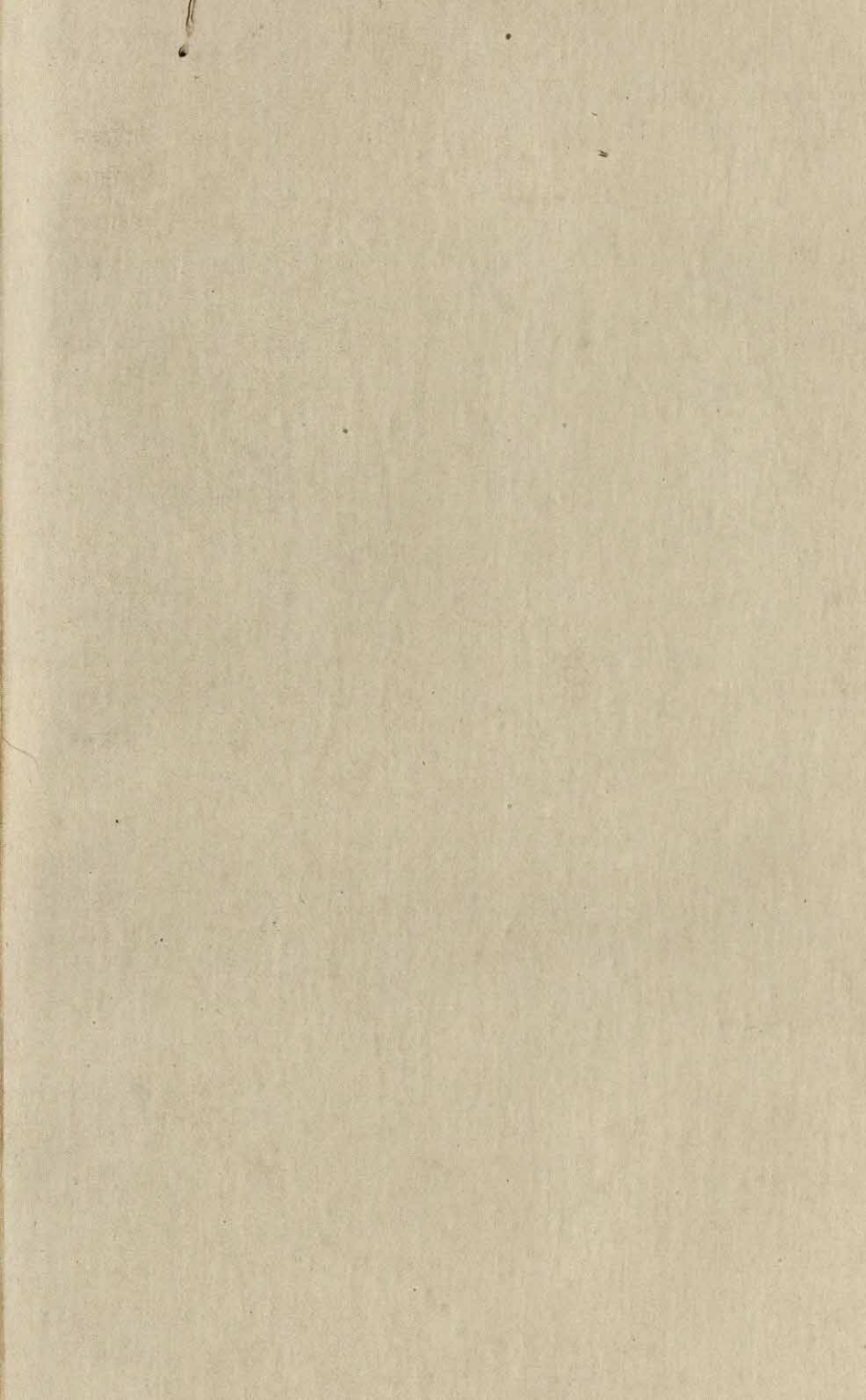
নিহত হইলে অবশিষ্ট একজন বারুদে অগ্নি ধরাইয়া দিল এবং তাহার [শত্রু] দলের অনেকগুলিকে উড়াইয়া দিয়া আপনি উড়িয়া [গেল]।

রাত্রেই রাজ্ঞী কতকগুলি অনুচরের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শত্রুরা তাঁহার [পশ্চাদ্‌ধাবিত] হইয়াছিল এবং প্রায় ধরিয়া-ছিল। লেপ্টেনেন্ট বাউকর (Bowker) অশ্ব…[১]

—রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ২৩১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পৃ ৩২

২. স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাসের গুটিকয়েক সূত্র

ওঁ

বোলপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ—

প্রথম ইংরেজি-শিক্ষার মত্ততায় বাঙালী ছাত্রদের মনে স্বদেশী-বিদ্বেষের উৎপত্তি হইয়াছিল। তখন শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী দেশের শিল্প সাহিত্য ইতিহাস ও ধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের দৈন্য কল্পনা করিয়া লজ্জাবোধ করিতেছিল এবং সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য অনুকরণই উন্নত culture বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা, ও অবজ্ঞা প্রযুক্ত অনেকে নাস্তিক ও অনেকে খৃস্টান-ঘেঁষা হইয়া পড়িতেছিলেন।

সেই সময়ে রামমোহন রায়ের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ধর্মব্যাকুলতা অনুভব করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। যদিচ প্রচলিত ধর্ম-সংস্কার তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি স্বদেশের শাস্ত্রকেই দেশের ধর্মোন্নতির ভিত্তিরূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনিই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১) বেদ উপনিষদের আলোচনা ও বিলাতী বিজ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতির প্রচার বাংলাভাষায় প্রবর্তন করেন। আদি

১ পাণ্ডুলিপিটি অতি জীর্ণ। কোনো কোনো স্থলে পড়া কঠিন। অনুমিত পাঠ [ ] এই বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল। বানান ও ছেদচিহ্নাদি অবিকল পাণ্ডুলিপি-অনুযায়ী মুদ্রিত হল।

ব্রাহ্মসমাজ বিদেশী ধর্ম হইতে স্বধর্মে ও বিদেশী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন।

কেশববাবুরা যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া (২) ব্রাহ্মধর্মের সহিত হিন্দুসমাজের বিচ্ছেদ-সাধনের উপক্রম করিলেন (৩) তখন দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু-সমাজকে ত্যাগ করিলেন না—ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুসমাজেরই অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিলেন। আধুনিক শিক্ষিত চিত্তকে স্বদেশের অভিমুখী করিবার এই প্রয়াস।

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে আধুনিক শিক্ষার সহিত স্বদেশী ভাবের সমন্বয়-চেষ্টা বরাবর কাজ করিতে লাগিল। হিন্দুমেলা এই স্বদেশী ভাবের আর একটি অভ্যুত্থান (৪)। দ্বিজেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্রকে সাহায্য করিয়া এই মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্বদেশী শিল্পের, স্বদেশী মল্ল-বিদ্যার, স্বদেশী gamesএর প্রদর্শনী হইত। স্বদেশী গান গীত ও স্বদেশী কবিতা আবৃত্ত হইত। তাহার পর বঙ্কিমের (৫) বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকভাবে পরিপুষ্ট করিয়া দেশের শিক্ষিতগণকে মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করিয়া তুলিল। ইহার কিছুকাল পরে শশধরের প্রাদুর্ভাব (৬) উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুকে (৭) লইয়া আমাদের পরিবারে সাধারণের অগোচরে স্বদেশী ভাবের বিশেষরূপ চর্চা হইতেছিল। গোপনে স্বদেশী দেশলাই ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত তাঁত প্রভৃতি নির্মাণের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বদেশী ভাবের উত্তেজনাতেই খুলনা হইতে বরিশালে ষ্টীমার চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজ-কোম্পানির সহিত দারুণ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তৎকালে বরিশালে স্বদেশীর দল তাঁহার সাহায্যের জন্য যেরূপ প্রচণ্ড উৎসাহে যাত্রী-সংগ্রহ ও যাত্রী-ভাঙানর কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এরূপ Fullerএর আমলে ঘটিলে কি বিপদ হইত অনুমান করিবেন।

কন্‌গ্রেস গবর্মেণ্টের নিকট আবেদনের দিকেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেষ্টাকে প্রবৃত্ত করাইল।

সাধনা পত্রে (৮) এবং তাহার পরে অন্যত্র এইরূপ আবেদন-নীতি ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তি-চালনার দিকে মন দিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলেন্দ্রনাথ (৯) এবং আমাদের পরিবারের অনেকে যোগ দিয়া স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

এই স্বদেশী ভাণ্ডারের ভগ্নাবশেষের উপরে Indian Storesএর অভ্যুদয়।

ইহার অনতিকাল পরেই Provincial Conferenceএ (১০) যাহাতে বাংলাভাষায় দেশের আপামর-সাধারণের নিকট স্বদেশের অভাব আলোচনা করা যায়—যাহাতে ইংরেজি-ভাষায় কেবল রাজার নিকট আবেদনেই আমাদের কর্তব্য নিঃশেষিত না হয় রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে সত্যেন্দ্রনাথের নায়কতায় প্রথম সেই চেষ্টা করা হইয়াছিল, পরবৎসর ঢাকাতেও সেই চেষ্টা করা যায়।

স্বদেশী movementএর সঙ্গে এই সকল চেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ধর্ম সম্বন্ধে যেমন আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীন শাস্ত্রের দিকে মনকে টানিয়াছিলেন Politics সম্বন্ধেও সেইরূপ কিছুকাল হইতে দেশের লোককে দেশের দিকেই টানিবার চেষ্টা চলিতেছিল। তৎকালে শিক্ষিত লোকেরা যেমন সহজে শাস্ত্রের দিকে স্বদেশী ধর্ম ও স্বসমাজের দিকে ফিরিতে চাহেন নাই এখনকার দিনেও সেইরূপ শিক্ষিত agitation-ওয়ালা সহজে আবেদনের পালা বন্ধ করিয়া স্বদেশের জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হন নাই।

নূতন পর্যায় বঙ্গদর্শনে (১১) এই আত্মশক্তি-চর্চা ও স্বদেশী ভাবের দিকে দেশের চিত্ত আকর্ষণের জন্য উপদেশের প্রবর্তন করা হয় এবং বোলপুরের বিদ্যালয়-স্থাপনও শিক্ষার ভার নিজের হাতে ও স্বদেশী ভাবে প্রবর্তনের চেষ্টা। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় অগ্রণী। তিনি ইংরেজি ধরণের বিদ্যালয় দেশীয় লোকের দ্বারা চালাইতে সুরু করেন—আমার চেষ্টা যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ যথাসম্ভব স্বদেশী রকমের হয়।

এইরূপ আন্দোলন যখন দেশে ভিতরে ২ চলিতেছে, তখন যোগেশ চৌধুরী (১২) কন্‌গ্রেসে শিল্প-প্রদর্শনী খুলিয়া কন্‌গ্রেসের আবেদনপ্রধান ভাবকে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত করিবার প্রথম চেষ্টা করেন—তাহার পর হইতে এই প্রদর্শনী বৎসরে ২ চলিতেছে।

ইতিমধ্যে আশু চৌধুরী বর্ধমান কন্‌ফারেন্সে (১৩) পোলিটিকাল ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়া গালি খান। কিন্তু দেশ অন্তরে অন্তরে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে পার্টিশন ব্যাপার একটা উপলক্ষ মাত্র হইয়া এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্পষ্টরূপে

বিকশিত করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ বয়কট করার ছেলেমানুষী ইহার প্রাণ নহে। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১২।*

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১) ১৮৪৩, (২) ১৮৫৯, (৩) ১৮৬৬-৬৭, (৪) ১৮৬৭, (৫) ১৮৭২, (৬) শশধর তর্কচূড়ামণি ১৮৮৬-৮৭, (৭) ১৮২৬-৯৯, (৮) ১৮৯৪, (৯) ভ্রাতুষ্পুত্র, (১০) নাটোর ১৮৯৭, (১১) ১৯০১, (১২) ১৯০২, (১৩) ১৯০৫।

* দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্র যুগান্তর, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫৬, পৃঃ ১১।

বিচিত্র

রবীন্দ্রসাহিত্যে অতীত ভারত

রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও মনীষী। ভারতবর্ষের ইতিহাসকেও তিনি দেখেছেন দুই দৃষ্টিতে—কবির দৃষ্টিতে ও মনীষীর দৃষ্টিতে। কবিরূপে তিনি হৃদয়রসে অভিষিক্ত ও কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে ভারতইতিহাসকে নূতন করে সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের চোখেও তিনি মাখিয়ে দিয়েছেন এক 'স্বপনের অঞ্জন'। এই অঞ্জনমাখা চোখে প্রাচীন ভারত দেখা দিয়েছে এক মায়াময় মোহনমূর্তি নিয়ে। এই যে স্বপ্নময় প্রাচীন ভারত, যবনিকা তোলামাত্রই তার প্রথম দৃশ্যে দেখতে পাই—

নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ,
পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ-আসন।

—অভিলাষ (১৮৭৪)

এই রেখাচিত্রটির পূর্ণতর রূপ প্রকাশ পেয়েছে বালক রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি রচনায়—

দ্যাখ আর্য-সিংহাসনে
স্বাধীন নৃপতিগণে,
স্মৃতির আলেখ্যপটে রয়েছে চিত্রিত।
দ্যাখ, দেখি তপোবনে
ঋষিরা স্বাধীন মনে
কেমন ঈশ্বর-ধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত॥...
ঋষিগণ সমস্বরে
অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা হিমালয়-গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি
কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি॥
সরস্বতী নদীকূলে
কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।

বীণাপাণি কুতূহলে
মানসের শতদলে
গাহেন সরসী-বারি করি উথলিত ॥

—প্রকৃতির খেদ (১৮৭৫)

প্রাচীন ভারতের এই চিত্র রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে অতিগভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। তাই এই ছবি বারবারই ফুটে উঠেছে তাঁর নানা বয়সের রচনায়। তাঁর অল্প বয়সের রচনা থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

তুমি শুনিয়াছ, হে গিরি অমর,
অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর;
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ-আসনে
যুধিষ্ঠির রাজা ভারত-শাসনে;
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে
আর্য কবি গায় প্রাণ মন খুলে।

—হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা (১৮৭৭)

রবীন্দ্রহৃদয়ে অঙ্কিত প্রাচীন ভারতচিত্রের মধ্যস্থলে রয়েছে সরস্বতী নদীর তীর আর ঋষিদের তপোবন। তাঁর অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে অঙ্কিত এই চিত্রেরই পরিণত রূপ এই।—

অন্ধকারে বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধ শান্ত আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটিরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে।

—ব্রাহ্মণ (১৮৯৫), 'চিত্রা'

এ হচ্ছে বৈদিক যুগের কথা। এ-যুগের যে রূপ রবীন্দ্রনাথের চোখে ফুটে উঠেছে তার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে 'ব্রাহ্মণমহিমা'র পীঠভূমি ঋষিগুরুর তপোবন-আশ্রম। কালক্রমে এই শান্তরসাস্পদ তপোভূমিকে ঘিরে চতুর্দিকে জেগে উঠল ক্ষত্রিয়গরিমার কর্মোচ্ছল কীর্তিকেন্দ্রগুলি।—

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট্,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী, উদ্ধত-ললাট,...
অসির ঝঞ্চনা আর ধনুর টঙ্কারে,
বীণার সংগীত আর নূপুর-ঝঙ্কারে,...
রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে, পথের কল্লোলে,
নিয়ত ধ্বনিত-ধ্মাত কর্মকলরোলে।

—প্রাচীন ভারত (১৮৯৬), 'চৈতালি'

এ হচ্ছে রামায়ণ ও মহাভারতে অঙ্কিত যুগের চিত্র। এ যুগ ক্ষাত্র-গৌরবের কীর্তিসমুজ্জ্বল যুগ। কিন্তু এ যুগেও—

ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।

এই যুগের পূর্ণ রূপটি সমগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে দুটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে।—

হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

—প্রাচীন ভারত, 'চৈতালি'

একদিকে ক্ষত্রিয় অন্যদিকে ব্রাহ্মণ, একদিকে রাজধানী অপর দিকে ঋষি-পত্তন, এই দুএর মধ্যে কি ভাবে মিলন ও সমন্বয় ঘটেছিল, তার চিত্রটিও অঙ্কিত হয়েছে তিনটি মাত্র লাইনে।—

প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ককেশ জালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্তভালে।

—তপোবন (১৮৯৬), 'চৈতালি'

রামায়ণ-মহাভারতের আরও বহু চিত্র ফুটে উঠেছে বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, ভাষা ও ছন্দ, পতিতা, কর্ণকুন্তীসংবাদ, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি কাব্য ও নাট্য রচনায়।

২

এর পরে যে যুগ এল, তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে। অবদানশতক, মহাবস্তু-অবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ সে যুগেরও বহু চিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের চোখের সম্মুখে। এই চিত্রগুলির অধিকাংশই আঁকা হয়েছে প্রাচীন কাশী ও কোশল রাজ্যের বিভিন্ন ধরণের কাহিনী অবলম্বনে। কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তি। এই শ্রাবস্তি নগরীর তিনটি চিত্র আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে। তিনটি চিত্রেই এক দিকে পাই শ্রাবস্তিপুরীর 'গগন-লগন প্রাসাদ' প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্যের পরিচয়, আরএকদিকে পাই বুদ্ধপ্রচারিত ত্যাগ ও সেবাধর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শ্রাবস্তিনগরীর গৃহে গৃহে বুদ্ধশিষ্য অনাথপিণ্ডদের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' প্রার্থনা এবং সার্থকনামা অনাথপিণ্ডদের দুহিতা লক্ষীস্বরূপা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ার শুধু ভিক্ষাপাত্র হাতে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মহানগরীর বিপুল ক্ষুধা মেটাবার সংকল্প—এই দুটি চিত্র আমাদের হৃদয়ে অক্ষয়বর্ণে আঁকা হয়ে আছে। তৃতীয় চিত্র পাই শ্রাবস্তিপুরীর উপান্তস্থিত জেতবনবিহারে বুদ্ধদেবের চরণপদ্মে সুদাস মালীর অকাল পদ্ম-উপহারের কাহিনীতে। এই অকালপদ্মটির মূল্য-স্বরূপ কোশল রাজ্যের অধীশ্বর 'রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ' তাকে বহু স্বর্ণ মাষা দিতে চেয়েছিলেন। সে-মূল্য উপেক্ষা করে সুদাস সেটি অর্পণ করল বুদ্ধ-দেবের চরণে, বিনিময়ে নিতে শুধু 'চরণের ধূলি এক কণা'। অতঃপর উল্লেখযোগ্য কাশীরাজ ও কোশলরাজের বাহুবল তথা ধর্মবলের প্রতি-যোগিতার অপূর্ব কাহিনীটি। বিপন্ন বণিকের দুর্গতি নিবারণের জন্য আত্মবিক্রয়োদ্যত কোশলরাজের শিরে মুকুট তুলে দিয়ে কাশীরাজ কি ভাবে শেষে ধর্মের ক্ষেত্রে পরাজয় এড়ালেন—এ কাহিনীটিকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের যে পরিচয় আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন তার তুলনা নেই।

প্রাচীন কাশীরাজ্যের আরও দুটি চিত্র ফুটে উঠেছে 'সামান্য ক্ষতি' ও 'পরিশোধ' নামক কবিতা-দুটিতে। প্রথমটিতে আছে বিলাসিনী রাজমহিষী 'করুণা'র হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা ও কাশীরাজের সহৃদয় ন্যায়পরায়ণতার কথা। আর দ্বিতীয়টিতে আছে কাশীনগরীর সুন্দরীপ্রধানা শ্যামা ও তক্ষশিলার

বণিক বজ্রসেনের কাহিনী। এটিতে ফুটে উঠেছে দুর্নিবার রূপমোহ ও পাপবিমুখতার দ্বন্দ্বের চিত্র। তা ছাড়া, এটিতে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের কয়েকটি অপূর্ব চিত্র। পরবর্তী কালে এই চিত্রগুলি আরও বিস্তৃত পটে ও গাঢ়তর বর্ণে পুনরঙ্কিত হয়েছে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে।

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও যৌবনমদে মত্তা নগরীর নটী বাসবদত্তার কাহিনীটি এক দিকে যেমন প্রাচীন মথুরাপুরীকে স্মরণীয় করে রেখেছে, অপর দিকে তেমনি অপূর্ব আভায় প্রকাশ করেছে প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শকে। মগধরাজ অজাতশত্রুর আমলের একটি সামান্য কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের মহিমামণ্ডিত চরম আত্মত্যাগের একটি অবিস্মরণীয় চিত্র অঙ্কন করেছেন 'পূজারিণী' কবিতাটিতে। ঘটনাস্থল মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ, পাত্রী রাজদাসী শ্রীমতী। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব নাটিকা 'নটীর পূজা' এই কাহিনী অবলম্বনেই রচিত; তাতে প্রাচীন ভারতের এই মহিমার চিত্র প্রশস্ততর ভূমিকায় ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রলেখনীচিত্রিত এই কাহিনীগুলিকে আশ্রয় করে প্রাচীন ভারতের এই মহৎ যুগটি যেন আপন মহিমাবলে প্রতিমুহূর্তেই আধুনিক কালের হৃদয় হরণ করে নিচ্ছে। শ্রাবস্তি, কাশী, মথুরা ও রাজগৃহকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিদৃষ্টিতে এ-যুগের যে বিচিত্র পরিচয় রচনা করেছেন, নিছক ঐতিহাসিকের পক্ষে তেমন নিবিড় পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে কবির নিজের কথাই স্মরণ হয়।—

> সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
> রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

বস্তুতঃ আধুনিক কালের বহু পাঠকের কাছেই রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিই প্রাচীন ভারতের জনমস্থান এবং অনেকাংশেই তা নিষ্প্রাণ ঐতিহাসিক তথ্যের চেয়ে সত্য, একথা বললে অন্যায় হয় না।

৩

বুদ্ধদেবের যুগের পরে রবীন্দ্রলেখনীতে চিত্রিত হয়েছে কালিদাসের কাল। সে-চিত্র আমাদের চোখে ফুটে ওঠে সুখস্বপ্নের মতো। বিশে

শতকের তীব্র আলোকেও সে-স্বপ্নের ঘোর কাটতে চায়না, বরং আরও নিবিড়ভাবেই মায়াময় করে তোলে আমাদের দৃষ্টিকে—চোখে ভেসে ওঠে মালবিকার চাহনির ছবি।—

মালবিকা অনিমিখে
চেয়েছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি ভেসে এল
কালো মেঘের ছায়ার সনে।

সেই চাহনির পথ ধরে আমরাও যেন কবির সঙ্গে আমাদের অলক্ষ্যেই গিয়ে উপনীত হই 'দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে,' যেখানে—

মহাকাল মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি,—ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য 'পরে সন্ধ্যারশ্মি-রেখা।
প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের স্তম্ভ 'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি' দম্ভভরে।
প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড 'পরে।
হেন কালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।

—স্বপ্ন (১৮৯৭), 'কল্পনা'

স্বপ্ন যখন ভেঙে যায় তখন হৃদয় যেন ব্যাকুল হয়ে কবিকে সম্বোধন করে বলে উঠতে চায়—

কামনার মোক্ষধাম উজ্জয়িনী মাঝে
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদি সৃষ্টি—সেথা কে পারিত

লয়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
কবির কল্পনাপুরী—অমর ভুবন।

শুধু 'স্বপ্ন' কবিতায় নয়—'একাল ও সেকাল', 'মেঘদূত', 'বর্ষামঙ্গল', 'মদন-ভস্মের পরে', 'সেকাল' প্রভৃতি বহু কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালকে আমাদের চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ তুলে ধরেছেন। এগুলি কালিদাসের কালের প্রতিচ্ছবিমাত্র নয়, এগুলি নূতন সৃষ্টি। এসব রচনার আলোকে সেকাল যেন নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে একালের কাছে ধরা দেয়।

কবির দৃষ্টি ও কবির সৃষ্টি এমনি করেই প্রাচীন ভারতকে আমাদের কাছে পরম কমনীয় রূপে উদ্ভাসিত করেছে।

৪

মধ্যযুগের শিখ মারাঠা ও রাজপুতের ঐতিহাসিক চিত্রও কবিকল্পনার রঙে ও ছন্দের রেখায় বাঁধা পড়ে চিরকালের চিত্রশালায় সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। সে চিত্রশালার দিকে দৃষ্টিপাত করলে কখনও দেখি—

রঘুনাথ হেথা আসি উতরিলা,
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।

কখনও দেখি গুরু গোবিন্দ শিষ্যদের আহ্বান করছেন—

তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ।

আর এক চিত্রে দেখা যায়—

সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্শাফলকে তুলি।
শিখ শত শত চলে পশ্চাতে
বাজে শৃঙ্খলগুলি ॥

এ তো গেল শিখ-ইতিহাসের চিত্র। মারাঠার ইতিহাসের চিত্রও কম উজ্জ্বল নয়। প্রথমেই পাই রাজা শিবাজি ও তাঁর গুরু রামদাসের চিত্র।—

বসিয়া প্রভাতকালে
সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা একদিন—
রামদাস, গুরু তার,
ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।

অতঃপর দেখি মারাঠা 'বিচারক' ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর চিত্র।—

ব্রাহ্মণ আসি দাঁড়াল সম্মুখে
ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী।
দুই বাহু তাঁর তুলিয়া উধাও
কহিলেন ডাকি,—"রঘুনাথ রাও,
নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও,
না লয়ে পাপের শাস্তি ?"

দুর্দান্তপ্রতাপ মারাঠানায়কের সম্মুখে দণ্ডায়মান নির্ভীক ন্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের এই অপূর্ব চিত্র যেন মারাঠা-ইতিহাসকেই চিরকালের মতো গৌরবোজ্জ্বল করে রেখেছে। মারাঠা-ইতিহাসের আর-একটি চিত্র পাই 'সতী'-নামক নাট্য কবিতাটিতে। এই করুণ কাহিনীটিতে ফুটে উঠেছে মারাঠী কন্যা অমাবাই এর একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য ও নির্ভীক আত্মত্যাগের ছবি। মারাঠী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাইও রবীন্দ্রনাথের হৃদয় থেকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি লাভ করেছেন। কিন্তু তা কবিতারূপে প্রকাশ পায় নি, পেয়েছে কিশোর কবির লেখনীরচিত একটি গদ্যচিত্ররূপে। এই চিত্ররচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বেই তিনি এই বীরনারীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এই বলে—

আমরা সর্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি।

এ স্থলে এই বীরাঙ্গনার চরিত্রচিত্রণের বিশদ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। রাজপুত-ইতিহাসকে লক্ষ্য করে পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব-মাঝে
সেদিন যে দুন্দুভি মন্দ্রিয়া ছিল,
তার প্রতিধ্বনি বাজে প্রাণের কুহরে গুমরিয়া।
নির্ভয় দুর্দান্ত খেলা, মনে হয় সেই তো সহজ,
দূরে নিক্ষেপিয়া ফেলা
আপনারে নিঃসংশয় নিষ্ঠুর সংকটে।
—রাজপুতানা (১৯৩৮), 'নবজাতক'

রবীন্দ্রনাথের আঁকা রাজপুত নারী-পুরুষের কয়েকটি রেখাচিত্রের মধ্যে রাজপুতানার জাতীয় চরিত্রের এই অতুলনীয় মহিমাই ফুটে উঠেছে অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যে।

অখ্যাত অচলগড়ের সামান্য একজন ভূস্বামী সিরোহিপতি সুরতান যাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ক্ষত্রকুল-সিংহশিশু' এবং বর্ণনা করেছেন 'অশনিভরা বিদ্যুৎ' বলে, তিনি যে-ভাবে উচ্চশির উচ্চে রেখে আরঙজেবের দরবারে প্রবেশ করে বাদশাহের কাছ থেকে সম্মান আদায় করেছিলেন সে-কাহিনী অচলগড়ের অবজ্ঞাত ইতিহাসকে চিরকালের কাছে স্মরণীয় করে রাখল। রতনরাও রাজা, কে রাখত তাঁকে স্মরণ করে ? কিন্তু যে ন্যায়-নিষ্ঠতার শক্তিতে তিনি অপরাধী পুত্রের মৃত্যুদণ্ডেও অবিচলিত রইলেন, সে-কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাঁর জন্য যে আসন রচনা করেছে, ইতিহাসের বহু খ্যাতনামা বীরপুরুষের ভাগ্যেও তা মেলে না। তৎকালীন রাজপুত নরনারীর পক্ষে প্রাণ দেওয়া কত সহজ ছিল তার পরিচয় পাই 'নকলগড়', 'পণরক্ষা', ও 'বিবাহ' এই তিনটি কবিতায়। চিতোর-রাণার অতি সামান্য হারাবংশী ভৃত্য কুম্ভ নিজের বংশমর্যাদা রক্ষার জন্যে যে-ভাবে প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে একাকী 'নকল বুঁদিগড়' রক্ষা করতে গিয়ে রাণার সেনার হাতে প্রাণ দিলেন তার তুলনা ভারত-ইতিহাসেও দুর্লভ। যে তরুসিং টিকির মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের মাথা দিয়েছিলেন, একমাত্র তার সঙ্গেই হারাবংশী বীর কুম্ভের তুলনা হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদিগড়।

হারাবংশী কুম্ভের এই আত্মদানে শুধু নকল বুঁদিগড় নয়, মানুষের ইতিহাসই ধন্য হয়েছে। আর, তাকে ধন্য করেছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শ।

এমনি করেই ধন্য হয়েছে আজমীর গড়ের দুর্গেশ দুমরাজের স্মৃতিটিও, যিনি 'প্রভুর আদেশে বীরের ধর্মে বিরোধ' মেটাবার জন্য অতি অনায়াসেই ত্যাগ করলেন নিজের প্রাণ। এইভাবে অতি গ্লানিকর পরাজয়ের মধ্যেও তিনি রাজপুত গৌরবকে অম্লান রেখে গেলেন।

যে মৈত্রিরাজকুমার প্রভুর মর্যাদা রক্ষার জন্যে বিয়ের আসর থেকেই 'বরের বেশে টোপর পরি' শিরে' ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চললেন রণক্ষেত্রে এবং সেখানে রাজপুতবীরের মতোই মৃত্যু বরণ করে 'বরের বেশে মতির মালা গলে' আরোহণ করলেন চিতাশয্যায়, আর ওই চিতাশয্যাতেই এসে মিলিত হলেন যে কনের সাজ-পরা রাজকুমারী বধূ—এই চিরদম্পতিযুগল রাজপুত গৌরবের অক্ষয় সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন আমাদের অশ্রুধারাবর্ষণে রবীন্দ্রোচ্চারিত অমৃতমন্ত্রবলে।

শ্রীমতী দাসী, উপেক্ষিত তরুসিং, রাজভৃত্য কুম্ভ, অখ্যাত দুমরাজ, অজ্ঞাতনামা মৈত্রিপতি ও তাঁর অপরিণীতা বধূ অমর মৃত্যুর অক্ষীয়মাণ স্নিগ্ধালোকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে যে মহিমামণ্ডিত বরমাল্য লাভ করেছেন, ইতিহাসের বড় বড় বীরনায়কদের পক্ষেও তা লোভনীয় অথচ অলভ্য।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য 'হোরিখেলা' নামক অপূর্ব কবিতাটি। এটি রাজপুত বীর্য বা ত্যাগমহিমার কাহিনী নয়। এই কবিতাটি সে দিক্ থেকে বিচার্য নয়। কিন্তু এই কাহিনীটিতে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের রেখায় ও কল্পনার রঙে তদানীন্তন কালের রাজপুতজাতির যে চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, কোনো শিল্পীর নিপুণ তুলিকাতেও তা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। কোটা শহরের ভূনাগরাজার রাণী ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠান কেসর খাঁ উভয়েই ইতিহাসে অখ্যাত, আর কেতুনপুরের বকুলবাগানে তাদের মধ্যে যে চমক লাগানো হোরিখেলা হল, ইতিহাস তার কথাও জানে না। কিন্তু কবির কল্পনা যে ইতিহাসকে লজ্জা দিয়ে তার তুচ্ছতম কাহিনীকেও অপূর্বতার স্বপ্নলোকে উন্নীত করতে পারে, তার পরিচয় আছে এই কাহিনীটিতে।—

শুরু হল হোরির মাতামাতি
উড়তেছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যাকাশে।
নব বরণ ধরল বকুল ফুলে,
রক্তরেণু ঝরল তরুমূলে,
ভয়ে পাখি কূজন গেল ভুলে,
রাজপুতানীর উচ্চ উপহাসে।
কোথা হতে রাঙা কুজ্ঝটিকা
লাগল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে॥

এমন সময় সহসা—

বাতাস বেয়ে ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাঘরা ছিল যত।
মন্ত্রে যেন কোথা হতে কে রে
বাহির হল নারীর সজ্জা ছেড়ে,
একশত বীর ঘিরল পাঠানেরে
পুষ্প হতে একশো সাপের মত।
স্বপ্নসম ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাঘরা ছিল যত॥···
কেতুনপুরে বকুল বাগানে
কেসর খাঁয়ের খেলা হল সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাক তারা॥

আমাদের চোখেও যেন স্বপ্নের ঘোর লেগে যায়। মনে হয় যেন আমাদের চোখের সামনেই একটি বিচিত্র স্বপ্নকাহিনী চলচ্চিত্রপটের উপরে দ্রুত অভিনীত হয়ে সহসা বিলীন হয়ে গেল। মনে হয়, এ কাহিনীটিও যেন ক্ষুধিত পাষাণের কাহিনীর মতোই অলীক অথচ অপূর্ব। বস্তুতঃ হোরিখেলার কাহিনী একান্ত ভাবেই অলীক নয়।

৫

ইতিহাসবিচারের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের দুই রূপ—একরূপে তিনি চরিত্র-পূজারী, অন্যরূপে সত্যসন্ধানী।

যিনি জীবনপথে যাত্রা করেছিলেন—

যত মানবের গুরু মহৎজনের
চরণচিহ্ন ধরিয়া,

যাঁর হৃদয়ের নিরন্তর আকুতি ছিল—

জগতে যত মহৎ আছে,
হইব নত সবার কাছে

জীবনের অন্তিম প্রান্তে দাঁড়িয়েও যিনি বলেছিলেন—

তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়,

তাঁর চিত্ত যে ভারত-ইতিহাসের মহৎ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্যদানে উৎসুক হবে তা বিচিত্র নয়।

রবীন্দ্রনাথ 'যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি' করেছিলেন এবং যাঁকে 'একান্তে নিভৃতে' তথা সর্বসমক্ষে বারবার প্রণাম নিবেদন করেছিলেন, মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বেও সেই বুদ্ধদেবকে লক্ষ করে তিনি বলেছিলেন—

এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,···
তাঁহারে স্মরণ করি' জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

—৬ সংখ্যক কবিতা (১৩৪৭ বৈশাখ ২৬), 'জন্মদিনে'

বুদ্ধদেবের পরেই রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন আদর্শ নৃপতি প্রিয়দর্শী অশোককে।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট্ অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র, তাহা আমরা সকলেই জানি।···সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।···এই মঙ্গলশক্তি চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া

সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। অশোকের মধ্যে মঙ্গল শক্তির এই যে মহান্ আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে।

—উৎসবের দিন (১৯০৫) 'ধর্ম'

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ যে-তৃতীয় ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন কবি কালিদাস। শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য নয়, চারদিকের কলুষজালের মধ্যেও তিনি যে কল্যাণের অম্লান আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, তারই জন্যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে শ্রদ্ধাদান করেছেন—

জীবনমন্থন-বিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

—কাব্য (১৮৯৬), 'চৈতালি'

মধ্যযুগের যে মহাপুরুষদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তাদের কথা অতি সংক্ষেপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এই উক্তিটিতে।—

মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যূষের অতন্দ্রিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের উর্ধ্ব আকাশে।...সেই মুক্তিদূতদের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল মঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর একজন ছিলেন দাদূ।... সেদিন আর এক সাধু, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল সুগোচর, তাঁর নাম রজ্জব। এই ভারত-পথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়।...এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়।

—ভারতপথিক রামমোহন রায় (১৯৩৩), 'চারিত্রপূজা'

বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় এ-কথারই পুনরুক্তি করা হয়েছে 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধে।—

> ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের যাঁরা পূর্ববর্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবীর নিজেকে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথরূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত।···রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে।
>
> —ভারতপথিক রামমোহন রায় ২ (১৯৩৩), 'চারিত্রপূজা'

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও এই পথের পথিক বলেই জানিয়েছেন, আর যে রচনাটিতে ভারতবর্ষকে মহামানবের পুণ্য মিলনতীর্থ বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেটিকে তিনি অভিহিত করেছেন 'ভারতপথের গান' বলে।

বিশ্বমানবের যে মিলনসাধনাকে তিনি 'ভারতপথ' বলে অভিহিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথের মতে তাই হচ্ছে ভারতবর্ষের বহুশতাব্দীব্যাপী সুদীর্ঘ ইতিহাসের মূলকথা।

৬

মধ্যযুগে কবীরপ্রমুখ ভারতসাধকরা যে পথের পথিক ছিলেন ধর্মের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেই পথকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন মহামতি আকবর। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁকে মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বলেছেন—

> আকবর সকল ধর্মের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজের হৃদয়মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত, নিষ্ঠার সহিত, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান পারসি ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রিসভায়, হিন্দুবীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে, প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন।
>
> —ইংরেজ ও ভারতবাসী (১৮৯৪), 'রাজা প্রজা'

এই প্রবন্ধটি যে সভায় পঠিত হয় তার অধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের উক্ত অভিমত যে তাঁর অনুমোদন লাভ করেছিল, সে কথা জানা যায় রবীন্দ্রজীবনী থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রও যে অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন, তার প্রমাণ আছে বঙ্কিমসাহিত্যে। তার নিদর্শন স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি।—

> আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।
>
> —ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, 'বিবিধপ্রবন্ধ' (১)

আকবর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমতপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। 'আকবর যে-একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন', সেটি তৎকালীন ভারতপথিক ধর্মসাধকদের কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে এক সূত্রেই বাঁধা ছিল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে আকবরও ছিলেন চিরন্তন ভারতপথেরই পথিক। তিনি বলেন—

> মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল সম্রাট্ আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এই জন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল, যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন।
>
> —স্বাধিকারপ্রমত্তঃ, (১৯১৮), 'কালান্তর'

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের এটাই হল সারকথা। 'আরঙ্‌জেব ভারত যবে করিতেছিল খান্ খান্' তখন 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'কে 'এক ধর্মরাজ্য-পাশে' বাঁধবার যে প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, তাও আকস্মিক নয়। তার মধ্যেও ভারত-ইতিহাসের চিরন্তন ধর্মনিষ্ঠা ও ঐক্য প্রবণতাই সক্রিয় ছিল। অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবনের রথ তখনও সুচিরকালীন ঐতিহ্যনির্দিষ্ট ভারতপথ ধরেই পরম পরিণতির দিকে অগ্রসর

হচ্ছিল। সে পথ 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর', কিন্তু তার পরিণতি নিরুদ্দিষ্ট বা লক্ষহীন নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> মোগল শাসন-কালে শিবাজিকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজির গুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন।
>
> —ধম্মপদং (১৯০৪), 'প্রাচীন সাহিত্য'

এ সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র বলেছেন—

> বহুদিন হইতে বহু ধর্মবীর দেশের উচ্চনীচের মধ্যে···যোগসাধন করিতেছিলেন।···মারাঠায় ধর্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মথিত হইতেছিল। শিবাজির প্রতিভা সেই মন্থন হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছে। তাহা সমস্ত দেশের ধর্মোদ্‌বোধনের সহিত জড়িত, এইজন্যই দেশের শক্তিতে তিনি ধন্য ও তাঁহার শক্তিতে দেশ ধন্য।···বস্তুতঃ তাঁহার সাধনা সমস্ত দেশেরই ধর্মসাধনার একটি বিশেষ প্রকাশ।
>
> ধর্মের উদার ঐক্য দেশের ভেদবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়া দিলে তবেই দেশের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় সফলতা লাভ করে, ইহাই মহারাষ্ট্র ইতিহাসের শিক্ষা।
>
> —শিবাজি ও মারাঠাজাতি (১৯০৮), 'ইতিহাস'

বিংশ শতকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে যে সব রাষ্ট্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে, তাকে সফলতার পথে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বার বার শুধু মহারাষ্ট্রের নয়, সমগ্র ভারত-ইতিহাসেরই এই মূলগত শিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন। বর্তমান সময়ে স্বাধীন ভারতেও দেশের ঐক্যপ্রতিষ্ঠা ও ঐক্যরক্ষার পক্ষে ভারত-ইতিহাসের এই শিক্ষার কথা আমরা যেন না ভুলি।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুসাধনা

১

ভারতবর্ষ ঋতুবৈচিত্র্যের দেশ। ঋতুর এত বিচিত্র রূপ আর কোনো দেশে আছে কি-না জানি না। রবীন্দ্রনাথ ঋতুসৌন্দর্যের কবি, আর কারও রচনায় ঋতুস্তুতি এমন অজস্রতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কি না তাও জানি না। তাই তাঁর ঋতুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সে কাজ সহজ নয়। এস্থলে আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যে ঋতুপ্রকাশের দুই-একটি দিকের একটুখানি পরিচয় মাত্র দিতে চেষ্টা করব।

ঋতু শব্দের অন্তরের কথা হচ্ছে ঋতম্। ঋতম্ মানে সত্য, যে সত্য বিশ্বজগৎকে চালনা করে, যে সত্যে নিয়ন্ত্রিত হয় গ্রহনক্ষত্রাদি সমগ্র জগতের নিত্যকালীন গতিচক্র। যে বিশ্বনীতি সংবৎসরের গতিপর্যায়ের মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে, তাকে আমরা জানি ঋতু বলে। প্রাকৃত জনের দৃষ্টিতে ঋতুপর্যায়ের মধ্যে কোনো তত্ত্ব বা গভীরতা নেই। কিন্তু কবির্মনীষী—তাই তাঁর দৃষ্টিতে ঋতুপ্রকাশের মধ্যে বিশ্বসত্যের মূলনীতিই উদ্ভাসিত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে ঋতুর শুধু রূপ নয়, তার তত্ত্বও ধরা পড়ে অনায়াসেই।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুসাহিত্যকে একটু তলিয়ে বিচার করলেই দেখা যায়, ঋতুপর্যায়ের বাহ্য বৈচিত্র্য তাঁর হৃদয়কে তেমন গভীরভাবে স্পর্শ করেনি, যেমন করেছে তার অন্তর্নিহিত বিশ্বসত্য সে বিশ্বসত্য শুধু যে আকাশে-বাতাসে মেঘে-বর্ষণে ফুলে-পল্লবেই প্রকাশ পায় তা নয়, সে সত্য মানুষের জীবনে তার শৈশবে-কৈশোরে যৌবনে-বার্ধক্যেও সমভাবেই সক্রিয়। বিশ্বপ্রকৃতি থেকে মানবজীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। প্রকৃতি ও জীবন একই 'ঋতম্'এর সূত্রে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীত ও ঋতুনাট্যের অন্তরে এই কথাই বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই গান ও নাটকগুলিকে আমরা যদি নিছক প্রমোদন-বিনোদনের উপকরণ হিসাবে দেখি, তাহলে তার পূর্ণরূপের সাক্ষাৎ পাব না, তার রস পাব মাত্র অংশিকরূপে। ঋতুচর্যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'উৎসব'। উৎসব আর প্রমোদ-উল্লাস এক নয়। যে-অনুষ্ঠান আমাদের জীবনকে দৈনন্দিন সামান্যতার উর্ধ্বে নব আবির্ভাবের আনন্দে ভূষিত করে তাকেই বলা যায় উৎসব। ঋতু-উৎসবের আনন্দ আমাদের জীবনকে বিশ্ব-সত্যের আলোকে নূতন করে গড়ে তুলুক, এই ছিল কবিগুরুর অভিপ্রায়।

কালিদাস তাঁর 'ঋতুসংহার' রচনা করেছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে। তাই তিনি ঋতুচক্রকে গ্রহণ করেছেন তরুণজীবনের ভোগের ভূমিকারূপে। রবীন্দ্রনাথের ঋতুচর্যা প্রধানতঃ তাঁর পরিণত বয়সের সৃষ্টি। তাই তাঁর কাছে ঋতুপর্যায় দেখা দিয়েছে সর্বাঙ্গীণ জীবনের বিশ্বভূমিকারূপে। ঋতুক্রমের মধ্যে তিনি যে বিশ্বছন্দের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন, তা প্রতিরণিত হয়েছিল তাঁর হৃদয়ের ছন্দে। তাই তিনি জীবনকেই স্পন্দিত করতে চেয়েছিলেন বিশ্বজগতের ছন্দে। আমাদেরও জানিয়েছেন সে আহ্বান।—

পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে···
লুটে যাবার ছুটে যাবার চলবারই আনন্দে রে।
সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বয়ে যায় ধরাতে
বরণ গীতে গন্ধে রে,
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার মরবারই আনন্দে রে।

বিশ্ব-ঋতুর সঙ্গে জীবন-ঋতুর সামঞ্জস্য স্থাপনের এই যে আদর্শ, এ আদর্শ বিশেষভাবে ভারতবর্ষেরই। ঋগ্‌বেদের ঋষিদের কণ্ঠে যে ঋতমের বন্দনা, যে প্রকৃতির স্তবগান উদ্‌গীত হয়েছিল, তা এই আদর্শ থেকেই উদ্‌ভূত। বৈদিক যুগের দেবকল্পনার মূলেও ছিল এই প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের ছন্দ মেলাবার প্রেরণা। আদিকবি বাল্মীকির জীবন এবং রচনার মধ্যেও এই ভারতবর্ষীয় আদর্শের প্রকাশ চিরসমুজ্জ্বল। কালিদাসের পরিণত বয়সের রচনাতে এই আদর্শই আরও গভীর ও নিবিড় ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশ্বঋতুর ছন্দে জীবনের ছন্দ যেমন সমন্বিত হয়েছে, তেমন বোধ করি আর কখনও হয়নি। বস্তুতঃ ভারতীয় ঋতুসাধনার চরম পরিণতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও রচনায়, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। ঋতুপ্রকৃতির সঙ্গে জীবনপ্রকৃতির সমন্বয়স্থাপনের এই যে আদর্শ, সেটা কল্পনাবিলাসমাত্র নয়। ভারতবর্ষের আদর্শে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে, তা গভীর সাধনারই বিষয়। এই সাধনার তত্ত্বকথা অতি গভীর অথচ উজ্জ্বল ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'তপোবন' প্রবন্ধটিতে এবং শান্তি-

নিকেতনের ধর্মভাষণগুলিতে। কিন্তু এই সাধনা শুধু তত্ত্বকথার মধ্যেই নিগূঢ় থাকেনি, জীবনব্যবহারের মধ্যেও তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে। তার প্রমাণ শান্তিনিকেতন আশ্রমে জীবনপ্রতিষ্ঠা এবং সে জীবনকে বর্ষা বসন্ত শরৎ প্রভৃতি ঋতু-উৎসবের মধ্যে নূতন মহিমায় মণ্ডিত করার আদর্শস্থাপন। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার আসল তাৎপর্যই অস্পষ্ট থেকে যাবে। তেমনি তাঁর ঋতুসাধনাকেও তাঁর জীবনসাধনার অঙ্গরূপে দেখা প্রয়োজন। তবেই সে সাধনার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

৩

ঋতম্ তথা ঋতুর মূলনীতি নিহিত রয়েছে দ্যাবাপৃথিবীর, আকাশ ও ধরণীর, পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্রের দ্যুতি আদিম মানবের প্রথম বিস্ময়ের হেতু। তারই ফলে মানুষের কল্পনা দেবলোককে স্থাপন করেছে আকাশে এবং দ্যুতিমান্ জ্যোতিষ্কমাত্রেই করেছে দেবত্ব-আরোপ। সেজন্যই দেখি প্রাচীন আর্যদের প্রধান দুই দেবতা হচ্ছেন আকাশের দেবতা দ্যৌস্ (Zeus, Jupiter) এবং জ্যোতিষ্করাজ সবিতা বা সূর্য (Apollo)। ঋগ্‌বেদে এই দুই দেবতার, বিশেষ করে সবিতার, বন্দনা কতখানি প্রাধান্য পেয়েছে তা সুবিদিত। কিন্তু কালক্রমে এই প্রাধান্যের অবসান ঘটে এবং তাঁদের স্থানে অধিষ্ঠিত হন দেবরাজ ইন্দ্র। কি করে আকাশ-দেবতা দ্যৌস্ এবং জ্যোতিষ্ক-দেবতা সবিতার আসন মেঘের দেবতা ইন্দ্রের অধিকারে চলে গেল, তা ভেবে দেখবার মতো।

ভূগোলশাস্ত্রের একেবারে প্রথম অধ্যায় থেকে শিশুরাও জানে যে, পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণই সাংবৎসরিক ঋতুক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে। মুখ্য ঋতু হচ্ছে দুটি—গ্রীষ্ম এবং শীত, আর গৌণ ঋতুও দুটি—শরৎ এবং বসন্ত। সৌরতাপের তারতম্যলব্ধ এই চার ঋতুই সর্বত্র স্বীকৃত। বর্ষা এবং হেমন্ত ভারতবর্ষের বিশেষ সম্পদ্। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার পূর্বে উক্ত চার ঋতুর পরিচয়ই জানত। তাই তাদের আকাশ ও তাপের দেবতা দ্যৌস্ এবং সবিতাই ছিল তাদের প্রধান দেবতা। নির্মেঘ শীতের রাজ্যে ওই দুই দেবতার প্রাধান্য স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তারা দেখল প্রকৃতির ভিন্ন রূপ। আকাশের ঘোর ঘনঘটা, গগনব্যাপী বিদ্যুৎ-ঝলক,

বজ্রের বৃংহণধ্বনি, দিগন্তকাঁপানো ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড গতি, বিশ্বপ্লাবী ধারাবর্ষণের খরবেগ,—ভারতবর্ষের আকাশের এই অভিনব বিচিত্রতা তাদের মনে যে অপূর্ব বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছিল, সেই বিস্ময়ই নূতন দেবতা ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছে দেবরাজের সিংহাসনে, সেই বিস্ময়ই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে ইন্দ্র, মেঘ, বজ্রবিদ্যুৎ ও বর্ষণের অজস্র বর্ণনায় ও বন্দনাগানে ঋগ্‌বেদের অসংখ্য সূক্তে। বস্তুতঃ বর্ষা-ঋতু তার বিচিত্র ও অপূর্ব মহিমায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে ভারতবর্ষের ঋক্‌সাহিত্যে। কেউ কেউ মনে করেন ঋতুমণ্ডলীর মধ্যে বর্ষার এই আধিপত্যই সংবৎসরকে 'বর্ষ' নামে অভিহিত করেছে। এই বর্ষাই ভারতবর্ষের বিশেষ সম্পদ্‌। তাই এই ঋতুর বর্ণনা ঋগ্‌বেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সকল যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বর্ষাবর্ণনায় ঋগ্‌বেদের পরেই মনে হয় কালিদাসের কথা। তাঁর মেঘদূতে ভারতীয় বর্ষামাধুর্য বিরহের অশ্রুস্পর্শে যে সজল কোমলতা লাভ করেছে, বোধ করি কোনো সাহিত্যেই তার তুলনা নেই। এই মেঘদূতের প্রভাবেই আজও 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' ভারতের সর্বত্রই 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ'। অতঃপর জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ', এই বর্ণনা আজও বাংলার সাহিত্যাকাশকে মেদুর এবং বাংলার মনোভূমিকে শ্যামল করে রেখেছে। এই মেদুরতা ও শ্যামলতাই মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যকে ঘন ছায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এইভাবে ভারতবর্ষের—

> শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
> ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
> শতেক যুগের গীতিকা,
> শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

করি ভারতবর্ষের এই শতেক যুগের কবিকণ্ঠ-নিঃসৃত ঘনীভূত বর্ষাগীতিরাশি
ঘটেছে র সহস্রধারায় বিগলিত হয়ে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসংগীতগুলিতে।
ঋতুপ্রকৃতির ক যুগের কবিদের মধ্যে কে বর্ষার এই রূপ কল্পনা করতে
কল্পনাবিলাসম

তা গভীর সাধ মধু-গন্ধে ভরা মৃদু-স্নিগ্ধছায়া নীপ-কুঞ্জতলে
উজ্জ্বল ভাবেই শ্যাম-কান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে ॥

ফিরে রক্ত-অলক্তক-ধৌত পায়ে ধারা-সিক্ত বায়ে,
মেঘ-মুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথি-প্রান্তে জ্বলে ॥
পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয়মদিরা
উন্মুখর তরঙ্গিণী ধায় অধীরা,
কার নির্ভীক মূর্তি তরঙ্গদোলে কল-মন্দ্ররোলে।
এই তারাহারা নিঃসীম অন্ধকারে কার তরণী চলে ॥

কোনো দেশের কোনো কালের সাহিত্যে বর্ষার এমন রূপ কল্পনায়ও দেখা দেয়নি। দেখা সম্ভবও নয়। একমাত্র ভারতবর্ষে এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যেই তা সম্ভব। বর্ষার কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

৩

বর্ষাকে কবি বলেছেন 'ভুবন-ভরসা'। এই ভরসার কথাও ভারতবর্ষেরই। গ্রীষ্মের প্রখর তাপের পরে আবার যখন আষাঢ় আকাশ ছেয়ে আসে, তখন তাতে যে শীতলতার আশ্বাস থাকে, তাই শুধু ভরসার কারণ নয়। আষাঢ়ের ঘন মেঘ আমাদের চোখে শুধু স্নিগ্ধতার কালো ছায়াই ফেলে না, হেমন্তের শস্যপূর্ণ মাঠের সোনার মায়াও মেলে ধরে। গ্রীষ্মের পরিণতি যেমন বর্ষার শ্যামলতায়, বর্ষার পরিণতিও তেমনি হেমন্তের সোনালিতে। হেমন্তের শোভাসৌন্দর্য শুধু প্রকৃতির দান নয়, তার জন্য চাই মানুষের কৃষিসাধনা—মাটিতে-মানুষে সহযোগিতা। এই যুক্ত সাধনার উপরেই পড়ে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর প্রসন্ন হাসির আলো। মানুষের কৃষিসভ্যতাই হেমন্তলক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলে। আর্যরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তখনও এদেশের অহল্যা-ভূমিতে কৃষিলক্ষ্মীর পাদস্পর্শ ঘটেনি। আর্যরাই প্রথমে অনার্য রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করে অহল্যা-ভূমিকেও শ্যামল ও রমণীয় করে তোলে এবং এই নব কৃষিসাধনার প্রতীক সীতা বা হলরেখাকে নিয়ে বিদেহ থেকে পঞ্চবটী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এই নবসভ্যতা বিস্তারের কাহিনী পাই রামায়ণ কাব্যে। এই রামায়ণই হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কৃষিকাব্য। পৃথিবীর আর কোথাও কৃষিকর্ম এমন কঠিন বিঘ্ন ও এমন কঠিন সাধনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়নি, তাই কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতেও পারেনি। এইজন্যই কৃষি-সাধনার আরাধ্য দেবতা হেমন্তলক্ষ্মীর এমন অদ্ভুত

বর্ণনা পাই রামায়ণকাব্যে। এই কাব্যের অরণ্যকাণ্ডে হেমন্তের যে বর্ণনা পাই, আর কোথাও তার তুলনা আছে কি না জানি না। ভারতবর্ষের এই কৃষিসাধনার ফলেই এদেশে হেমন্ত একটি বিশেষ ঋতু বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং এই ঋতু এমন একটি বিশেষ সৌন্দর্যে ভূষিত হয়েছে, অন্যত্র যার কল্পনাও সম্ভব নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ঋতুর শুধু শোভা নয়, তার তাৎপর্যও প্রকাশ পেয়েছে অনন্যসুলভ ভাষায় ও ভঙ্গিতে। হেমন্তের যে সৌন্দর্য বাঙালিমাত্রেরই হৃদয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তার মহত্তম প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রসংগীতেই।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।…

ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কী দেখেছি মধুর হাসি।…
ধেনু-চরা তোমার মাঠে
পারে যাবার খেয়া-ঘাটে,
সারাদিন পাখিডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে,—
ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী॥

আর, হেমন্তঋতুর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে 'রক্তকরবী' নাটকে। ওই ঋতুর যে আহ্বান মানুষকে প্রেরণা দিচ্ছে কল্যাণের পথে, সম্পদের পথে, সৌন্দর্যের পথে, তারই সুর ধ্বনিত হচ্ছে এই গানটিতে—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে,
মরি হায় হায় হায়।
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো দুয়ার খোলো ॥
আলোর হাসি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই যে উথলে,
মরি হায় হায় হায় ॥

যদিও গানে আছে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' তবু এ আহ্বান হেমন্তেরই, শীতের নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখা যায় হেমন্ত কখনও মিশে গেছে শীতের সঙ্গে, কখনও শরতের সঙ্গে। উপরের গানটিতে পৌষ হেমন্তেরই প্রতীক। শরৎ-হেমন্তের মিশ্রণের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'কল্পনা' কাব্যের বিখ্যাত 'শরৎ' কবিতায় আছে—

মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর···
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।···
আঁঠি আঁঠি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।···
আয় আয় আয়, আছে যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।···
মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।······

আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী ॥

শরৎ ও হেমন্তের অভিন্নতাবোধের আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে সোনার তরীর 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি। এই কবিতাটিতে যে ঋতুর বর্ণনা আছে, সে ঋতু 'পূজার ছুটির' পরবর্তী, অর্থাৎ হেমন্ত। কিন্তু অজ্ঞাতসারেই 'শরৎ' নামটি এসে পড়েছে এই কবিতাটিতে। যথা—

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর ;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।···
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে।···বহে খরবেগ
শরতের ভরাগঙ্গা।···
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া।

এখানে স্পষ্টতঃই শরৎ ও হেমন্ত কবির চোখে একই রূপে দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে শরতের স্বতন্ত্র প্রকাশও আছে, একথা এতই সুবিদিত যে, তার বিশদ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু একথা বলাই যথেষ্ট যে, বর্ষার কবির কাছে শরতের আকর্ষণও কম নয়। দীর্ঘকালব্যাপী মেঘাচ্ছন্নতা ধারাবর্ষণ ও উত্তাপের পর নির্মেঘ আকাশ, শ্যামল ধরণী ও স্নিগ্ধ পবনস্পর্শের মধ্যে যে শারদীয় সৌন্দর্যের প্রকাশ, তা শুধু বর্ষাপ্রধান দেশেই সম্ভব। ফুলের পরিণাম যেমন ফলে, বর্ষার পরিণামও তেমনি শরৎ ও হেমন্তে। যেসব দেশে বর্ষাঋতুর স্বাতন্ত্র্য নেই, সেসব দেশে শরৎ এবং হেমন্তের প্রকাশও অপূর্ণ। কালিদাস বর্ষার কবি, তাই তাঁর কাব্যে বহুস্থানেই শরতের অতি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। শরৎকে কোথাও বলা হয়েছে 'পঙ্কজলক্ষণা রাজলক্ষ্মী', কোথাও বর্ণনা করা হয়েছে 'পুণ্ডরীকাতপত্র' ও 'বিকসৎকাশচামর' নৃপতি বলে, কোথাও আছে শরৎকালের 'প্রফুল্লকাশা বসুধা'র কথা, কোথাও পাই মেঘহীন তারকাময় ছায়াপথবিভক্ত শরৎপ্রসন্ন আকাশের বর্ণনা। কালিদাসের

কাব্যে শরৎ বর্ণনার অভাব নেই। রবীন্দ্রকাব্যেও তাই। শিশুদের 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে' থেকে বড়দের 'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা' কিংবা 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' পর্যন্ত কত দৃষ্টান্তই যে মনে পড়ে তা বলা যায় না।

৪

বসন্ত বিশেষ করে ভারতবর্ষের ঋতু নয়। যেসব দেশে শীতের প্রচণ্ডতা অতিমাত্র, সেসব দেশেই বসন্তের বিশ্ববিমোহন রূপ বেশি। ভারতবর্ষের কবিরাও বসন্তের মোহনরূপের বর্ণনা কম করেন নি। বসন্তোৎসবও হত খুব সমারোহ করেই। কিন্তু বর্ষার ঘনগম্ভীর আকাশের ছায়ায় ও প্রকৃতির গভীর বিষাদ-মহিমায় অভ্যস্ত ভারতীয় মন বসন্তের মধ্যে যে অপূর্ব জীবনতত্ত্বের সন্ধান পেয়েছে, ভারতবর্ষের বাইরে আর কোথাও তা সম্ভব নয়। বসন্তের যে মোহন রূপ, সে রূপে সে মদনের সখা; মদনের ন্যায় সে দেবরোষানলে ভস্মীভূত না হলেও মদনের সখা বলেই দেব-তপোবনে সে লাঞ্ছিত ও ধিক্‌কৃত। কুমারসম্ভবে তাই দেখি 'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা' পার্বতী আপনার রূপের নিষ্ফলতায় লজ্জিত হয়ে সমস্ত পুষ্পাভরণ দূরে ফেলে দিয়ে তপস্বিনীর বেশ ধারণ করছেন। সে তপোবন থেকে বসন্তের ভূমিকাও অপসারিত! রবীন্দ্রকাব্যেও বসন্তের এই ব্যর্থতার কথা অতি করুণ অথচ অতি কঠিন সুরেই ধ্বনিত হয়েছে চিত্রাঙ্গদার মুখে।—

রোদনভরা এ বসন্ত
কখনো আসেনি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো
কিংশুকরক্তিমরাগে।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বপিপাসু মনে বসন্তের মোহনরূপের ব্যর্থতার কথা আরও স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এই গানে—

বসন্তে কি শুধুই কেবল
ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস নে কি শুকনো-পাতা
ঝরা-ফুলের খেলা রে॥

যে ঢেউ উঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে,
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর
জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখরে তোরা
ঝরা-ফুলের খেলা রে॥

বর্ষার গম্ভীরতায় অভ্যস্ত কবির কণ্ঠে বসন্তের মোহনবেশের অগভীরতা ও অনিত্যতার বাণী অপ্রত্যাশিত নয়। বসন্তে যে সাধনা ব্যর্থ, বর্ষাতেই তার সার্থকতার প্রত্যাশা তিনি করেছেন চিরকাল। ফাল্গুনের পরিপূর্ণ বসন্ত-সমারোহের মধ্যেই তিনি লিখেছিলেন 'গগনে গরজে মেঘ ঘনবরষা'র বর্ণনা; যখন 'শ্রাবণগগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে' তখনই তাঁর সোনার ধানে তরী ভরে দেবার উপযুক্ত সময়। তাঁর ফাল্গুনের প্রত্যাশা শ্রাবণে পূর্ণ হবার কথা আরও গভীরভাবেই প্রকাশ করেছেন 'আবির্ভাব' কবিতায়।—

বহু দিন হল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়,
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে,
আজি নবঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরানে যে-গান বাজাবে
সে-গান তোমার করো সায়,
আজি জলভরা বরষায়।···
আস নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায়;
এস এস ভরা বরষায়।···
এ পরান ভরি যে-গান বাজাবে
সে-গান তোমার করো সায়;
আজি জলভরা বরষায়॥

বর্ষাঋতুসাধক কবি তার পরেও এই বর্ষাতেই তাঁর জীবনসাধনার পরিসমাপ্তি কামনা করেছিলেন।—

যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎ-ফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

বর্ষাসাধক কবির সমস্ত ঋতুসাধনাই অবশেষে পরিসমাপ্ত হয়েছে তাঁর বহুবাঞ্ছিত বর্ষাতেই। ভরা বসন্তে চিরপ্রতীক্ষিত তাঁর দয়িতের 'আবির্ভাব' ঘটেছে জলভরা ঘন বরষায় তাঁর জীবনসংগীত বর্ষার ছন্দেই ছন্দ মিলিয়ে অনন্তে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সেই মহাবরষার রাঙাজলও তাঁর অস্তায়মান জীবনের শেষ রশ্মিতে চিরকালের মতো রক্তিম আভায় রঞ্জিত হয়ে রইল। আমরাও সেই রক্তিম আভায় সেই মহাবরষার রাঙাজলের তীরে দাঁড়িয়েই তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলাম ॥

রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস

মানুষের আচরণে অসংগতি-অশোভনতার অন্ত নেই, এই বিচিত্র অসংগতির প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে যে বিরক্তি ক্রোধ প্রভৃতি আবেগের উদয় হয় তারও অন্ত নেই। এই আবেগগুলি নির্ভর করে দ্রষ্টার মানসিক অবস্থা কিংবা মননভঙ্গির উপরে। এসব আবেগের মধ্যে একমাত্র কৌতুকানুভূতিই আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে প্রীতিকর। তাই স্বভাবতঃই এই কৌতুকবোধকে সাহিত্যের উপজীব্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই কৌতুককে আশ্রয় করে যে সাহিত্যরসের উদ্‌ভব হয় তারই নাম হাস্যরস। ভারতীয় আলংকারিকদের মতে হাস্যরসসৃষ্টি সাহিত্যরচনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে যে হাস্যরসের সাক্ষাৎ পাই এবং অলংকারশাস্ত্রে যার বর্ণনা দেখা যায়, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে তারই অনুবর্তন চলে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হাস্যরসের বিবর্তনের বা বৈচিত্র্যসৃষ্টির কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। হাস্যরস-রচনার বিপদ্‌ এই যে, যদি তা যথার্থ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত না হয় তবে তা অনিবার্যরূপেই কদর্য রুচিবিকৃতি বা ভাঁড়ামির স্তরে নেমে যায়। আর সামান্য রুচিবিকারের সংস্পর্শে নির্মল হাস্যরসও গেঁজে উঠে ভদ্রসমাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ হাস্যরস রচনার প্রয়াসটাই অনেক সময় হাস্যকর হয়ে ওঠে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সময় পর্যন্ত বাংলাসাহিত্য এই নিম্নস্তরের রুচিবিকারের অজস্রতায় পরিপূর্ণ। অতঃপর মধুসূদন, দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাঙালির হাস্যরসে নূতন স্বাদগন্ধ দেখা দিল। তখন থেকেই বাংলা হাস্যসাহিত্যের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের আবিলতা ঘুচিয়ে পরিস্রুত নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। বাংলার হাসিকে অনাবিল আনন্দের আলোতে যাঁরা উজ্জ্বল করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর দুর্গেশনন্দিনীতে হাসবার যে চেষ্টা দেখা যায়, তাকে কিছুতেই উচ্চাঙ্গের বলে বর্ণনা করা চলে না। তার সঙ্গে লোকরহস্য বা কমলাকান্তের যে ব্যবধান তা কালের মাপে খুবই স্বল্প, কিন্তু রসোৎকর্ষের মাপে তা উপেক্ষণীয় নয়।

হাস্যরসসৃষ্টিতে বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন এবং প্রতিভার প্রকৃতিভেদে হাসির রচনাতেও বৈচিত্র্য ঘটে। তা ছাড়া উপলক্ষ্য বা উপাদান-ভেদেও হাসির রূপভেদ হয়। রহস্য, পরিহাস, কৌতুক, ব্যঙ্গ, রঙ্গ, রগড়, মজা, তামাশা প্রভৃতি আসলে পরস্পরের ঠিক প্রতিশব্দ নয়। এগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তদনুসারে আমাদের হাসিতেও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। বিভিন্ন ফলের স্বাদে বা ফুলের গন্ধে যে বিচিত্রতা, বিভিন্ন ধরণের হাস্যরসেও সেই বিচিত্রতা। বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকেই বাঙালির দন্তবিকাশ-ভঙ্গিতে নিত্যনবীনতা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, পরশুরাম, সুকুমার রায় প্রভৃতি আমাদের যে হাসির রস পরিবেশন করেছেন তার স্বাদপার্থক্য যিনি অনুভব করতে পারেন না, তাঁকে রহস্যনিবেদন দুর্ভাগ্যেরই নামান্তর। এই স্বাদপার্থক্যের কারণ-বিশ্লেষণ বর্তমানে আমাদের বিবেচ্য নয়। তবু একটিমাত্র কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মানুষের কাছে ফলের গন্ধের যে ব্যঞ্জনা, মৌমাছির কাছে ফুলের গন্ধেরও তাই; উভয়ত্রই ভোজ্যত্বের ইঙ্গিত অনতিপ্রচ্ছন্ন। ওই গন্ধে যে আনন্দের উদ্ভব হয় তা অহেতুক নয়। পক্ষান্তরে মানুষের কাছে ফুলের গন্ধের যে ব্যঞ্জনা, তাতে রসনাগ্রাহ্যতার আভাসমাত্রও থাকে না। এভাবে দেখলে বলা যায় হাস্যরসের রচনাও মোটামুটিভাবে দ্বিবিধ। এক শ্রেণীর রচনা হাসির গন্ধে মানুষের মনকে আকর্ষণ করে কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে, আর এক শ্রেণীর রচনা ফুলের সৌরভের মতো শুধু হাসির মাধুর্য বিকিরণ করেই সার্থকতা লাভ করে। এই যে উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ হাস্যরস, তা ফলশস্যের মতো কোনো স্থূলবস্তুকে আশ্রয় করে থাকে না; তার আশ্রয় ফুলের পাপড়ির মতোই লঘু ও পেলব, তার স্পর্শে কেউ আহত হয় না। এই অহেতুক লঘু হাসির উপলক্ষ্য হতে পারে দুনিয়ার সব কিছুই, এমন কি রচয়িতা নিজেও। বিলেতি শিক্ষার মোহগ্রস্ত সাহেবম্মন্য বাঙালিকে লক্ষ্য করে মধুসূদন তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে নব বাবুর মুখে বসিয়েছেন এই উক্তি।—

> জেণ্টেলমেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েচি।

তখনকার দিনে সকলেই জানতেন এই উক্তি মধুসূদনের নিজের সম্বন্ধেই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলেতফেরতা'

প্রভৃতি হাসির গানেও রচয়িতা নিজেই হাস্যাস্পদের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হাসবার ক্ষমতা সকলের স্বভাবগত নয়। হাসি কারও কারও জন্মসহচর। আবার সুকুমার রায়ের 'রামগরুড়ের ছানা'-জাতীয় মানুষেরও অভাব নেই সংসারে। শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, জাতিতে জাতিতেও এই পার্থক্য দেখা যায়। সব জাতি সমান রসিক নয়, সব সাহিত্যের হাস্যসম্পদ্‌ও সমান নয়। সুখের বিষয় বাঙালি জাতিকে অরসিক পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করবার কারণ নেই। ঈশ্বর গুপ্তের 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা' কথাটাকে একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চৈতন্যপূর্ব যুগের বাংলা সাহিত্যের যে ধ্বংসাবশেষ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তাতে বাঙালি জাতির পূর্ণ পরিচয় পাবার আশা করা যায় না। 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ', 'বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে' ইত্যাদি উক্তিতে পরোক্ষেও কোনো রসিকতা প্রচ্ছন্ন আছে কিনা বলা শক্ত। কিন্তু চৈতন্যদেবের সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে মাঝে মাঝেই যে হাস্যের রোল শোনা যায় তাতে আর কিছু না হক বাঙালিকে নেহাতই রামগরুড়ের জাতি বলে মনে করা যায় না। চৈতন্যদেব নিজেও অরসিক ছিলেন না, তার প্রমাণ আছে তৎকালীন সাহিত্যে। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত (১।১০) থেকে একটা অংশ উদ্‌ধৃত করি।—

> সভার সহিত প্রভু হাস্যকথারঙ্গে
> কহিলেন যেন-মত আছিলেন বঙ্গে।
> বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া
> বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।...
> বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া,
> কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া॥

আধুনিক কালে আমাদের কবিগুরু সম্বন্ধেও এই কথাগুলি প্রায় সমভাবেই প্রযোজ্য। তিনিও তাঁর 'বাঙাল' অনুচরদের ভাষা ও উচ্চারণ নিয়ে রঙ্গরসিকতা করতে বিশেষ আনন্দই পেতেন। আশা করি তাঁর পূর্ববঙ্গীয় পরিচরেরা এই মন্তব্যের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে কুণ্ঠা বোধ করবেন

না। অবশ্য এইজাতীয় পরিহাসপ্রিয়তার নিদর্শন তাঁর সাহিত্যেও একান্ত দুর্লভ নয়।

পূর্বে বলেছি হাস্যরসবোধ সকলের সহজাত নয়। যাঁরা হাসবার ক্ষমতা নিয়ে জন্মান তাঁরা ভাগ্যবান্, হাসতে না পারার মতো দুর্ভাগ্য মানুষের জীবনে আর কি হতে পারে? কিন্তু রসিক পুরুষের সাহচর্যে বা রসরচনা-চর্চার দ্বারা হাসবার ক্ষমতা অর্জন করাও যায়। এইখানেই হাস্যরসস্রষ্টার সার্থকতা ও গৌরব। মানুষ ও পশুর একটি প্রধান পার্থক্য এই যে মানুষ হাসতে পারে, পশু পারে না। সুতরাং হাস্যরসিকরা পরোক্ষে আমাদের একটি মানবিক শক্তিবিকাশেরই সহায়তা করেন। যাঁরা একটা গোটা জাতিকে হাসতে শেখান এবং হাসিয়ে যান তাঁরা সমগ্র জাতিরই পরম বন্ধু। বাঙালিকে যাঁরা দুর্লভ হাস্যসম্পদের অধিকারী করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম সাধারণপর্যায়ভুক্ত নয়। আজ যে বাংলার সাহিত্যাকাশ দন্তরুচিকৌমুদীর আভায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে তার অনেকখানি কৃতিত্বই তাঁর প্রাপ্য। সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় হাস্যের দিক্‌টাও তাঁরই জাদুস্পর্শে এমন বিচিত্রতা ও অজস্রতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর গুপ্তের একটি বিখ্যাত রসিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অতি সাধারণ ধরণের কৌতুকরচনার তুলনা করলেই বোঝা যাবে বাঙালির হাসিতে কি অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে এই সময়ের মধ্যে। ঈশ্বর গুপ্তের পাঁটাস্তবের দুটি শ্লোক উৎকলন করছি।—

> এমন পাঁটার মাংস নাহি খায় যারা
> ম'রে যেন ছাগীগর্ভে জন্ম লয় তারা।···
> অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া
> অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া॥

এর সঙ্গে তুলনা করা যাক রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'র এই ক-টা লাইন—

> বাংলা দেশের মানুষ হয়ে
> ছুটিতে ধাও চিতোরে,
> কাঁচড়াপাড়ার জলহাওয়াটা
> লাগল এতই তিতো রে?

মরিস ভয়ে ঘরের প্রিয়ার,
পালাস ভয়ে ম্যালেরিয়ার,
হায় রে ভীরু, রাজপুতানার
ভূত পেয়েছে কি তোরে ?
লড়াই ভালোবাসিস,— সে তো
আছেই ঘরের ভিতরে ॥

হাসিতে হাসিতে কত সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকতে পারে, হাসি ও কান্না পরস্পরের কত কাছে আসতে পারে, রবীন্দ্রসাহিত্যেই তার পূর্ণ পরিচয় পাই। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যান্য দিকের ন্যায় এই দিক্‌টারও আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার উজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণবিভূতিতে আমাদের চোখে ধাঁধা লেগে যায়, তাই তাঁর হাস্যমহিমার দিক্‌টা অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁর প্রতিভা ছিল হীরকখণ্ডের মতো বহুমুখী এবং কঠিন, আর হীরকখণ্ডের মতোই তার থেকে নিয়তই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হাসির আভা ঠিকরে বেরোত। যে নিত্যপ্রসন্নতা তাঁর মনে বিরাজমান ছিল, তাঁর মুখে-চোখেও তাই প্রতিভাত হত। আর তাই যেন মাঝে মাঝে সংহত হয়ে তাঁর এক-একটি উক্তি থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো বিচ্ছুরিত হত। সুতরাং রবীন্দ্রপ্রতিভাকে সম্যক্‌ভাবে জানতে হলে তার এই হাস্যোচ্ছলতার দিক্‌টারও আলোচনা হওয়া দরকার।

আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু

বাংলার মনীষী-কবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে স্বভাবতঃই সারাদেশময় তাঁর মানসসত্তার স্বরূপবিশ্লেষণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর দেহ-সত্তার স্বরূপ-আলোচনারও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কবি এক জায়গায় রহস্য করে বলেছেন—

কাব্য পড়ে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।
চাঁদের পানে চক্ষু তুলে
রয়না পড়ে নদীর কূলে,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
মনের সুখেই বয় গো॥

এই যে রহস্য, এটা একান্তই রহস্য নয়। কবি তাঁর কল্পনার জগতে যে রূপেই আবির্ভূত হন না কেন, বাস্তব জীবনের জগতেও তিনি শুধু চাঁদের সুধা, ফুলের সুষমা, আকাশের নীলিমা ও হৃদয়ের বেদনা নিয়েই জীবন কাটান না। আসল কথা কবি নিজেই ফাঁস করে দিয়েছেন।—

ভালোবাসে ভদ্রসভায়
ভদ্র পোশাক পরতে অঙ্গে,
ভালোবাসে ফুল্লমুখে
কইতে কথা লোকের সঙ্গে।
বন্ধু যখন ঠাট্টা করে,
মরে না সে অর্থ খুঁজে,
ঠিক যে কোথায় হাসতে হবে
একেক সময় দিব্যি বুঝে॥

বোঝা গেল কবিও সামাজিক মানুষ, তাই সামাজিক পোশাক-পরিচ্ছদ, হাস্য-পরিহাসের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য নেই। শুধু তাই নয়। কবির ক্ষুধা-তৃষ্ণা-স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্যময় একটি দৈনিক জীবনও আছে এবং সে দিকেও তিনি উদাসীন নন।—

সামনে যখন অন্ন থাকে
থাকে না সে অন্য মনে।

কাজেই দেহের পুষ্টি ও তজ্জাত মানসিক আনন্দ থেকে কবি বঞ্চিত থাকেন না, তাঁর প্রাণের বেদনা ও হা-হুতাশ কল্পিত বস্তু মাত্র। তাই—

মুখের হাসি থাকে মুখে,
দেহের পুষ্টি পোষে দেহ ;
প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে
জানে না সে খবর কেহ ॥

দেহগত জীবন-আনন্দের প্রতি কবি যে শুধু উদাসীন নন, তা নয়। সেদিকে তাঁর একটি সচেষ্ট প্রয়াসের আভাসও তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্যে। তাঁর নিজের মনেই এই কল্পনার উদয় হয়েছিল—

কাব্য যেমন, কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে—
স্নানাহারের নিয়ম রাখে।
সহজ লোকের মতই যেন
সরল গদ্য কয় গো ॥

বস্তুতঃ স্নানাহারের নিয়মরক্ষা করে স্বাস্থ্যবান্ হওয়া যে যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ, এ-কথা কখনও তিনি বিস্মৃত হন নি। এ-বিষয়ে তিনি কতখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন সে কথা পরে বলা যাবে।

তৎপূর্বে বলা প্রয়োজন, স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণের কোন্ আদর্শকে তিনি অহরহ আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। তিনি নানা জায়গায় নানাভাবে বলেছেন— মানুষের মধ্যে জীব ও দেব উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে, কিন্তু তার জীবটিকে অনাহারে অস্বাস্থ্যে অক্ষম ও পঙ্গু করে রেখে তার দেবতাকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয় ; বরঞ্চ ওই দেবতাকে যথোচিত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ওই জীবটিকে স্বাস্থ্যে ও পুষ্টিতে প্রাণবান্ ও বলবান্ করে তোলা। অথচ আমাদের দেশে তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাই স্বাভাবিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের জনগণের অন্ন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শক্তির অভাবে যে মুমূর্ষু দশা ঘটেছে, তার দৈন্যময় চিত্র রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে আমরণ পীড়িত করেছে। তাঁর এই মর্মান্তিক বেদনার কথা প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী সাহিত্যরচনার মধ্যে বহু স্থলে ফুটে

বেরিয়েছে। ১৮৯৪ সালে রচিত “এবার ফিরাও মোরে” কবিতায় আমাদের দেশের যে অগণিত জনসাধারণ “শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া” তাদের বেদনার কাহিনী শোণিতাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে অমর করে রেখে গিয়েছেন। আর, মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বেও (জানুআরি, ১৯৪১) দেশের ওই ক্ষুধিত জনগণের রোগজীর্ণ মুমূর্ষু দৃশ্য আবার আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।—

মহাঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য-ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের কম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার
শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত।

আমাদের দেশের মর্মবিদারী চিত্রকে কোনো শক্তিমান্ রাজনৈতিক বক্তাও এর চেয়ে তীব্র ও জ্বালাময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। এই নিদারুণ অবস্থার প্রতিকারের জন্যে কবিচিত্তও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।—

এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।
যদি থাকে প্রাণ,
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আজি দান।

কবি বেদনার আবেগে নিজের প্রাণ দিয়ে এই কঠিন দৈন্যের প্রতিকারে আত্মোৎসর্গ করতে ব্রতী হলেন। কিন্তু শুধু প্রাণ দিলেই তো হয় না। প্রাণের বিনিময়ে কি চাই, সে-বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। সুখের বিষয় এ-ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ কবিজনসুলভ কল্পনাপ্রবণ অবাস্তব ধারণার বশবর্তী ছিলেন না। প্রখর বাস্তববুদ্ধি নিয়েই তিনি বলেছেন—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।

কবির এই প্রখর বাস্তবানুভূতি শুধু হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে পর্যবসিত হয়ে ব্যর্থ হয় নি। এ অনুভূতি তাঁর জীবনসাধনার মধ্যে নিরন্তর জাগ্রত থেকে তাঁর বিচিত্র কার্যক্ষেত্রেও বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর জীবন-চরিতই এ-বিষয়ের যথোচিত আলোচনার প্রকৃষ্ট স্থান। এ-স্থলে আমরা ও-বিষয়ে কয়েকটিমাত্র প্রাসঙ্গিক কথা বলেই ক্ষান্ত হব।

প্রথমতঃ, আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা সম্বন্ধে অজস্র গ্রন্থ পাঠ করে বহুবিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন এবং সে জ্ঞান দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তিনি কখনও আলস্য বা কার্পণ্য করেন নি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে কত স্থানে যে মুখ্য বা গৌণ ভাবে তিনি এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন, তা ভাবলে অবাক্ হতে হয়। প্রকাশ্য সভাতেও তিনি এ-বিষয়ে আলোচনা করা সংগত বোধ করেছেন। কিছুকাল পূর্বে কলকাতায় যে খাদ্য ও পুষ্টিপ্রদর্শনী হয়েছিল, তারও উদ্‌বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির দ্বারা পুষ্টিপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন অন্য দেশে যতই বিসদৃশ হক, আমাদের দেশে কিন্তু তা হয় নি; বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই হয়েছিল। কারণ, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার ক্ষেত্রে একাধারে অসাধারণ কবিত্ব ও পুষ্টিতত্ত্বের বিশেষজ্ঞতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। উক্ত উদ্‌বোধন উপলক্ষে তিনি যে-সব কথা বলেছিলেন, বিশেষতঃ বাঙালির ঘরে ঘরে ভাত রান্না করে তার প্রাণবস্তুকেই ফেনের সঙ্গে নর্দমায় ঢেলে দেবার মূঢ়তা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন, তা সহজে ভোলবার নয়। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বেও বিশ্বভারতীর অন্যতম শাখা লোকশিক্ষাসংসদের পক্ষ থেকে 'আহার ও আহার্য' সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান্ পুস্তক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা লিখিয়ে দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। তাঁর অন্যতম অপূর্ব সৃষ্টি 'শ্রীনিকেতন'। দেশের মধ্যে অন্ন, স্বাস্থ্য, শক্তি ও পরমায়ু-বৃদ্ধির জন্যে তাঁর অন্তরের সাধনা যে ব্যাবহারিক জগতেও বাস্তব সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েছিল, তার জাজ্বল্যমান মূর্ত প্রমাণ হচ্ছে ওই শ্রীনিকেতন। এই শ্রীহীন দেশে শ্রী ফিরিয়ে আনবার কামনাই ছিল কবির অন্যতম ঐকান্তিক সাধনা। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যথার্থ বরপুত্র ছিলেন তিনি। তাই তিনি শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়ে দেশকে যুগপৎ শ্রী ও ভারতীর যথার্থ আবাসভূমিরূপে গড়ে তোলাকেই করেছিলেন জীবনের ব্রত। বিশ্বভারতীর ছাত্রদের আহার

ও ব্যায়ামের যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাঁর তত্ত্বাবধানে, তাতেও স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি দেশবাসীর মনকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সৌন্দর্যে-আনন্দে সমৃদ্ধ ও মণ্ডিত করাকেই একান্ত করে তোলেন নি, আমাদের দেহকেও জ্ঞানসমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত মনের যোগ্য অধিষ্ঠানভূমিরূপে গড়ে তোলার দিকেও তাঁর উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। আবার শুধু আহার্য বস্তুর বৈজ্ঞানিক পুষ্টিপ্রবণতার দিকেই তিনি লক্ষ রাখেন নি। আহার্য বস্তুকে আহারকারীর জঠর ও রসনা, দেহ ও দেহীর তৃপ্তি, উভয়েরই উপযোগী করে প্রস্তুত করা চাই। শুধু উদরপূর্তি ও পুষ্টিকারিতাই খাদ্যের একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়। রসনার তৃপ্তিসাধনক্ষমতাও খাদ্যের একটি অপরিহার্য গুণ হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথ এক স্থলে লিখেছেন, "খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়— পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুসি হইয়া জাগিয়া উঠে— তাহাতে জারকরসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়।" কিন্তু খাদ্যদ্রব্য মুখে দিলেও যদি যথোচিত স্বাদের সুখ না পাওয়া যায়, পেট যদি খুসি 'হইয়া না উঠে' তবে জারকরসগুলির আলস্য দূর হয় না এবং নিতান্ত পুষ্টিকর খাদ্যও আহারকারীর পুষ্টির কিছুমাত্র সহায়তা করে না। অতএব খাদ্যদ্রব্য যথোচিত স্বাদু হওয়া চাই। অনেকাংশই তার নির্ভর করে রন্ধনকার্যের উপর। ওই রন্ধনকার্যের মধ্যে যথানুপাতে বিজ্ঞান ও শিল্পের সমন্বয় ঘটা চাই। এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ খুব সচেতন ছিলেন,—এর অনুকূলে আমি ব্যক্তিগত সাক্ষ্যও উপস্থাপিত করতে পারি। তিনি একটি নবপরিণীতা বধূকে রহস্য করে লিখেছিলেন—

> "পাক-প্রণালী"র মতে কোরো তুমি রন্ধন,
> জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।
> চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
> স্ব-রচিত বলে দাবি নাহি করে মুচিটা,
> পাতে বসি' পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন ॥

এই রহস্যের অন্তরালে অনেকখানি সত্যও নিহিত রয়েছে। খাদ্যবস্তুকে রন্ধনকৌশলের দ্বারা যথোচিতভাবে রসনার পক্ষে তৃপ্তিকর ও জঠরের পক্ষে সহজপাচ্য করে তোলা চাই, এ-কথা তিনি স্বীকার করতেন। তাই তিনি নিজে রন্ধনপটু গিন্নি না হয়েও রন্ধনশিল্পবিষয়ক বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ

করেছিলেন এবং যতদিন তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবী বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁকে রান্না-বিষয়ে নানাভাবে সহায়তা করতেন ও উপদেশ দিতেন। কিন্তু শুধু রসনার তৃপ্তিসাধনের অস্বাভাবিক লোভকে তিনি তীব্র কশাঘাত করেছেন। শুধু রসনার তাড়নায় ঘৃত প্রভৃতি ভেজাল দ্রব্য ব্যবহারকে তিনি নানাভাবে নিবারণের চেষ্টা করেছেন। কোনো ক্ষেত্রে মর্মান্তিক শ্লেষ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি।—

ওজন করি' ভোজন-করা তাহারে করি ঘৃণা,
মরণভীরু এ-কথা বুঝিবি না।

অতএব—

অসংকোচে করিবে কষে ভোজন-রস ভোগ,—
সাবধানতা, সেটা যে মহারোগ।
যকৃৎ যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত র'বে, কিসের ভয়,
না-হয় হবে পেটের গোলযোগ॥

লোভীদের এই অমিতাহারের অনিবার্য ফল হচ্ছে মৃত্যু, সে-কথাও তিনি ব্যঙ্গের স্বরে আমাদের শুনিয়েছেন।—

খাওয়া বাঁচিয়ে বাঙালিদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এদেশে তবে ধরিত না তো লোক।
অপরিপাকে মরণভয়
গৌড়জনে করেছে জয়,
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক॥

শুধু অমিতাহার নয়, কু-পথ্যও বাঙালিদের অকালমৃত্যুর অন্যতম কারণ। সে কথাও তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় ভঙ্গিতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।—

লঙ্কা আনো, সর্ষে আনো, শস্তা আনো ঘৃত,
গন্ধে তার হয়োনা শঙ্কিত।
আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,
ঘন্ট আর ছেঁচকি রাঁধো,
বৈদ্য ডাকো,—তাহার পরে মৃত॥

রবীন্দ্রনাথ শুধু খাদ্য ও আহার-তত্ত্বের কথাই বাঙালিকে বলে যান নি। 'আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু'— এও তাঁরই কথা। সে জন্যেই ধূমধূলিপূর্ণ শহরের অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ছেড়ে উদার উন্মুক্ত মাঠের নির্মল বায়ু ও স্বচ্ছ আলোর প্রাকৃতিক শান্তি-নিকেতনের মধ্যে তিনি তাঁর বিদ্যার্থিমণ্ডলকে নিয়ে শিক্ষাতপোবনের আশ্রম গড়ে তুলেছেন। কিন্তু শুধু খাদ্য, বায়ু, আলো হলেও চলে না। 'আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু' ও 'সাহসবিস্তৃত বক্ষপট' পেতে হলে প্রচুর ব্যায়াম বা শরীরচর্চারও প্রয়োজন আছে। শান্তি-নিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে খেলাধুলো ও ব্যায়ামেরও প্রচুর ব্যবস্থা তিনি করেছেন। এক সময়ে তিনি জাপান থেকে একজন খ্যাতনামা মল্লকে আনিয়ে আশ্রমের অধিবাসীদের জিউজুৎসু বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল শরীরচর্চা ও আত্মরক্ষার উপযোগী এই বিদ্যাটি ওখান থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রসার লাভ করে। কিন্তু আমাদের ঔদাসীন্যের ফলে তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি।

স্বাস্থ্যবিধিলঙ্ঘনের ফলে এবং কখনও কখনও নানারকম অজ্ঞাত কারণে মানুষের স্বাস্থ্যভঙ্গও প্রায়শঃই ঘটে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে, যেখানে কোনো মতে প্রাণরক্ষা করাই কঠিন ব্যাপার, সেখানে রোগের দুর্নিবার প্রাবল্য এবং অসহায় নরনারীর রোগভোগ ও অকালমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কোমল চিত্তকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তাই মানুষের রোগশান্তির মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং নিজে বহু জটিল রোগের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। আমাদের দরিদ্র দেশের উপযোগিতা-বোধে ও অন্যান্য নানা কারণে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারীতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি বায়োকেমিক চিকিৎসাপদ্ধতিই বেশি অনুসরণ করতেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত কত লোককে চিকিৎসা ও রোগমুক্ত করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। বহু লোককে তিনি উৎসাহ দিয়ে চিকিৎসাব্রতী ও চিকিৎসাব্যবসায়ী করে গড়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, চিকিৎসাগ্রন্থের মূল্যবান্ ভূমিকাও তিনি লিখেছেন।

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ সুকুমার-সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, চিত্র, নৃত্য, সংগীত প্রভৃতি মানসিক সংস্কৃতিকেই জাতির সম্মুখে

একমাত্র আদর্শরূপে উপস্থিত করেন নি। মানুষের দেহগত সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যও তাঁর মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। বস্তুতঃ দেহ ও মনের সুসমঞ্জস বিকাশই ছিল তাঁর আদর্শ। মানুষকে শুধু 'সুস্থ' হলে চলে না, তার পক্ষে 'স্বস্থ' হওয়াও অবশ্য বাঞ্ছনীয়। মানুষ যখন স্ব-প্রকৃতি ও স্ব-মহিমায় অধিষ্ঠিত হয় তখনই তাকে স্বস্থ বলে অভিহিত করতে পারি। এই স্বাস্থ্যের দ্বারা দেহ ও মন উভয়েরই স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক বিকাশ বোঝায়। বস্তুতঃ এই ব্যাপকার্থক স্বাস্থ্যই হচ্ছে পরিপূর্ণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ আদর্শ। এই আদর্শের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাণী ও কর্ম উভয়ের মধ্য দিয়েই পুনঃপুনঃ প্রচার করেছেন। শুধু তাই নয়। তাঁর নিজের আচরণ ও দেহগত সৌষ্ঠবের দ্বারা ঐ আদর্শকে তিনি যেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এমন আর কিছুতেই নয়। সে-কথাটাই এখন বলব।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু চিত্তোৎকর্ষের দিক্ থেকেই আদর্শ পুরুষ ছিলেন তা নয়, দেহোৎকর্ষের বিচারেও তাঁকে আদর্শ বলে অনায়াসেই গ্রহণ করা যায়। তিনি বলেছেন দেহশক্তিহীন পণ্ডিত বা বুদ্ধিশক্তিহীন পালোয়ান, কেউ আদর্শ-স্থানীয় হতে পারে না। এই উভয় শক্তির সুষ্ঠু সামঞ্জস্যেই আদর্শের উৎপত্তি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ওই অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। যাঁরা তাঁর অসাধারণ স্বাস্থ্য-সম্পদের প্রতি লক্ষ রেখেছেন তাঁরাই একথার সত্যতা স্বীকার করবেন। তাঁর সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুগঠিত পেশী, প্রশস্ত অস্থি, ঋজু গতিভঙ্গি দুর্বল ও ক্ষীণজীবী বাঙালিদের মধ্যে দুর্লভ, একথা স্বীকার করতেই হবে। দৈহিক শক্তিমত্তা ও সৌষ্ঠবের বিচারেও তাঁকে পুরুষসিংহ বলে অভিহিত করলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের যে শালপ্রাংশু ব্যূঢ়োরস্ক মহাকায় বীরপুরুষের দৈহিক আদর্শের কথা তিনি আমাদের বলেছেন, সেই আদর্শ তাঁর মধ্যেই মূর্তিপরিগ্রহ করেছিল।

কিন্তু এই আদর্শস্থানীয় স্বাস্থ্য, বলিষ্ঠ দেহ ও বিস্তৃত বক্ষপট অনায়াস-লভ্য নয়। তার জন্যেও তাঁকে অনেক সাধনা করতে হয়েছিল। আমরা জানি বাল্যকালে তিনি ল্যাঙ্গট পরে প্রত্যহ প্রত্যূষে কুস্তি করতেন পিতা ও অগ্রজদের ব্যবস্থাঅনুসারে। সারাজীবন তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বে গাত্রোত্থান করতেন। বাল্যকালে তাঁর পিতা হিমালয়ের পাদদেশেও শীতকালে অতি প্রত্যূষে ঠাণ্ডা জলে স্নান করার অভ্যাস করিয়েছিলেন। সে অভ্যাস তিনি

পরিণতবয়সেও রক্ষা করেছিলেন। তাঁর দাদারা তাঁকে সাহসী করে তোলবার জন্যে সর্বপ্রকার দুঃসাহসিক কার্যে উৎসাহ দিতেন। এমন কি, অতি বাল্যকালেও তাঁকে ব্যাঘ্রশিকারে নিয়ে যেতে দ্বিধা করতেন না। তাঁকে অশ্বারোহণে ও বন্দুক-ব্যবহারেও দক্ষ করে তুলেছিলেন। সন্তরণে তিনি এতটা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেও তিনি সাঁতার কেটে বিশাল পদ্মা নদী পার হয়ে যেতে পারতেন। পনেরো কুড়ি মাইল তিনি অনায়াসে হেঁটে চলে যেতেন এবং চল্লিশ বৎসর বয়সের পরেও তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সঙ্গে দৌড়প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন। এই কটি কথা থেকেই বোঝা যাবে, কি দুর্লভ স্বাস্থ্য এবং দৈহিক সামর্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। আর, এ-জন্য বার বার পৃথিবী পরিভ্রমণের ক্লেশ ও অনিয়ম তিনি অনায়াসেই সহ্য করতে পেরেছিলেন। সত্তর বছর বয়স পার করে তিনি যখন এরোপ্লেনে ইরাণ-যাত্রায় উদ্যত হলেন, তখন অনেকেই তাঁকে ওই দুঃসাহসিক কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নির্ভীকচেতা কবি কারও কথায় কর্ণপাত করেন নি। এমন অনিন্দ্যসুন্দর স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতাও হয়েছিল অসাধারণ। বস্তুতঃ পৃথিবীর কোনো দেশে তাঁর চেয়ে বেশি পরিশ্রমী মনীষী আর কেউ জন্মেছেন কি না সন্দেহ। তাই তো তিনি এক জীবনেই বহু জীবনের কাজ সম্পন্ন করে যেতে পেরেছেন। পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জীবনের শেষ বছরেও তিনি রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে দশখানি বই রচনা করে গিয়েছেন। আর শেষ কথা এই যে, ক্ষীণজাবী বাঙালির ঘরে জন্মেও যে তিনি কর্মবহুল সুদীর্ঘ আশি বৎসর পরমায়ু লাভ করেছিলেন, সেটাও কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। তিনি দেশের জন্য যে সুদীর্ঘ আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু প্রার্থনা করেছিলেন, তার অধিকারী তিনি নিজেও হয়েছিলেন। আমরা যদি শুধু রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও কবিপ্রতিভার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং তাঁর দৈহিক জীবন ও আদর্শের অনুসরণ না করি, তা হলে তাঁর প্রতিও সমুচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা হবে না এবং তাঁর আদর্শও আমাদের মধ্যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

রবীন্দ্রবিলাস

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। যুগে যুগে যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে তখনই তাঁর আবির্ভাবের প্রয়োজন দেখা দেয়। গীতার এই উক্তির মধ্যে মানবচরিত্র সম্পর্কে একটি পরম সত্যের স্বীকৃতি নিহিত রয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের চিত্তকে নিত্যজাগরূক রাখা প্রয়োজন। সে সত্যটি এই যে, মহাপুরুষেরা আসেন, সমাজচিত্তে ধর্মের শাশ্বত আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেও যান; কিন্তু পরবর্তী কালে আবার অনবধানতা ঘটে, সমাজচিত্তে শৈথিল্য দেখা দেয়, ফলে আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটে এবং ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। মানুষের চিত্তের অবসাদপ্রবণতা স্বাভাবিক; নিত্যচেষ্টিত না হলে অবনতি অনিবার্য হয়। শুধু যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৃষ্ণপ্রবর্তিত ভাগবত ধর্মেরই অবনতি ঘটেছে তা নয়, সব দেশে সব কালেই তাই হয়েছে। ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কথা এই যে, নির্বাণলাভের জন্য প্রত্যেকের পক্ষেই নিত্য উদ্যম ও অপ্রমাদ অত্যাবশ্যক। তাঁর শেষ বাণীও ছিল তাই। তাঁর মহাপরিনির্বাণকালে আনন্দ যখন অসহায়ভাবে তাঁর কাছে ভবিষ্যতের নির্দেশ প্রার্থনা করলেন তখন তিনি দৃঢ়কণ্ঠেই বললেন, "আত্মপ্রতিষ্ঠ হও, আত্মশরণ হও, আর কারও শরণ প্রার্থনা করো না"। ধম্মপদেও (১২।৩) আছে—

অত্তা হি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিয়া।

আত্মাই আত্মার আশ্রয়, তাছাড়া আর কে আশ্রয় হতে পারে?

কিন্তু পরবর্তী কালে বুদ্ধোপদিষ্ট এই আত্মশরণমন্ত্র দেশের চিত্ত থেকে বিস্মৃত হয়ে যায়; আত্মনির্ভরতার কঠোর সাধনার স্থলে কালক্রমে দেখা দিল চারিত্রিক শৈথিল্য এবং ফলে আত্মশরণমন্ত্রের স্থান অধিকার করল ত্রিশরণমন্ত্র— বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ইত্যাদি। উদ্যম ও অপ্রমাদ-তত্ত্বের প্রবর্তক স্বয়ং বুদ্ধদেব ভক্তের ত্রাণকর্তারূপে মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হতে লাগলেন। সে সময় থেকেই কঠোর আত্মসাধনার তুঙ্গতা থেকে সহজ ভক্তিসাধনার ঢালু পথ বেয়ে ভারতীয় সভ্যতার অধোযাত্রা শুরু হয়। শুধু ভারতবর্ষ নয়, অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও কষ্টসাধ্য সাধনার পথ পরিহার

করে সহজিয়া মার্গ অবলম্বনের দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায় এবং সে প্রবণতা যখনই প্রশ্রয়ের দ্বারা পুষ্ট হয় তখনই জাতীয় অধোগতি দ্রুত হয়ে ওঠে।

কেন এমন হয়? দেহ ও মন, জড় ও চেতন, এই দুই নিয়েই মানুষ। জড়ের প্রবণতা স্বভাবতঃই অধোমুখে, চেতনের প্রবণতা উর্ধ্বমুখে। জড়তা যেখানে প্রশ্রয় পায়, সেখানে চেতনার গ্লানি ঘটে। সে গ্লানি-স্বীকারে মানুষের মন স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত। পক্ষান্তরে চেতনার প্রবণতা উর্ধ্বমুখে। সে প্রবণতাকে অবারিত করতে গেলে জড়ত্বের বাধাকে অতিক্রম করতে হয় এবং তা খুবই আয়াসসাধ্য। এই কষ্টস্বীকারে মানুষের মন স্বভাবতঃই পরাঙ্মুখ! মানুষের মনের এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তা চিরন্তন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের মন সহজ প্রবৃত্তি ও সাধনার এই দ্বন্দ্বের নিরসনের পথ খুঁজতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে কোনো রকমে একটা গোঁজামিল দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। বস্তুতঃ এই আত্মতৃপ্তি আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। কেননা, ওই সামঞ্জস্যবিধানের নামে মূলসমস্যা ও তার যথার্থ সমাধানকে এড়িয়ে গিয়ে একটি সুগম পথেরই আশ্রয় নেওয়া হয়। এই যে সহজমার্গ, এটা আসলে জড়তারই পথ; অথচ উচ্চতত্ত্বের মরীচিকাপ্রভায় সে পথকে সাধনার পথ বলেই মনে ভ্রান্তি ঘটানো হয়। এরই সুপরিচিত নাম সহজধর্ম বা সহজসাধনা। বস্তুতঃ এরকম ধর্ম বা সাধনা হতেই পারে না, নৈশরৌদ্রের মতোই তা অসম্ভব ও অলীক। অথচ এই অবাস্তব সহজিয়া সাধনার দিকেই মানুষের মন ঝোঁকে, সব দেশে এবং সব কালে। এই যে কষ্টসাধ্য সাধনাকে পরিহার করে আত্মপ্রবঞ্চনার ঘুরপথে সহজ প্রবৃত্তিকেই সাধ্যবস্তু বলে স্বীকারের প্রবণতা, তাকেই আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় Escapism। এর বাংলা করা হয়েছে পলায়নী মনোবৃত্তি। বোধ করি, 'নিষ্কৃতিলিপ্সা' বললে ওই মনোবৃত্তিকে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করে বোঝানো হয়। কেননা নিষ্ক্রিয়তা অর্থাৎ কষ্টসাধ্য সাধনার কর্ম পরিহারের প্রবৃত্তিই ওই পারিভাষিক শব্দটির অন্তরের কথা। আমাদের সহজিয়া ধর্মের মূলেও রয়েছে ওই নিষ্কৃতিস্পৃহা, সুতরাং তাকে সহজিয়া মনোবৃত্তি নামেও অভিহিত করতে পারি।

এই সহজিয়া মনোবৃত্তিই দেশে দেশে ও যুগে যুগে কঠিন সাধনার

আদর্শকে বিকৃত করেছে। ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের গ্লানিও ঘটেছে তারই প্রভাবে। শুনতে কঠোর হলেও একথা সত্য যে, ভক্তিপ্রবণতা ওই সহজিয়া মনোবৃত্তিরই একটা প্রকাশ। উচ্চাঙ্গের ভক্তিতত্ত্বের তর্ক আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ভক্তিপ্রবণতা চারিত্রিক দৌর্বল্যের সহায়ক না হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভক্তিমার্গ নিষ্কৃতিমার্গেরই নামান্তর। দুএকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যুদ্ধের ভীষণতার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অর্জুনের মনে দেখা দিল রণবিমুখতা। কিন্তু মন তা স্বীকার করতে চাইল না। ফলে সহজিয়া মনোবৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণায় তিনি আশ্রয় খুঁজলেন মহৎ জনকল্যাণতত্ত্বের মধ্যে এবং ওই তত্ত্বের অনুকূলে বিজ্ঞোচিত বহু যুক্তিও উপস্থিত করলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের দুর্বলতা গীতাকারের দৃষ্টি এড়াল না। তাই তিনি কঠোর তিরস্কারের ভাষায় বললেন—

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥
> অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

বস্তুতঃ এই উক্তির মধ্যেই গীতার মৌলিক অভিপ্রায় নিঃসংশয়রূপেই ব্যক্ত হয়েছে। সে অভিপ্রায় হচ্ছে অর্জুনকে কর্মে তথা যুদ্ধে প্রেরণাদান। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্‌কালে যে পরিবেশের মধ্যে গীতাকে স্থাপন করা হয়েছে তাতে তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতেই পারে না। বস্তুতঃ কর্মোদ্যম ও কর্মনিষ্ঠার প্রবর্তনাই গাতার কেন্দ্রগত কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই গীতাতেও সহজিয়া মনোবৃত্তি প্রশ্রয় পেয়েছে। যথা—

> সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

এই উক্তির আধ্যাত্মিক অর্থ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই উক্তি বহু নিষ্কৃতিলিপ্সুর আশ্রয়স্বরূপ হয়েছে এবং এই রন্ধ্রপথে নিষ্ক্রিয়তার পাপ প্রবেশ করে সমগ্র দেশকে অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছে। বলা বাহুল্য, এই রন্ধ্র হচ্ছে ভক্তির রন্ধ্র, আর এই ভক্তিতত্ত্বের তথা নিষ্ক্রিয়তার অনুকূলে 'প্রজ্ঞাবাদে'র অভাবও হয়নি কোনো কালেই। এইভাবে গীতাই গীতার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করেছে। অর্থাৎ গীতার সহজ

কোমলতার দিক্‌টা তার কঠোর দৃঢ়তাকে আচ্ছন্ন করে আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতার হেতু হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসেও এই কঠোর সাধনা থেকে সহজ প্রবৃত্তির দিকে ক্রমাবনতির ধারা সুস্পষ্টভাবে অনুসরণ করা যায়। বুদ্ধপ্রবর্তিত সদ্ধর্ম অধোগতির একটি বড় ধাপ পেরিয়েই দেখা দিল মহাযান তন্ত্ররূপে। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষায় আত্মনির্ভরতা ও উদ্যমকেই প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছিল, তাতে পরমুখাপেক্ষিতা বা ভক্তির কোনো স্থানই ছিল না। কিন্তু দুর্বল মানবমনের সহজ প্রবৃত্তি ভক্তির ঢালু পথে অগ্রসর হয়ে ওই ধর্মকে একেবারেই রূপান্তরিত করে দিল; মহাযানতন্ত্রে বুদ্ধদেবই ত্রাণকর্তারূপে স্বীকৃত হলেন এবং তাঁর শরণগ্রহণই ধর্মসাধনার উপায়রূপে দেখা দিল। বলা বাহুল্য মহাযান পন্থা কর্মহীন ভক্তিরই পন্থা।

যীশুর উপদিষ্ট নীতির ধর্মও সহজসাধ্য নয়। প্রাত্যহিক জীবনে একনিষ্ঠ-ভাবে নীতিধর্মপালনে যে চারিত্রিক বলিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়, অধিকাংশ মানুষের জীবনেই তার অভাব দেখা যায়। তাই কোমল ভক্তিতত্ত্বের সহজ-পথে যীশুকেই ত্রাণকর্তা বানিয়ে মানুষের সমস্ত পাপ মোচনের দায়িত্ব তাঁর উপরেই অর্পিত হল; আমাদের জন্য অবশিষ্ট রইল শুধু যীশুর শরণগ্রহণ, ভগবদ্‌ভক্তি, দৈনন্দিন পাপাচারের জন্য অনুতাপপ্রকাশ এবং গীর্জায় প্রার্থনা-দিতে যোগ দেওয়া প্রভৃতি কয়েকটি নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান। এ হচ্ছে খ্রীষ্টীয় ধর্মের ভক্তিমার্গাশ্রিত সহজিয়া রূপ; তার নীতিসাধনার দুর্গম পথটি দু'চার জন দুঃসাহসী সাধকের জন্যে একান্তে অবহেলিত হয়েই রইল। খ্রীষ্টান ধর্মের এই বিকৃতি না ঘটলে আজ সমগ্র মানবজাতির ভাগ্যে এমন দুর্গতি দেখা দিতে পারত না।

বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টীয় ধর্মের এই যে ভক্তিময় সহজিয়া রূপ, তাই নিষ্কৃতিলিপ্সু দুর্বল মানবমনকে অধোদিকে আকর্ষণ করেছে। এই আকর্ষণকে অস্বীকার করা মাধ্যাকর্ষণের বাধা অতিক্রম করে উর্ধ্বগতির মতো দুঃসাধ্য। কিন্তু একমাত্র সেইজন্যই মানুষ ওই সহজ ভক্তির পথকে মেনে নিয়েছে, তা নয়। ভক্তি জিনিসটার একটা স্বকীয় লোভনীয়তাও আছে। এক দিকে তা কঠোর সাধনা পরিহারের গ্লানিকে নানা প্রজ্ঞাবাদের দ্বারা প্রচ্ছন্ন করে মনকে আরাম দেয়, অপর দিকে ভক্তিচর্চার রসমাধুর্যে অভিষিক্ত করে মনকে বিশেষ

একরকম আনন্দ দান করে। রসমাধুর্যের আকর্ষণে প্রলুব্ধ মনে ভক্তিচর্চার ফলে স্বভাবতঃই যে ভোগলিপ্সা দেখা দেয়, তাকে বলতে পারি ভক্তিবিলাস। ভক্তিধর্মের আধ্যাত্মিক মূল্য যাই হক, ধর্মসাধনার ছদ্মবেশে ভক্তিবিলাস যে দেশে দেশে ও কালে কালে মানুষের মনকে সবলে আকর্ষণ করে জাতীয় জীবনে চরম অধোগতি ঘটিয়েছে সে ইতিহাস অস্বীকার করবার উপায় নেই। ভক্তিবিলাসই নানা উপলক্ষে ধর্মের আদর্শকে পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে টেনে নামিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈতন্যপ্রবর্তিত মহৎ ধর্মের কোনো কোনো বিশেষ পরিণতির কথা স্মরণ করতে পারি।

ভক্তিবিলাস মানুষের মন তথা বুদ্ধিকে ক্রমশঃ জীর্ণ করে তাকে একেবারে নির্জীব নিষ্ক্রিয় করে তবে ছাড়ে। আমাদের দেশে ভক্তিবিলাসের এই প্রক্রিয়া আজও স্তব্ধ হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইদানীন্তন গান্ধীভক্তির কথা উল্লেখ করতে পারি। মহাত্মা গান্ধী আমাদের সম্মুখে ধর্ম ও কর্মের যে আদর্শ তুলে ধরেছেন তা মোটেই সহজসাধ্য নয়। সত্য, অহিংসা প্রভৃতি নীতির তথা জীবনসাধনার যে মহৎ আদর্শ তিনি দেখিয়েছেন তাকে বাস্তব রূপ দিতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন চিত্তের বলিষ্ঠতা। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। বস্তুতঃ বলহীনের লভ্য বস্তু কিছুই নেই। অথচ আমাদের দেশে সে বলসাধনার একান্তই অভাব। তাই আমাদের ভক্তিপ্রবণ দুর্বল মন গান্ধীতত্ত্বের সহজ-রূপের সন্ধানে ব্যাপৃত হল। আত্মবঞ্চনার পথে সে রূপের সন্ধানও মিলল অতি সহজেই। গান্ধীজীর আচরণ ও বাণীতেই তার আনুকূল্যও ছিল প্রচুর। চরকা, খদ্দর, গান্ধী টুপি, রামধুন প্রভৃতি বাহ্য আনুষ্ঠানিকতার পথে আমাদের গান্ধীভক্তি চরিতার্থতা লাভের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে। যে মনোবৃত্তি ওই পথে আমাদের প্রবর্তনা দিচ্ছে তাকে বলতে পারি গান্ধী-বিলাস। এই বিলাসই যথার্থ গান্ধীমার্গ অনুসরণের প্রধান অন্তরায়। সহজসাধ্য আনুষ্ঠানিকতার বিলাসই কষ্টলভ্য আদর্শকে আচ্ছন্ন করে দেশকে অধোমুখী সুগমতার দিকে চালনা করবে, এই আশঙ্কা অমূলক নয়। তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে এই সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করেছেন—

> যে মানুষ বিলেতে গিয়ে রাউণ্ড টেবল কনফারেনসে তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, যিনি খদ্দর চরকা প্রচার করেন, যিনি প্রচলিত চিকিৎসা-শাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে বিশ্বাস করেন বা করেন না—এইসব

মতামত ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে যেন এই মহাপুরুষকে সীমাবদ্ধ করে না দেখি।...প্রয়োজনের সংসারে নিত্যপরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে, কিন্তু সকল প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যে মহাজীবনের মহিমা আজ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হল তাকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি।

যে মনোবৃত্তির প্রবণতা গান্ধীজীবনের মহত্ত্বকে খাটো করে তার তুচ্ছ-তাকেই বড় করে তোলার দিকে, তাকেই বলেছি গান্ধীবিলাস।

অনুরূপ মনোবৃত্তি রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপপ্রকাশেও বাধা ঘটিয়েছে, তার যথার্থ মহিমাকে খর্ব করে তার আপাতমনোরম দিক্‌টিকেই প্রাধান্য দান করেছে। মহৎ লোকোত্তর চরিত্রের মতো রবীন্দ্রসাহিত্যেরও দুটি দিক্ আছে, এক দিকে আছে সুকুমার কোমলতা এবং আর এক দিকে সুদৃঢ় কাঠিন্য। বলা বাহুল্য নরদেহসংস্থানের মতো ওই কাঠিন্যই হচ্ছে রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল কাঠামো এবং ওই সৌকুমার্য হচ্ছে দেহলাবণ্যের মতো তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বলিষ্ঠ শক্তিময় স্বাস্থ্যেরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হচ্ছে লাবণ্য, ওই লাবণ্য কৃত্রিম প্রসাধনের দ্বারা লভ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের দেহগত রূপসৌন্দর্য সকলের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু তাঁর অনন্যসাধারণ বলিষ্ঠতা ও স্বাস্থ্যসম্পদের কথা আমরা ভুলেই থাকি। রবীন্দ্রসাহিত্যেরও সেই দশা। তার অপূর্ব রসমাধুর্যের অন্তরালে যে কঠিন চিত্তশক্তির ক্রিয়া নিত্যবিদ্যমান, আমরা তার একটু পরিচয় নেবার প্রয়োজনও বোধ করি না। রবীন্দ্রসাহিত্যের অফুরন্ত সৌন্দর্যের উৎসস্বরূপ যে চিৎশক্তি, তার সন্ধান রাখি না বলে ওই সৌন্দর্যের স্বরূপও আমাদের কাছে অপ্রকাশিত থেকে যায় এবং তাকে ঠিক মতো উপলব্ধি করবার শক্তিও আমাদের অনায়ত্তই থাকে। তাতে আমরা শুধু যে বঞ্চিতই হই তা নয়, তাতে আমাদের ক্ষতিও হয়। শক্তিনিরপেক্ষ ঐকান্তিক রসচর্চায় আমাদের পৌরুষের হানি ঘটে, সে কথা একবার ভেবে দেখবার অবকাশও আমাদের নেই।

আজ দেশের সর্বত্র রবীন্দ্রভক্তির প্রবলতা দেখা দিয়েছে। শহরে গ্রামে বিদ্যালয়ে ক্লাবে সর্বত্র নারী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ সকলের মধ্যেই এই ভক্তির অল্পাধিক প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্য আজ জাতীয় সম্পদ্ বলে স্বীকৃত এবং রবীন্দ্রোৎসব জাতীয়-উৎসব বলে পরিগণিত হয়েছে। পঁচিশে

বৈশাখ ও বাইশে শ্রাবণ পুণ্য স্মরণতিথি হয়ে উঠেছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি কাগজগুলিতে রবীন্দ্রবিষয়ক রচনা প্রকাশের প্রতিযোগিতা লেগে যায়। আর কোনো দেশের কোনো কবি বা সাহিত্যিক জাতীয় হৃদয়ে এমন শ্রদ্ধা ও অনুরাগের আসন পেয়েছে বলে জানি না। আজকের ঘোরতর দুর্দিনে দুর্গত বাঙালির পক্ষে এটা সত্যই পরম আশার কথা। এই যে দেশব্যাপী রবীন্দ্রভক্তির স্বতঃস্ফূর্তি, একে যদি ঠিকমতো সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায় তবে আজকের অপরিমেয় অকল্যাণের অবসান আসন্ন হয়ে আসবে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিরাট্ কল্যাণশক্তি সংহতি ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে সাময়িক উৎসব এবং উচ্ছ্বাসের মধ্যেই অবসান লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই ওই উৎসব ও উচ্ছ্বাস ভক্তি-বিলাসের রূপ নিচ্ছে। পূর্বোক্ত নিষ্কৃতিস্পৃহা বা সহজিয়া মনোবৃত্তির ফলে আমরা অজ্ঞাতসারেই রবীন্দ্রসাহিত্যের যে দিক্‌টা দুরূহ তাকে এড়িয়ে গিয়ে তার কমনীয় দিক্‌টাকেই বেছে নিই। তারই ফলে আমাদের রবীন্দ্রোৎসব অনেক স্থলেই তরল রসচর্চাতেই পরিণত হয়। কবিগুরুর একখানি প্রতিকৃতিকে পুষ্পে মাল্যে ধূপে দীপে সজ্জিত করে গীতবিতানের কয়েকটি গান, সঞ্চয়িতার কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি, দু'একটি নৃত্য এবং একটি অভি-নয়ের দ্বারাই সাধারণ উৎসব সমাপ্ত হয়। কখনও কখনও দু'একটি প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাও থাকে। আর থাকে পৌরোহিত্যে বৃত কোনো খ্যাতনামা ব্যক্তির অভিভাষণ বা অতিভাষণ। বলা বাহুল্য এই মামুলি ধরণের উৎসবা-নুষ্ঠানের দ্বারা খানিকটা আনন্দচর্চা হয় বটে, কিন্তু তার দ্বারা সাধারণতঃ উচ্চতর কোনো কল্যাণই সাধিত হয় না। এইজাতীয় উৎসব সিনেমা, নাটক প্রভৃতির ন্যায় আমাদের আনন্দস্পৃহারই তৃপ্তিসাধন করে এবং তা করে রবীন্দ্রভক্তির ছদ্মবেশে। কিন্তু তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা কতটা সার্থকতা লাভ করে এবং আমাদের জাতীয় জীবনও কল্যাণের পথে কতটা অগ্রসর হয় তাই বিচার্য। যে-কোনো দেশের আদর্শ নায়কের মর্মগত কামনা প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে—

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক;

কর্মনায়ক না হতে পারেন, চিন্তানায়ক অবশ্যই ছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না বললে বোধ করি অন্যায় হয় না। সুতরাং উক্ত বাণী তাঁর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আমাদের দেশকে জাগাতে হলে রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে আমাদের শক্তি ও আলো সংগ্রহ করতে হবে, তাঁর চিন্তার দ্বারা আমাদের চিন্তাকে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা করছি কি? কোনো রবীন্দ্রোৎসবে

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সংকটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ।

গানটিকে 'নৃত্যে রূপায়িত' হতে দেখেছি, কিন্তু তাকে জীবনে রূপ দেবার কোনো প্রচেষ্টা কোথাও দেখিনি। এরকম ক্ষেত্রে ওই রূপায়ণকে কবির প্রতি ব্যঙ্গের মতোই বোধ হয়, অন্ততঃপক্ষে তাতে কবির প্রতি কোনো শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন মাতালের পক্ষে মদ যেমন খাদ্যের চেয়েও প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষে দেশপ্রীতির নেশাও তেমনি স্বয়ং দেশের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে। আমাদের রবীন্দ্রভক্তির নেশাও তেমনি অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেই আচ্ছন্ন করে রাখে। আমাদের দেশপ্রীতির ব্যর্থতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন দেশকে পরিপূর্ণরূপে জানাই দেশকে ভালোবাসার প্রধান অঙ্গ; আমরা দেশকে ভালো করে জানতে চাই না, অথচ মনে করি দেশকে বুঝি সত্যই ভালোবাসি; এটা সুস্থ মনের অবস্থা নয়, দেশপ্রেমের নেশাগ্রস্ত অসুস্থ অবস্থা মাত্র; এইজন্যই দেখা যায় তরুণ বয়সে যারা দেশপ্রেমে পাগল, পরবর্তী কালে সে নেশা কেটে যাবার পর তারা একমাত্র আত্মস্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত; যথার্থ দেশপ্রেমিকের কখনও এ দশা হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে জানতে চেষ্টামাত্র না করে যারা রবীন্দ্রোৎসবে মত্ত হয়, তাদের এই মত্ততা কেটে যেতে বেশি সময় লাগে না।

একথা বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ নিছক কবি মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের সাধক। শুধু কাব্য নয়, জ্ঞান এবং কর্মের প্রেরণাও তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে কর্মী ছিলেন এবং

কর্মের আদর্শকে নানা কর্মক্ষেত্রে (বিশেষতঃ শ্রীনিকেতনে) তিনি পুনঃপুনঃই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, জাতীয় কর্মান্দোলনের সময়েও তিনি বার বার আমাদের পথ নির্দেশ করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ওই কর্মপ্রেরণা মূর্ত হয়ে উঠেছে 'বিশ্বভারতী' রূপে। তাঁর গুরুদেব নামটি যে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আবদ্ধ না থেকে বহির্জগতেও প্রসারলাভ করেছে তা একেবারে নিরর্থক নয়। বস্তুতঃ আমাদের জাতীয় জীবনে যে ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা মুখ্যতঃ গুরুরই ভূমিকা। জ্ঞান ও শিক্ষার ভিত্তির উপরে জাতীয় জীবনকে গড়ে তোলবার ব্রতই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কর্মও ছিল জ্ঞানোজ্জ্বল। এমন কি, তাঁর কবিকৃতিও জ্ঞাননিরপেক্ষ ছিল না। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে তিনি বিলেতি পোএট অর্থের কবিমাত্র ছিলেন না। তিনি কবি ছিলেন ভারতীয় অর্থে। কঠোপনিষদের একটি উক্তিতে কবির পরিচয় পাওয়া যায়।—

> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
> দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

বোঝা যাচ্ছে জীবনের পরমার্থ লাভের পথের সন্ধান দেন যাঁরা তাঁরাই কবি। ঈশোপনিষদে আছে 'কবির্মনীষী'। সন্দেহ নেই যে, মনীষাই কবির প্রধান লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের যথার্থ পরিচয়ও পাওয়া যাবে তাঁর মনীষার মধ্যেই। বস্তুতঃ মনস্বিতাই হছে কবি রবীন্দ্রনাথ তথা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের আসল পরিচয়। যে মননশক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁকে জীবনের তথা কবিত্বের তুঙ্গতায় প্রতিষ্ঠা দান করেছে। কিন্তু আমাদের সহজিয়া দৃষ্টিতে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ মনস্বী রবীন্দ্রনাথকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাঁর কলাসৌন্দর্যের দীপ্ত প্রভা তাঁর মনীষাকে আড়াল করে ফেলেছে। আমাদের সহজিয়া মনোবৃত্তি তাঁকে সহজরূপে গ্রহণ করতেই উৎসুক হয়ে উঠেছে। কিন্তু একথা ভুললে কিছুতেই চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ কখনোই সহজ পথের পথিক ছিলেন না, ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত দুরত্যয় পথেরই তিনি পথিক ছিলেন। তিনি ভগবানের কাছে যে প্রার্থনা করেছেন তাও শক্তিরই প্রার্থনা, করুণার নয়। দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

১ বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে যেন করিতে পারি জয়।

২ ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

৩ ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে ; যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে।

৪ তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ় বলে। ··বীর্য দেহ ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহ চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি॥

এসব দৃষ্টান্ত সুপরিচিত। হয়তো বা অতিপরিচয়ের ফলেই এগুলির প্রেরণাশক্তির হানি ঘটেছে। কিন্তু বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত বলিষ্ঠ প্রার্থনারও অভাব নেই। শুধু প্রার্থনা নয়, জাতিকে কর্মের ক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামের পথে মৃত্যুমহিমার দিকেও তিনি কম প্রেরণা দেননি।—

যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।

জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েও তিনি ওই পথেই আমাদের আহ্বান জানিয়ে গেছেন।—

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছ ঘরে ঘরে।

আজ প্রশ্ন করবার সময় এসেছে, আমরা তাঁর এই শেষ আহ্বানের মর্যাদা কিভাবে রক্ষা করছি। আমরা যেভাবে রবীন্দ্রভক্তির চর্চা করে থাকি তাতে কি ওই মর্যাদা রক্ষিত হয়? একথা অবশ্যই ঠিক নয় যে, সর্বত্রই রবীন্দ্র-বাণীর অমর্যাদা ঘটেছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, দেশব্যাপী রবীন্দ্রভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর বাণী এখনও কর্মের বেগ সঞ্চার করতে পারেনি, জ্ঞান ধ্যান এবং সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রেরণা এখনও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের আরামলিপ্সু মন স্বতঃই রবীন্দ্রসাধনার কঠোরতার দিক্‌টি পরিহার করে সহজসাধ্যতার দিক্‌টাই বেছে নিয়েছে। তাঁর মনস্বিতার চেয়ে তাঁর সৃষ্ট শিল্পসৌন্দর্যই আমাদের মনকে বেশি আকর্ষণ করেছে। এভাবে জাতীয় জীবনে সহজিয়া ভাবের প্রাধান্য ঘটলে শুধু তপস্বীর কঠোর তপস্যাই ব্যর্থ হয়ে যায় তা নয়, আমাদের ভবিষ্যতের গৌরবসম্ভাবনাকেও প্রতিহত করা হয়। বস্তুতঃ এই সহজিয়া মনোবৃত্তি জাতিগত ব্যাধিবিশেষ। একবার তার আক্রমণ ঘটলে জাতীয় চরিত্রে যে শৈথিল্য ও পঙ্গুতা দেখা দেয় তার থেকে রক্ষা পাবার উপায় থাকে না। আমরা জানি এই সহজিয়া ভক্তির প্রাবল্য এক সময়ে শ্রীচৈতন্যের মহৎ চরিত্র ও কঠোর সাধনাকেও কিভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দিয়েছিল। পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের দুর্জয় আহ্বানও গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতা ও ভক্তিরসের স্পর্শে তার গতিবেগ হারিয়েছে। বর্তমান যুগে সহজ রবীন্দ্রভক্তির বিলাসিতাও তাঁর সাধনাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, এ আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। কেননা, সর্বদাই দেখি, আমরা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করি, তাঁর রচনাবলী কিনে লাইব্রেরিও সাজাই, কিন্তু পড়বার প্রবৃত্তি খুবই কম; যদিও পড়ি তবে তার রসবিভাগটাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করি, মননবিভাগের দিকে নজর দিতে বড় দেখা যায় না।

প্রশ্ন হতে পারে রবীন্দ্রসাহিত্যে শুধু কঠিনের সাধনাই নেই, তাতে তো ললিতশিল্পের মাধুর্যও কম নয়। ওই ললিতমাধুর্যের কি কোনো সার্থকতাই নেই? রবীন্দ্রসাহিত্যে যে রসমাধুর্যের প্রাচুর্য দেখা যায়, তার চর্চা কি একেবারেই অনভিপ্রেত? তার উত্তর এই যে, রবীন্দ্রসাধনাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে হবে, তাহলেই কঠোর ও কোমলের যথার্থ সমন্বয় ঘটবে। কঠোরকে পরিত্যাগ করে শুধু কোমলতার চর্চা করলে তার পরিণাম কখনও

কল্যাণকর হতে পারে না। মানুষের কঠিন অস্থিপঞ্জর তার দেহকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেয় বলেই ওই দেহের লাবণ্য সার্থক হতে পেরেছে। অস্থিপঞ্জর-হীন দেহলাবণ্য আমাদের কল্পনারও অতীত। বস্তুতঃ শক্তির সঙ্গেই লাবণ্যের যথার্থ সমন্বয়। রবীন্দ্রমানসে শক্তি ও সৌন্দর্যের যথার্থ মিলন ঘটেছিল বলেই তার পৌরুষ ছিল রুক্ষতাহীন এবং লাবণ্য হয়েছিল দুর্বলতাহীন। ক্ষমা যেমন বীর্যবানের ভূষণ, লাবণ্যও তেমনি বলিষ্ঠতারই প্রসাধক। এ-কথা যেমন ব্যক্তির পক্ষে সত্য, জাতির পক্ষেও তাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে দেখি বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর সমুদ্র-গুপ্তের মধ্যে বীর্য ও লালিত্যের অপূর্ব মিলন ঘটেছিল। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন 'স্বভুজবলপরাক্রমৈকবন্ধু', তাঁর উপাধি ছিল 'পরাক্রমাঙ্ক'। স্বভুজবলে তিনি সমগ্র আর্যাবর্তের আধিপত্য অর্জন ও অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিষ্ঠিত করেন। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন 'নিশিতবিদগ্ধ-মতি', ললিতকলার চর্চাতেও তাঁকে অপ্রতিরথ বলা চলে। 'অনেককাব্য-ক্রিয়া'র দ্বারা তিনি 'কবিরাজ' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ললিতগান্ধর্ববিদ্যা অর্থাৎ সংগীতেও তিনি বড় বড় ওস্তাদকে হার মানিয়ে-ছিলেন। কতকগুলি মুদ্রাতেও দেখা যায় সমুদ্রগুপ্ত নিবিষ্টমনে বীণা বাজাচ্ছেন। তাঁর মতো 'স্বভুজবলপরাক্রমৈকবন্ধু'র পক্ষে এই কাব্য ও সংগীত-বিলাস অশোভন হয়নি। তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, উদ্যোগী পুরুষসিংহ যে শুধু লক্ষ্মীরই বরমাল্য লাভ করেন তা নয়, সরস্বতীও তাঁকে বঞ্চিত করেন না। জাতিগতভাবেও দেখা যায় যখনই কোনো দেশে বীর্যের ভূমিকা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখনই কাব্য সংগীত প্রভৃতি ললিতবিদ্যা চর্চার যথার্থ অবকাশ ঘটে। কালিদাস যে শকারি বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন তা নিরর্থক নয়। বিক্রমাদিত্যের যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বীর্যের যে স্ফুরণ ঘটেছিল তার তুলনা বিরল, আর তাঁর আশ্রয়ে কালিদাসের লেখনীতে যে অজস্র মাধুর্য উৎসারিত হয়েছিল তাও অভূতপূর্ব। পুরুষসিংহ আকবরের আমলেও আর-একবার শক্তির ভূমিকায় কলালক্ষ্মীর বেদী রচিত হয়েছিল। তুলসীদাস, সুরদাস, তানসেনের রচনা এবং ফতেপুর সিক্রির স্থাপত্য স্মরণীয়। ইউরোপের ইতিহাসেও দেখা যায় বীর্যই লাবণ্যের যথার্থ আশ্রয়স্থল। গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগ, রোমের অগস্টান যুগ, ইংলণ্ডে

এলিজাবেথের যুগ, ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইএর যুগ স্মরণ করলেই এ-কথার সার্থকতা উপলব্ধি হবে।

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন দেশে ব্যাপকভাবে শক্তিচর্চার অবকাশ ছিল না। ১৮৫৭-৫৮ সালের ভারতবিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তির শেষ রশ্মিটুকু চিরকালের জন্য অস্তমিত হয়ে গেল। তথাপি রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনে যখনই যেখানে পৌরুষশক্তির কিছুমাত্র স্ফুরণ ঘটেছে, তিনি তার সঙ্গেই নিজের চিৎশক্তিকে যুক্ত করতে কখনও দ্বিধা করেননি। হিন্দুমেলার আমল থেকে মহাত্মাজির সত্যাগ্রহ বা হরিজন আন্দোলন পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসরণ করলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। যথার্থ শক্তির প্রকাশ যে ক্ষেত্রেই হক, সে ক্ষেত্রেই তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেহচর্চা, ধর্ম ও সমাজ -সংস্কার, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আন্দোলন, সর্বত্রই তিনি আত্মশক্তি-প্রতিষ্ঠার পক্ষে অক্লান্তভাবে নিজের মননশক্তিকে নিয়োজিত করেছেন। মননের ক্ষেত্রেই তাঁর শক্তিসাধনা সার্থকতা লাভ করেছে সব চেয়ে বেশি। যে নির্মল ধীশক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন, আজ তারই অভাব আমাদের মধ্যে একান্ত হয়ে উঠেছে। সেই ধীশক্তিকে প্রখর ও উদ্যত করে তুলতে হলে রবীন্দ্রসাহিত্যেরই আশ্রয় নিতে হবে; তাঁর সৃষ্ট মননসাহিত্যের চর্চাই আমাদের চিত্তকে বল দেবে, আমাদের সমস্ত দুঃখদুর্গতিকে অতিক্রমণের সহায় হবে। এভাবে যেদিন মননের ক্ষেত্রে আমাদের শক্তিসাধনা সফল হয়ে উঠবে, সেদিনই তাঁর রচিত সুকুমারকলা সৌন্দর্যচর্চায় যথার্থ অধিকার আমরা অর্জন করব। সেদিনই আমরা তাঁকে সম্বোধন করে বলতে পারব—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়॥

প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্র সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে,
মৃত্যুর হোক লয়॥

সেই শুভদিনের জন্য আমাদের সাধনা কি আজই আরম্ভ করব না?

প্রবন্ধপরিচয়

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধসমূহের সাময়িকপত্রে প্রকাশের পরিচয় নীচে দেওয়া গেল সংক্ষিপ্ত তালিকা-আকারে। গ্রন্থে গ্রহণকালে কোনো কোনো প্রবন্ধের নাম পরিবর্তিত হয়েছে। সে-সব প্রবন্ধের মূলনামও দেওয়া গেল বন্ধনীর মধ্যে। যে-সব লেখার রচনাকাল জানা আছে সেগুলির রচনাকালও যথাস্থানে উল্লিখিত হল। কোনো কোনো স্থলে রচনাকাল ও প্রকাশকালের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান লক্ষিত হবে।

ভারতপথিক

১ ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ কার্তিক (প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)। ঈষৎ পরিমার্জিত পুনঃপ্রকাশ: শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ (১৩৬৮ বৈশাখ)।

২ রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ মাঘ (প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা)।

৩ রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রূপ: প্রথম পর্যায় ('ত্রিকালদর্শী রবীন্দ্রনাথ')—দেশ ১৩৫০ আশ্বিন।

৪ রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রূপ: দ্বিতীয় পর্যায় ('আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর')—দেশ ১৩৫৭ জ্যৈষ্ঠ ২০।

৫ রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি—দেশ ১৩৫১ শারদীয় সংখ্যা। পরিমার্জিত পুনঃপ্রকাশ: 'জগজ্জ্যোতিঃ' পত্রিকা ১৩৫৭ আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ (প্রথম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা)।

৬ রবীন্দ্রদৃষ্টিতে অশোক ('রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোক')—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৯ বৈশাখ-আষাঢ়, পৃ ১৮৯-৯৭ এবং মাঘ-চৈত্র, পৃ ১৩৯-৪১। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পুনঃপ্রকাশ: 'জগজ্জ্যোতিঃ' পত্রিকা ১৩৬১ আশ্বিন (পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) এবং শ্রীনীলরতন সেন-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রবীক্ষা' গ্রন্থ (১৩৬৯ বৈশাখ)।

এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য—'জগজ্জ্যোতিঃ' (১৩৫৯ প্রবারণা পূর্ণিমা (তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) এবং 'ইতিহাস' পত্রিকা ১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ (তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)।

৭ রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস—শ্রীপুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ' প্রথম খণ্ড (১৩৬৮ বৈশাখ)।

যুগনায়ক

১ যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথ: প্রথম পর্যায় ('মহাকালের আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ')—'দেবায়তন' পত্রিকা ১৩৪৮ আশ্বিন।

২ যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথ: দ্বিতীয় পর্যায় ('আধুনিক ভারত ও রবীন্দ্রনাথ')—দেশ ১৩৫০ বৈশাখ ২৪।

৩ ভারতীয় পুনরুজ্জীবন ও রবীন্দ্রনাথ—আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫১ ফাল্গুন (বার্ষিক সংখ্যা)।

৪ ধনঞ্জয় বৈরাগী—আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬০ বৈশাখ ২৫।

৫ বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ—দেশ ১৩৬২ বৈশাখ ২৩।

৬ জনজাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ: ('রবীন্দ্রনাথ ও ধনসাম্যবাদ')—দেশ ১৩৫৩ আশ্বিন (শারদীয় সংখ্যা)।

৭ অচলায়তন—ইমরোজ (ঢাকা) ১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ।

৮ ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত: প্রথম পর্যায় আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৫৪ অগস্ট ১৫।

৯ ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত: দ্বিতীয় পর্যায়—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবীন্দ্রজীবনী' দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫ মাঘ), পরিশিষ্ট। রচনাকাল ১৯৪৯ জুলাই ১৫।

এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য লেখকের (১) 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়)—পূর্বাশা ১৩৫৪ ফাল্গুন এবং ১৩৫৫ ফাল্গুন; (২) 'জনগণমন গান'—যুগান্তর ১৩৫৫ পৌষ ১০; (৩) 'জনগণমন-অধিনায়ক কে'—বঙ্গশ্রী ১৩৫৫ ফাল্গুন; (৪) 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' (পুস্তিকা) ১৩৫৬ বৈশাখ ২৫; এবং (৫) India's National Anthem (পুস্তিকা) ১৯৪৯ মে।

১০ শিবাজি ও ইতিহাসের শিক্ষা ('রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ: শিবাজি')—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৯ মাঘ-চৈত্র (একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা)।

১১ রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা ('রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাস')—'ইতিহাস' পত্রিকা ১৩৬২ ভাদ্র-কার্তিক (ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা)।

রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' পুস্তকের (১৩৬২ শ্রাবণ) পরিচয়দান-উপলক্ষে রচিত ও অনেকাংশে পুনর্লিখিত।

বিচিত্র

১ রবীন্দ্রসাহিত্যে অতীত ভারত—কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ (১৩৬৯ বৈশাখ ২৫)।

২ রবীন্দ্রনাথের ঋতুসাধনা—'মঞ্জরী' ১৩৫৯ বাসন্তীসংখ্যা। রচনাকাল ১৯৫২ অগস্ট ১৫। বিশ্বভারতী 'রবীন্দ্রসপ্তাহ' অনুষ্ঠানের শেষদিনের অধিবেশনে পঠিত।

৩ রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস—শ্রীসরোজকুমার বসু-প্রণীত 'রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস' গ্রন্থের (১৩৫৭ আষাঢ়) ভূমিকা। 'দেশ' পত্রিকায় (১৩৫৭ আষাঢ় ৯) প্রকাশিত 'বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস' নামে। রচনাকাল ১৩৫৭ জ্যৈষ্ঠ ২৮।

৪ আনন্দ-উজ্জল পরমায়ু—'স্বাস্থ্যসমাচার' পত্রিকা ১৩৪৮ আশ্বিন।

৫ রবীন্দ্রবিলাস—আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫৭ বৈশাখ ২৫।

চিত্রপরিচয়

১ ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ—১৯৩৩ সালে রামমোহন-শতবার্ষিক উৎসবসভার সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হিসাবে তাঁকে অভিহিত করেন ভারতপথের পথিক বলে এবং নিজেকেও পরিচিত করেন ভারতপথিক রামমোহনেরই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ ভারতপথের গান-রচয়িতা আধুনিক কবি বলে। ভারত-পথের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রখানি ১৯৩৩ সালেরই কাছাকাছি কোনো সময়ে তোলা হয়।

২ বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ—১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ অজস্র গান রচনা, সভা-আহ্বান, শোভাযাত্রা-পরিচালনা ও পত্রিকা-সম্পাদনা করে বাঙালির কণ্ঠে বলিষ্ঠ ভাষা দিয়েছিলেন। বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলবার দৃঢ় সংকল্প যখন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এই চিত্রটি সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তোলা।

৩ বন্দেমাতরম্ (হরিশ্চন্দ্র হালদার-অঙ্কিত)—এই চিত্রটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত : প্রথম পর্যায়' প্রবন্ধে (পৃ ২২৮-২৯)। সাময়িক পত্রে প্রকাশকালে (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৫৪ অগস্ট ১৫ ॥ ১৩৬১ শ্রাবণ ৩০) ওই প্রবন্ধে এই চিত্রটি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, "আধুনিক কালে এটির পুনর্মুদ্রণ হওয়া প্রয়োজনীয়।" সুখের বিষয়, এই প্রবন্ধ প্রকাশের অল্পকাল পরেই অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত উক্ত ইঙ্গিত গ্রহণ করে "চিত্রে বন্দেমাতরম্" নামে তাঁর একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে এই চিত্রটি পুনঃপ্রকাশ করেন (দেশ—১৩৬১ কার্তিক ২০, পৃ ২৯)। অল্পকাল পূর্বে এই চিত্রটি আবার প্রকাশিত হয়েছে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র' -নামক প্রবন্ধে 'বালক' পত্রিকার প্রসঙ্গে (দেশ—রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-সংখ্যা ১৩৬৯, পৃ ৫১)।

৪ মালতী-পুঁথির এক পৃষ্ঠা : ঝানসীর রাণী—রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিটি পরিচিত 'মালতী-পুঁথি' নামে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সের (১৮৭৮ সালে প্রথম বিলাত-যাত্রার পূর্ববর্তী) গদ্য-পদ্য বহু রচনার প্রাথমিক খসড়া আছে এই পুঁথিতে। 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা' প্রবন্ধে ঝানসীর রাণীর ইতিহাস আলোচনার প্রসঙ্গে এই পুঁথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে (পৃ ২৭৮-৭৯)। 'ঝানসীর রাণী' প্রবন্ধেরই একটি অংশের প্রতিরূপ মুদ্রিত হল এই চিত্রটিতে।

বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের বিচিত্র রূপ যে-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, এমন আর কারও সাহিত্যেই হয় নি। ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাণীই যে শুধু রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করে গিয়েছেন তা নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের পথও তিনি নির্দেশ করে গিয়েছেন। এককালে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে অভিহিত করেছিলেন 'ভারতপথিক' বলে, আজ আমাদের চোখে রবীন্দ্রনাথই ভারতমহাপথের শ্রেষ্ঠ যাত্রীরূপে প্রতিভাত। সুবিখ্যাত রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন ইতিহাসের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করে নতুনভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা করেছেন। 'ভারতপথিক'—অংশে তিনি দেখিয়েছেন বৈদিক বৌদ্ধ ও গুপ্তযুগের সঙ্গে কবির আত্মিক যোগ। 'যুগনায়ক'—অংশে দেখিয়েছেন সংশয়-দ্বন্দ্বদীর্ণ আধুনিক ভারতবর্ষে মহামনীষীর অবিচল নির্দেশ। আর, 'বিচিত্র'—অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রমনীষার আরও কয়েকটি বিভিন্ন দিকের আলোচনা।